তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রিয় গল্প

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচী

প্রকাশকের নিবেদন

'শ্রেষ্ঠ গল্প' নির্বাচিত হয় সাধারণত জ্ঞানী গুণী বন্ধুদের দ্বারা—সে নির্বাচনে সব সময় লেখকের আন্তরিক অনুমোদন থাকে না, নির্বাচনে মতানৈক্যের অবসরও থাকিয়া যায়। সবচেয়ে বড় কৌতূহল ও প্রশ্ন থাকে পাঠকের মনে যে, এই গল্পগুলি লেখকেরও প্রিয় কি না। সেই কারণেই বর্তমান সঙ্কলনটির আয়োজন। এই নির্বাচনের সমস্ত দায়িত্ব লেখক গ্রহণ করিয়াছেন—অর্থাৎ, এটি তারাশঙ্করের স্ব-নির্বাচিত সঙ্কলন। এগুলি তাঁহার 'প্রিয় গল্প',—শ্রেষ্ঠ গল্প কি না পাঠকসাধারণ তাহার বিচার করিবেন। ইতি।

ভূমিকা

এর পূর্ব্বে 'তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠগল্প' প্রকাশিত হয়েছে। গল্পগুলি নির্ব্বাচন করেছেন বাংলা সাহিত্যের নবীন রসজ্ঞ সমালোচক অধ্যাপক শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়। গল্পসাহিত্য মন্থন ক'রে নীর হতে ক্ষীর সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরাই যাঁরা স্বভাবে ও গুণে হংস স্থানীয়। এ সংসারে মণিমালার কারবারে যাঁরা হংস স্থানীয় তাঁরা জহুরী। গানের আসরে শ্রোতাদের মধ্যে যাঁরা তাল মান রাগরাগিণীর নিখুঁত বিচার ক'রে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীতে গান ও গায়ককে ভাগ করতে পারেন—তাঁরা হলেন বোদ্ধা সমঝদার। সাহিত্যের বিচারে তাঁর নির্ণয়—সেই কারণে অবিসম্বাদী। শ্রেষ্ঠগল্প বিচারের ভার তাই তাঁর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। এ সংগ্রহখানি আমার প্রিয়গল্পের সংগ্রহ। এ গল্পগুলি আমাকে বাছতে হয়েছে। আমার প্রিয় গল্প আমি ভিন্ন কে বাছবে? এর অর্থ এ নয় যে—আমার বিচারে এই গল্পগুলি শ্রেষ্ঠ বলে এগুলি আমার প্রিয়। যা শ্রেষ্ঠ তা' শ্রেয় গুণ সম্পন্ন; মনুষ্যসমাজে শ্রেয় কি তার সংজ্ঞা নির্দ্ধারিত হয়ে আছে। এবং তার বিচার—শ্রেয়কে যাঁরা জানেন তাঁরাই করেন। কিন্তু যা প্রিয়—তার উদ্ভব প্রীতি থেকে এবং সংসারে প্রীতি নিতান্তই ব্যক্তিগত ও বহুক্ষেত্রে তার হেতু একান্তভাবে তুচ্ছ। বাপ মা দুজনের সন্তানগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ যেটি সেটি সর্ব্বজনস্বীকৃত। কিন্তু প্রিয় কোন্‌টি এবং কেন, তা অন্যে নির্ণয় করতে পারে না। আবার এমনও হয়, পর দূরের কথা মা বলতে পারেন না—ওই ছেলেটি কেন বাপের সব চেয়ে প্রিয়, এবং বাপ ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে চিন্তা করেন ওই ছেলেটিকে সব চেয়ে বেশী ভাল না-বেসে অন্যটিকে ছেলেদের মা বেশী ভালবাসেন কেন? বাপও প্রকাশ করেন না মনের কথা—মাও সযত্নে গোপনে রাখেন তাঁর ভালবাসার সত্য কারণকে। কিন্তু সমাজের মাঝখানে বসে বাপ যদি বলেন—এই ছেলেটিই আমার সব চেয়ে প্রিয় তবে সে ক্ষেত্রে তার হেতুটিকেও বলতে হয়। আজ পাঠক সমাজের সামনে আমার প্রিয়গল্প যখন প্রকাশিত হচ্ছে, এই গল্পগুলিকে যখন আমার প্রিয় বলে ঘোষণা করছি, তখন তার হেতু আমাকে বলতে হবে বই কি। ভূমিকায় সেই কথাই বলব।

প্রথম গল্প—রায়বাড়ী। রায়বাড়ী গল্পটি জলসাঘরের প্রথম গল্প। জলসাঘর গল্পসংগ্রহেরও প্রথম গল্প এবং জলসাঘর গল্পটির পূর্ব্ব অধ্যায়ও বটে। রায়বাড়ীর সঙ্গে আমার একটি বিচিত্র স্মৃতি জড়িয়ে আছে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি। 'আমার সাহিত্যজীবন' প্রথম খণ্ডে ঘটনাটির কথা লিখেছি। জলসাঘর বেরিয়েছে কিছুদিন—এমন সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যনাট্যের সম্প্রদায় নিয়ে কলকাতায় এলেন। নিউ এম্পায়ার এবং ছায়া ছবিঘরে পর পর কয়েকদিন নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান হ'ল। আমি জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গিয়ে ক'বির হাতে 'জলসাঘর' দিয়ে প্রণাম করে এলাম। কলকাতায় নৃত্যনাট্যের পালা শেষ ক'রে কবি শান্তিনিকেতন ফিরবার পথেই ইরিসিপ্লাসে আক্রান্ত হয়ে অচেতন হলেন। যাবার সময় জলসাঘর তাঁর হাতে বা হাতের কাছেই ছিল। কয়েকদিন পর চেতনা হল। এবং চেতনা পেয়ে তিনি নাকি দুটি জিনিসের খোঁজ করেছিলেন। তাঁর বিশ্বপরিচয়ের প্রুফ এবং জলসাঘর বইখানি। বইখানি পাওয়া যায় নি। কি হয়েছিল জানি না। আমি কিন্তু কলকাতায় পত্র পেলাম শান্তিনিকেতন থেকে—আর একখানি বই অবিলম্বে পাঠাবার জন্য। বই পাঠালাম। জলসাঘরের গল্পগুলি তাঁর ভাল লেগেছিল; এ কথা শ্রীযুক্তা রাণীচন্দের 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথে'র মধ্যে আছে। কিন্তু 'রায়বাড়ী' গল্পের মধ্যে মহাকবি নাকি তাঁর ওই চেতনাহীনতার-আবছায়ায় মৃত্যুস্রোতে ভাসানো নৌকায় চড়তে গিয়ে সচেতনতায় ফিরে আসার সঙ্গে বিশ্বম্ভর রায়ের নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্কল্প নিয়ে ভরাগঙ্গায় ভাসানো ঘাটে-বাঁধা নৌকায় চড়তে গিয়ে ফিরে আসার একটি মিল দেখতে পেয়েছিলেন। কথাটি কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন। এই কারণে গল্পটির প্রতি আমার একটি গভীর মমতা জন্মে গেল সেই দিন থেকে। মমতা থেকেই প্রীতির উৎপত্তি। সেই হেতু রায়বাড়ী আমার প্রিয়।

দ্বিতীয় গল্প—পিতাপুত্র। এ গল্পটি আমার সাহিত্যজীবনে ভাগবতের গল্পের মধু দাদার অক্ষয় দধিভাণ্ডের মত। গল্পটি যখন লিখেছিলাম তখন প্রতিষ্ঠাবান পিতা ও পুত্রের দ্বন্দ্বের কথাই ছিল উপজীব্য। কাহিনীটির পিছনে আমাদের দেশের একটি সত্যঘটনার ছায়া অবলম্বন করেই লিখেছিলাম। ঘটনাটি ঘটেছিল আমাদের ওখানকার একজন বড় পণ্ডিতের জীবনে। এই সত্যের জন্যই নায়ককে মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন রূপে এঁকেছিলাম। কিন্তু শিবশেখরেশ্বরকে আঁকতে গিয়ে আপনার অজ্ঞাতসারেই আমি যেন স্বর্ণখনি আবিষ্কার করলাম। তার থেকেও বেশী। শিবশেখরেশ্বরের মধ্যে আবিষ্কার

করলাম এ দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রাণপুরুষকে। ছোট ক'রে ছাঁটা চুল, কপালে চন্দনের ফোঁটা, শ্যামবর্ণ নগ্ন শীর্ণ বক্ষোদেশে গাবের আঠায় মাজা সাদা ধবধবে পৈতে, পরনে থান ধুতি বা পট্টবস্ত্র, পায়ে খড়ম—অনুচ্চ শান্ত অথচ অনমনীয় দৃঢ় কণ্ঠস্বর, মিষ্ট ভাষা, বৈরাগ্যশুভ্র অন্তর, ভগবৎসত্যের মহিমায় ধ্যানমগ্ন মন—এই তো এদেশের সমাজের প্রাণপুরুষ।

এদেশের সমাজ ব্রাহ্মণেই গঠন করেছে—সমাজকে সংস্কৃতিকে বহু বিপ্লব, বহু দুর্যোগ, বহু বিবর্ত্তন, বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছে; বিংশশতাব্দীর ভাববিপ্লবেও এদেশের নেতৃত্ব করেছে ব্রাহ্মণ। রবীন্দ্রনাথ বিংশশতাব্দীতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। অন্যদিকে গ্রাম্য সমাজে এখনও এই ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান রয়েছেন। ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে ইংরেজের আমল থেকে অভিযোগ অনেক। ইংরেজের প্রচার-কৌশলে এবং ভোগবাদী সভ্যতা প্রচারের ফলে ব্রাহ্মণের বিকৃতরূপই আজকের মানুষের মনে অধিকতর প্রকটভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তবু আজকের পর্য্যন্ত দেশ ও সমাজজীবন প্রতিফলিত করতে হলে ব্রাহ্মণ অপরিহার্য্য। জন্মগত জাতিপ্রধান বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উঠে গেলেও, কর্ম্মগত ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য থাকবেই। এই ন্যায়রত্ন-চরিত্র এই কারণেই পরবর্ত্তী কালে আমার বহু বৃহৎ রচনার কেন্দ্রে প্রায় প্রাণশক্তির মত আবির্ভূত হয়েছে। গণদেবতা পঞ্চগ্রাম এথেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে নাটকও রচনা করেছি। বৃহতের বীজ হিসাবে এই গল্পটি আমার প্রিয় গল্প।

তৃতীয় গল্প—ফল্গু। এ গল্পটিও পিতাপুত্র গল্পের মত একটি বৃহৎ সৃষ্টির বীজ। আমার কালিন্দী উপন্যাসের বীজ। পঞ্চম গল্প—মুন্টু মোক্তারের সওয়াল‌ও তাই। দুই পুরুষ নাটকের বীজ এই গল্পটিতেই নিহিত ছিল।

চতুর্থ গল্প যাদুকরী আমার নাগিনী কন্যার কাহিনী এবং হাঁসুলীবাঁকের ভূমিকা। ঠিক বীজ বলা চলে না। বলা চলে ক্ষেত্র। যাদুকরী যাদের নিয়ে লেখা—তারা আমাদের ও-অঞ্চলের একটি সম্প্রদায়। বিচিত্র সম্প্রদায়। ওদের নিয়ে গল্পটি লেখার পর—এই ধরণের সম্প্রদায় নিয়ে বড় রচনার ইচ্ছা এবং সাহস পেয়েছি। এইটুকুই বোধ হয় সব নয়। এই সম্প্রদায়টি আজ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। তাদের জন্য মনে মনে বেদনা অনুভব করি। পূজোর সময় দেশে যাই; বাজীকর-বাজীকরনীরা আসে না, তাদের সেই মিষ্টি সুরেলা গলার ডাক শোনা যায় না। বাইরে তাদের বাজীর আসর পড়ে না। বাড়ীর উঠানে—বাজীকরনী বা যাদুকরীরা বিচিত্র গান গেয়ে নাচে না। পূজার দিন-

গুলিতে কোথায় যেন ফাঁক পড়ে যায়। ওই যাদুকর-যাদুকরীদের ভালবাসতাম। এই গ্রাম্য যাযাবর জাতটির চারিদিকে ছিল আশ্চর্য্য রহস্য। পশ্চিমাঞ্চলের যাযাবর জাতিরাও আমাদের ও-অঞ্চলে আসত, তাদের মধ্যে এদের মত মাধুর্য্য ছিল না বা নাই। এদের সঙ্গে ঘুরেছি, এদের গ্রাম আমাদের গ্রামের খুব কাছে—সে গ্রামের কিছু জমিদারী অংশ আমাদের ছিল, সে গ্রামে গিয়েছি, তাদের বাড়ীর দাওয়ায় উঠানে বসেছি; ওদের সম্পর্কে প্রবাদকাহিনী ইতিহাস সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছি। জেনেছি। ওদের সম্পর্কে পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন লিখেছেন—ওরা রাঢ়ের সিঙ্গল নগরীর রাজা ভবদেব ভট্টের গুপ্তচর হিসাবে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়াত। সেই কাল থেকেই গুপ্তচরবৃত্তির সুবিধার জন্য পুরুষেরা যাদুবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জ্জন করত; মেয়েরা ছিল নটীর মত নৃত্যগীতপটীয়সী, ছলাকলায় পারদর্শিনী। সাহিত্যরত্ন বলেন—ওদের গ্রাম শীথল গ্রামই সেকালের সিঙ্গল। ওদের কাছে ওদের সিদ্ধ যাদুকর টাকু মণ্ডলের গল্প সংগ্রহ করেছি। যাদুবিদ্যার সুরুতেই ওরা টাকু মোড়লের দোহাই পাড়ত। ওদের কাছেই ক্ষুদিরামের ফাঁসীর গান শুনেছি—'বিদায় দে মা ঘুরে আসি'। সাময়িক ঘটনা নিয়ে গান রচনা এদের শিল্প ও সঙ্গীত সংস্কারের একটা বড় অঙ্গ ছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর গানও এরা গাইত। 'মহারাণীর মিত্যু হইল'—'ছোটলাট বড়লাট কাঁন্দিতে বসিল'; তার যোগে বিলাত হতে খবর আসিল।' যাযাবর সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সম্প্রদায় আমি দেখি নাই। তারা আজ বিলুপ্তপ্রায়; দুঘর একঘর আছে, কিম্বা হয়তো নাই; তাদের জন্য অন্তরের গোপনে একটি মমতাময় বেদনা অনুভব করি। সেই স্মৃতি জড়িত আছে, সেও একটি কারণ এই গল্পটি আমার প্রিয়গল্পের অন্যতম হবার।

ষষ্ঠ গল্প—সন্ধ্যামণি। এটির সঙ্গেও জড়িয়ে আছে স্মৃতি। আমার ব্যক্তিজীবনের মর্ম্মান্তিক স্মৃতির বেদনাপ্লুত অন্তরের পরিচয়। সন্তানশোকার্ত্ত পিতার অন্তরের ছাপ পড়ে আছে এটির মধ্যে। আমার মেয়ে বুলু মারা যাওয়ার পর এইটিই আমার প্রথম রচনা। ঘটনার কথা একটু বলি। আমার মেয়ে তখন বেঁচে, সেই সময় হেঁটে গেলাম উদ্ধারণপুর, আমাদের গ্রাম থেকে তেইশ চব্বিশ মাইল পথ। উদ্ধারণপুরের ঘাটের উপর ছোট বাজারের একখানি ছিটে-বেড়ার ঘরে বাসা নিয়ে দিন-তিনেক ছিলাম। বাসার পাশেই পালকর্ত্তা অর্থাৎ কুম্ভকার মশাইয়ের দোকান। রাস্তার ওপারে মাদুর বোনে

একটি পরমশ্রীমতী মেয়ে। তার পাশে দ্বিজপদর মুদীর দোকান—এবং দ্বিজ শ্মশানঘাটের ইজারাদার। খানিকটা দূরে শ্মশানঘাট। পানের দোকানে ছুটি আধুনিক ছোকরা যাত্রার দলের নাটক পড়ে। কেনারাম আসে। আধপাগল মানুষ। দেশেদেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। শ্মশানঘাটে চণ্ডাল পৈরুর সঙ্গেও আলাপ করলাম। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত টিনের চালায় কাটিয়ে এলাম। ইচ্ছে হ'ল বাজারটির ছবি তুলে রাখি। একদিন সন্ধ্যায় বসে গোড়ার ছবিটি তুলে রাখলাম। তারপর গ্রামে ফিরলাম। লেখাটা পড়ে রইল ছোট স্যুটকেসটার মধ্যে। দিন পনের কুড়ি পরে—মারা গেল আমার মেয়েটি। মেয়ের মৃত্যুর ঠিক দ্বিতীয় দিন সকালে সাবিত্রীপ্রসন্নের পত্র পেলাম—উপাসনা উঠে যাচ্ছে, সাবিত্রীপ্রসন্ন চলে যাচ্ছেন, ইত্যাদি। এসব বিশদভাবে লিখেছি সাহিত্যজীবনের মধ্যে। উপাসনা উঠে গেল। বঙ্গশ্রী প্রকাশের উদ্যোগ আয়োজন হতে লাগল। আমি ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় এলাম—কিছুদিনের জন্যে। আত্মীয়-বাড়ী এসে উঠলাম। কলকাতায় এসে এই গল্পটি লিখতে বসে আমার কন্যাশোকার্ত্ত অন্তরের বেদনা ফুটে উঠল লেখাটির মধ্যে। এই স্মৃতিটুকুই গল্পটিকে আমার প্রিয় করে তুলবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এই সব নয়, আরও একটু আছে। নূতন কাগজ বঙ্গশ্রীর আসরে—উপস্থিত সাহিত্যিকদের সকলের নিমন্ত্রণ হল, আমার হল না। বেশ একটু আহত হলাম। একই আসরে বসে ঘটনাটা ঘটায় মনে বেশ একটু লাগল। প্রথম সংখ্যার গল্পলেখকও নির্দ্দিষ্ট হয়ে রইল। আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে বাসায় ফিরলাম। এবং আত্মসম্বরণ করে গল্পটি লিখতেই মন দিলাম। গল্পটি শেষ হল। আমার সেদিনের সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু বঙ্গশ্রীর সহকারী সম্পাদক কিরণ রায় এসে গল্পটি শুনেই গল্পটি জোর করে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলেন। এবং সেইদিনই দুপুরবেলা—সম্পাদক সজনীকান্ত টেলিফোন ক'রে বললেন—গল্পটি শুনে তাঁর এত ভাল লেগেছে যে, তিনি বঙ্গশ্রীর প্রথম সংখ্যাতেই গল্পটি ছাপতে চান। এবং তাই ছাপা হল। আরও হল—বঙ্গশ্রী প্রকাশের পর থেকে আমার রচনার এবং সাহিত্যজীবনের নূতন যাত্রা—তার সূচনা হল এই গল্পটি থেকে। আমার প্রিয়গল্পের গল্পগুলির মধ্যে স্মৃতি ও ইতিহাসের দিক থেকে সেই কারণে সন্ধ্যামণি আমার সব চেয়ে প্রিয় গল্প।

সপ্তম গল্প—সনাতন। সনাতন গল্পটি আমার প্রিয়—ছুটি কারণে। প্রথম সনাতন গল্পের সনাতন মানুষটি আমার একান্ত প্রিয় জন। এ গল্পে সনাতনের

মনিব-বংশের তরুণ মনিবটি একরকম আমি নিজে। বাল্যকালে সনাতনের গল্প শুনেছি। বুড়ো সনাতনকে দেখেছি। সনাতনের সরলতা বা বোকামিগুলি এমন অসাধারণ কিছু নয়; লবঙ্গ শব্দের অর্থ বুঝতে পারে না—এমন মানুষ আজও বোধ হয় আছে। সনাতনের মত মৃত্যুভয়ও আছে। বড় মানুষের মধ্যে আছে। চেপে রাখেন তাঁরা। কিন্তু সনাতন তার জীবনে এই সত্যটিকে অকপটে প্রকাশ করেছে। মৃত্যুকে ভয় সকলেই করে। এক শ্রেণীর মানুষ নচিকেতার মত তাকে জানতে চেষ্টা করেন। অমিত সাহসে অনন্ত তৃষ্ণায় প্রশ্ন করেন—জানতে চেষ্টা করেন, জানেন। বাকী মানুষের সকলেই তার ভয়ে কতক নানাভাবে তাকে ভুলে থাকতে চেষ্টা করেন, ভুলে থাকেন। অকস্মাৎ মৃত্যু আসে—জীবনের অবসান ঘটে। ঐ আসার সময়টায় কিছুক্ষণের জন্য হয় আতঙ্কে নয় হতাশায় হতচেতন হয়ে তাঁরা প্রায় অসহায় ভাবেই মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। সনাতন হয় তো সাধারণ বিচারে এদেরও পিছনের মানুষ। মৃত্যুভয়ে ত্রস্ত হয়ে সে ছুটে বেড়াচ্ছে। তাকে 'মর' বললে সে প্রিয়তমাকেও ত্যাগ করে। কথাটার আতঙ্কেই অস্থির। তবু সে এই মহাসত্যকে বিস্মৃত হয় নাই। এই কারণেই তাকে আমার এত ভাল লেগেছিল। শুধু তাই নয়—পরিণত কালে সে যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হল—সে তখন নিঃশঙ্ক সহজভাবে তার সম্মুখীন হল। এইটিই জীব বা জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। তার সুস্থ দেহের মধ্যে জীবন পূর্ণ পরিণতিতে উপনীত হয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে, তখন মৃত্যু হয়ে গেছে অমৃত। কোন মৃত্যুশঙ্কাই তখন নেই তার। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু এসেছে এবং তখন সে অতি স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করেছে। এবং মৃত্যু বলে সে অনুভব করতেই পারে নি। সনাতন নাম দিয়েছি যার তার এই মৃত্যু-ঘটনাটি মনে রেখাপাত করেই ক্ষান্ত থাকে নি, একটি সত্যও উপলব্ধি করেছিলাম। এই কারণেই গল্পটি প্রিয়গল্প শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নবম গল্প—দেবতার ব্যাধি। এ গল্পটি আমার অতি প্রিয় গল্প। তার কারণ গল্পের নায়কের প্রতি নিগূঢ় প্রীতি ও অন্তরঙ্গতা। দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত অন্তর এই মানুষটির মর্মান্তিক আক্ষেপ বেদনা আমাকে অধীর করে তুলেছিল। মানুষ বড় অসহায়। মহাপ্রকৃতির অদ্ভুত এই বিশ্বমণ্ডলটিতে যে ভাল এবং মন্দের দ্বন্দ্ব চলেছে—আলোতে অন্ধকারে, সতে অসতে, হিংসায় প্রেমে, ত্যাগে ভোগে, লালসায় সংযমে চলেছে যে লীলা, যে খেলা—সেই খেলায় এমনই ভাবে

মানুষ জীবনযুদ্ধে সত্তে প্রেমে ত্যাগের সাধনায় জয় লাভ করতে করতে এক জায়গায় হেরে যায়। এ যেন শবসাধকের সাধনাভ্রষ্ট হওয়া। তখন আর তার পরিত্রাণ থাকে না। এ যেন লখীন্দরের লোহার বাসরঘরের এক কোণে একটি সরিষাপ্রমাণ ছিদ্র। সেই ছিদ্রপথ কালনাগিনীর বিষনিশ্বাসে গলে গিয়ে সুগম রন্ধ্রপথ সৃষ্টি করে। তখন আর লখীন্দরের পরিত্রাণ থাকে না। দেবতার ব্যাধির নায়কের অসহায় অবস্থার কথা যখনই মনে করি তখনই বেদনায় আমার অন্তর টনটন করে ওঠে। আসলে মানুষটি ছিলেন বিপত্নীক। কত রাত্রি দেখেছি স্ত্রীর ছবি ফুলের মালায় সাজিয়ে ধ্যান করছেন। ধূপ ধূনো জেলেছেন। কি কঠিন তপস্যাই না করেছেন এই ব্যাধি বা শাপ থেকে নিষ্কৃতি পেতে। কিন্তু কিছুতেই নিষ্কৃতি পান নি। জীবজীবনের অন্তঃস্থল-বাসিনী কুটিল ক্ষুধা রূপিণী তামসী নিষ্কৃতি দেয় নি। ডাক্তার বলতেন—তারাশঙ্করবাবু, এই তামসীকে আমি মহাশক্তি বলে গণ্য করিনি—চিনতে পারি নি, তাই তাকে পূজায় প্রসন্ন করিনি। তাকে sublimate না করে eliminate করতে চেয়েছিলাম। তাঁর দুঃখে আমি কেঁদেছি। ডাক্তারটি একদিন এসে আবার একদিন চলে গেলেন। একেবারে নিরুদ্দেশ।

অষ্টম গল্প—রসকলি। রসকলি আমার সাহিত্যজীবনের প্রথম গল্প। কল্লোলে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যায়। আমার প্রথম গল্প আমার প্রথম সন্তানের মতই প্রিয়।

দশম গল্প—বোবাকান্না। একাদশ গল্প বা শেষ গল্প—শেষ কথা। এ গল্পদুটির স্থান শ্রেষ্ঠগল্প সঞ্চয়নে হওয়া উচিত ছিল। শ্রেষ্ঠ গল্পের নির্ব্বাচনে আমি কোন মত প্রকাশ করি নি। কিন্তু এদুটি গল্প ওর মধ্যে না যাওয়ায় একটু ক্ষুন্ন হয়েছিলাম। প্রিয়গল্পের মধ্যে সেই কারণেই ওদুটি অন্তর্ভুক্ত করে দিলাম। ওদুটি শ্রেষ্ঠ বলে স্থান না পাওয়ায় যেখানে আমার মন ক্ষুন্ন হয়েছিল—সেখানে নিঃসংশয়ে ওদুটি আমার প্রিয় গল্প। ইতি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রায়বাড়ি

১২৭০ সাল—ইংরেজী ১৮৬৩ সালের ঘটনা। সিপাহীযুদ্ধ সবে শেষ হইয়াছে। অগ্নি নিবিয়াছে, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ তখনও সম্পূর্ণরূপে বিকীরিত হয় নাই। দেশের লোকের অসি গিয়াছে, কিন্তু বাঁশের লাঠি তখনও বাঁশীতে পরিণত হয় নাই। তখন লোকে বাবরি চুল রাখিত, কিন্তু বব ছাঁটে নাই। জমিদার তখনও ভূস্বামী, এবং তাঁহাদের সে স্বামিত্বের সত্যকার অর্থ তাঁহারা বজায় রাখিয়াছিলেন।

রাজারামপুরের রায়বাড়ির তখন অসীম প্রতাপ। এখনও একটা কথা প্রচলিত আছে—রায়বাড়ির রাজ্যের মধ্যে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল পান করিত, দুর্দান্ত বাঘকেও নাকি হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। রায়বংশের চতুর্থ পুরুষ রাবণেশ্বর রায় তখন রায়বাড়ির একক উত্তরাধিকারী। ১০৯২ নম্বর লাট হুদ্দা-শ্যামপুরের মাতব্বর প্রজারা আসিয়া সদরে কাঁদিয়া গড়াইয়া পড়িল, হুজুর রক্ষা করুন।

হুদ্দা-শ্যামপুরে দুর্দান্ত মুসলমান বাগদী ও হাড়ী লাঠিয়ালের বাস, এবং এখানকার সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন অধিবাসীরা কূট-কৌশলী, পাকা ষড়যন্ত্রী। আজ দুই পুরুষ তাহারা বিনা খাজনায় ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে, পঞ্চাশ বৎসর কোন জমিদার এখানে পুণ্যাহ করিতে পারেন নাই। চার-পাঁচ ঘর জমিদারের হাত-ফের হইয়া অবশেষে হুদ্দা-শ্যামপুর রাবণেশ্বর রায়ের হাতে আসিল। শেষ জমিদার আক্রোশভরে রাবণেশ্বর রায়কে ডাকিয়া পত্তনি বিলি করিলেন। রায় তাঁহার ইষ্টদেবী কালীমাতার সেবায়েতস্বরূপে সম্পত্তি পত্তনি গ্রহণ করিলেন। আজ পূর্ণ এক বৎসর বিরোধ চালাইয়া বোধ হয় ক্লান্ত হইয়াই প্রজারা আসিয়া রায়-দরবারে গড়াইয়া পড়িল।

প্রজারা সংখ্যায় ছিল চল্লিশজন। লাট শ্যামপুরের মধ্যে গ্রামের সংখ্যা ছত্রিশখানি, ছত্রিশখানি গ্রামের ছত্রিশ জন মণ্ডল-প্রজা আসিয়াছিল; তাহার উপর সঙ্গে ছিল শ্যামপুরের কবিরাজ রামপ্রাণ গুপ্ত, সম্ভ্রান্ত কায়স্থ জোতদার রাধানাথ দাস, আর ছিল ঘাঁটিতোড় গ্রামের মুসলমান প্রজাদের মুখপাত্র

ওবেদার রহমন ও তিন্নু মিয়া। বেলা তখন অপরাহ্ণেরও শেষভাগ, সন্ধ্যা হইতে বিশেষ বিলম্ব ছিল না। রায়-সরকারের কাছারি তখন আবার দ্বিতীয় দফায় আরম্ভ হইয়াছে। চারিদিকে তকমা-আঁটা হরকরা-চাপরাসীদের যাওয়া-আসার বিরাম নাই, লোকজনে কাছারি গিসগিস করিতেছে। শ্যামপুরের প্রজারা ইহার পূর্বে কয়েক ঘর জমিদারের সহিত বিবাদ করিয়াছে এবং তাঁহাদের ঘায়েল করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহারা ছিলেন মধ্যশ্রেণীর জমিদার, এতবড় জমিদার শ্যামপুরের প্রজারা দেখে নাই। কাছারির পরিধি ও গাম্ভীর্য দেখিয়া তাহাদের মুখ শুকাইয়া গেল।

কবিরাজ রামপ্রাণ গুপ্ত রসিক লোক, সে উঁকি মারিয়া দেখিয়া শুনিয়া অনাবশ্যকভাবে কাছাটা আর একটু সাঁটিয়া বলিল, কাছারিই বটে রে বাবা, কাছার অরি। কিন্তু হুজুর কই? শ্যামপুরের নির্দিষ্ট গোমস্তা ঠাকুরদাস চক্রবর্তী হাসিয়া বলিল, হুজুর বসেন দোতলায়। সকলের দৃষ্টি আপনা হইতেই উপরে দোতলার জানালার দিকে নিবদ্ধ হইল। সুদীর্ঘ অট্টালিকার দ্বিতলে সারি সারি জানালা, আবার ওপাশে নূতন ভারা বাঁধা রহিয়াছে—আরও ঘর তৈয়ারি হইতেছে। রায়-হুজুর শখ করিয়া নাচ-গান-মজলিসের জন্য প্রকাণ্ড একটি ঘর তৈয়ারি করাইতেছেন। প্রজারা সভয় বিস্ময়ে প্রত্যেক জানালার দিকে চাহিয়া তাহাদের কল্পনার মানুষটিকে খুঁজিতেছিল।

গোমস্তা বলিল, এ দোতলায় হ'ল সব নায়েব সেরেস্তা, নায়েববাবুরা বসেন এখানে। হুজুরের কাছারি এখান থেকে দেখা যায় না, ওপাশে ফুলবাগানের সামনে—

ঠিক এই সময় একজন হরকরা আসিয়া কথায় বাধা দিল, গোমস্তাকে বলিল, নায়েববাবু ডাকছেন আপনাকে।

গোমস্তা চলিয়া গেল।

গুপ্ত হাসিয়া বলিল, দাসগুষ্টী, দেশে বর্গী এসেছে, দুষ্টু ছেলেদের ঘুম পাড়াও —গোলমাল করলেই বিপদ।

রাধানাথ দাস চিন্তাকুল মুখে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তাই দেখছি।

গুপ্ত এবার ওবেদার রহমনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোবা তোবা বল চাচা, মুখে যে মাছি ঢুকছে! বলি, হাঁ ক'রে দেখছ কি?

পিছন হইতে রতন মণ্ডল বলিল, বাহারের লম্বা কেটেছে কিন্তু দালানে গুপ্ত মশায়!

অপর একজন বলিয়া উঠিল, এ যে গোলকধাঁধা রে বাপু, ইদিকে দালান, উদিকে দালান—আড়ে দীঘে ওর নাই রে বাবা—হু-হু!

আসুন, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।—একজন সরকার আসিয়া তাহাদের সকলকে আহ্বান করিল।

গুপ্ত বলিল, আমাদিগে বলছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাদের ভার আমার ওপর, আমি কালীমায়ের দেবোত্তরের সরকার।—সরকার অগ্রসর হইল।

গুপ্ত কৃত্রিম ভয়ে বিহ্বলতার ভান করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, ও দাসজী, কোথায় নিয়ে যাবে হে বাপু? গারদে, না, একেবারে—

বিরক্তিভরে বাধা দিয়া রাধানাথ দাস কহিল, চুপ কর গুপ্ত, সব সময়েই তোমার ইয়ে, হ্যাঁ!

ওবেদার রহমন হাসিয়া বলিল, ভয় কি চাচা? আমাদের বাড়িও ঘাঁটিতোড়, লাঠির ডগায় ঘাঁটি তোড়াই হ'ল আমাদের ব্যবসা। ভয় কি, ঘাঁটি ভেঙে তোমাকে পিঠে ক'রে নিয়ে পালাব।

কাছারি পার হইয়া রাধাগোবিন্দজীর মন্দির, তাহার পর জগদ্ধাত্রীর বাড়ি, তাহার পর একেবারে গঙ্গার কূলের উপরেই রায়-চৌধুরীদের কালীবাড়ি। গঙ্গা যখন কূলে কূলে পাথার হইয়া উঠে, তখন কালীবাড়ির বাঁধা ঘাটের প্রশস্ত চত্বরের গায়ে গঙ্গার জল ছল-ছল করিয়া আঘাত করে। ভিতরে দক্ষিণমুখী মন্দিরের সম্মুখে সুবৃহৎ সুউচ্চ নাটমন্দিরকে পরিবেষ্টন করিয়া তিন দিকে খিলানের বারান্দাযুক্ত সারি সারি একতলা ঘর। দক্ষিণ দিকের বারান্দার কোণে পাশাপাশি দুইটি ঘরের দরজা খোলা ছিল; খোলা দরজা দিয়া দেখা যাইতেছিল, ঘরে শতরঞ্জির উপর সাদা চাদর ধপধপ করিতেছে, এক দিকে সারি সারি বালিস পড়িয়া আছে। ঘরের দরজার সম্মুখেই প্রকাণ্ড দুইটা জালায় জল ও বড় বড় ঘটি রাখিয়া দুই জন চাকর অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে।

সরকার বলিল, এইখানে আপনারা বিশ্রাম করুন। মুসলমান যাঁরা আছেন, তাঁদের জন্যে ওপাশে ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে। ঘরে জিনিসপত্র রেখে দিন।

আগন্তুকদের কেহ কোন উত্তর দিল না, সকলে সবিস্ময়ে দেখিতেছিল ঠাকুরবাড়ি। হাত-মুখ ধুইয়া নাটমন্দিরে উঠিয়া তাহাদের বিস্ময় বিপুল

হইয়া উঠিল। শুধু বিস্ময় নয়, শ্যামপুরের দুর্দান্ত অধিবাসীদলের শরীর কেমন ছমছম করিয়া উঠিল। প্রকাণ্ড নাটমন্দিরের অসাধারণ উচ্চতা সত্যই মানুষকে কেমন অভিভূত করিয়া ফেলে। তাহার উপর এতবড় নাটমন্দিরটার অভ্যন্তর ভাগ তখন আধ-আলো আধ-ছায়ায় যেন থমথম করিতেছিল। চোখের সম্মুখের অন্ধকার ধীরে ধীরে কাটিয়া পরিবেষ্টনীর সম্পূর্ণ রূপ তাহাদের দৃষ্টিতে ধরা দিতেই তাহারা সভয়ে শিহরিয়া উঠিল। নাটমন্দিরের চারিপাশে থামের গায়ে নানা আকারের বলির খড়্গ আলোকের অভাবে প্রভাহীন শাণিত রূপ লইয়া ঝুলিতেছিল। মন্দিরের ঠিক সম্মুখেই দক্ষিণে বামে সুবৃহৎ দুই যূপকাষ্ঠ।

দেবীমন্দিরের দ্বার তখন রুদ্ধ ছিল। রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখেই প্রণাম সারিয়া তাহারা আসিয়া বসার ঘরে আশ্রয় লইল। দুর্দান্ত ভয়ে ও আকুল চিন্তায় আচ্ছন্ন নির্বাক হইয়া সব বসিয়া রহিল।

সহসা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রাধানাথ দাস বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিল, কে রে বাপু, ফোঁসফোঁস করছিস কে?

কেহ উত্তর দিল না। এই সময় একজন চাকর আলো লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল, সেই আলোয় দেখা গেল, এক কোণে বালিসে মুখ গুঁজিয়া প্রৌঢ় বিপিন মোড়ল ফোঁসফোঁস করিয়া কাঁদিতেছে। দাস দাঁত কিসকিস করিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্বেই চাকরটা বলিয়া উঠিল, হুজুর আসছেন। বলিতে বলিতেই সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

ঘরের ছাদের উপর রাবণেশ্বর রায়ের খড়মের শব্দ খটখট করিয়া কঠোর শব্দে বাজিতেছিল, সমস্ত ছাদটা সঞ্চারিত করিয়া একটা কম্পন অনুভূত হইতেছিল।

দাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, ওঠ ওঠ সব, নজরের টাকা বার কর। গুপ্ত—গুপ্ত, শেখজীদের সব ডাক হে। আঃ, সব মাটি করলে!

বাহিরে নাটমন্দিরে তখন দেওয়ালগিরিতে ঝাড়-লণ্ঠনে সারি সারি বাতি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। প্রজারা সকলে সারি দিয়া নাটমন্দিরে উঠিবার সিঁড়ির মুখে রায়-হুজুরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

রাবণেশ্বর রায় নামিতেছিলেন দোতলার সিঁড়ি বাহিয়া। নাটমন্দিরের আলোকমালার ছটার প্রাচুর্যে প্রজারা তাঁহাকে সভয় বিস্ময়ে দেখিল। দীর্ঘাকার পুরুষ, খড়্গের মত তীক্ষ্ণ দীর্ঘ নাসিকা, আয়ত চোখ, সর্বাঙ্গের মধ্যে

স্থূলতার এতটুকু চিহ্ন নাই, কিন্তু সিংহের মত বলিষ্ঠ দেহ—প্রশস্ত বক্ষ, ক্ষীণ কটি। বয়স প্রায় চল্লিশ। পরিচ্ছদ ও ভূষণের মধ্যে পরনে গরদের কাপড়, কাঁধে নামাবলী, অনাবৃত বক্ষে শুভ্র উপবীত ও রুদ্রাক্ষের মালা, দক্ষিণ বাহুতে সোনার তাগায় একটি মোটা রুদ্রাক্ষ, হাতের অনামিকায় নবরত্নের একটি আংটি।

হিন্দু প্রজারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, মুসলমান প্রজারা আভূমি নত হইয়া সেলাম করিল। সঙ্গে সঙ্গে ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছিল নজরের টাকার।

রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথাকার প্রজা ?

কর্তার পিছনে ছিল দেবোত্তরের নায়েব, সে উত্তর দিল, আজ্ঞে, হুদ্দা-শ্যামপুর—কালীমায়ের নতুন মহাল।

হুদ্দা-শ্যামপুর ?

রাবণেশ্বর রায় ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, তাঁহার কাঁধের নামাবলীখানা স্খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। নায়েব তাড়াতাড়ি সেখানা উঠাইয়া লইল। রায় গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তারা—তারা !

তারপর ভ্রূক্ষেপহীন পদক্ষেপে নাটমন্দিরের উপরে উঠিয়া গেলেন, সে পদক্ষেপের তাড়নায় নজরের টাকাগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। নায়েব দেখিয়া শুনিয়া নজরের টাকাগুলি গুনিয়া-গাঁথিয়া তুলিয়া লইলেন। ওদিকে তখন দেবীমন্দিরের দ্বার খোলা হইয়াছে, প্রকাণ্ড কাঁসরখানায় ঘন ঘন শব্দে ঘা পড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাক কাঁসি শিঙা বাজিতেছিল। পবিত্র ষোড়শাঙ্গ ধূপের গন্ধে নাটমন্দির আমোদিত।

আরতি শেষ হইতেই প্রজারা নীরবে প্রণাম সারিয়া আবার আসিয়া ঘরে আশ্রয় লইল। সরকার আসিয়া আহ্বান করিল, আসুন আপনারা, মায়ের শীতলের প্রসাদ নিয়ে জল খাবেন আসুন।

নাটমন্দির হইতে ডাক আসিল, সরকার !

একজন খানসামাকে ও দেবীমন্দিরের পরিচারককে জলযোগের ব্যবস্থায় নিযুক্ত করিয়া সরকার তাড়াতাড়ি কর্তার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। বারান্দায় বসিয়া জলযোগ করিতে করিতে প্রজারা শুনিল, কর্তা প্রশ্ন করিতেছেন, প্রজারা কতজন এসেছেন ?

আজ্ঞে, চল্লিশ জন।

খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মাছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্যবস্থা হয়েছে।

কত?

আজ্ঞে, দশ সের।

হুঁ। দুধ?

সরকার এবার চুপ করিয়া রহিল। কর্তা আবার প্রশ্ন করিলেন, দুধের ব্যবস্থা হয়েছে?

আজ্ঞে অবেলায়—। সরকার আর উচ্চারণ করিতে পারিল না।

কর্তা বলিলেন, অতিথি তিথি মেনে আসে না, বেলা দেখে আসে না। যাও, বাড়ির দুধ নিয়ে এস।

সরকার যেন বাঁচিল, সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইল। কর্তা আবার বলিলেন, গিন্নীর কাছে খবর নাও, লক্ষ্মী-নারায়ণজীর দরবারে, মা-জগদ্ধাত্রীর দরবারে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক আছে কি না!

সরকার চলিয়া গেল। রায়-কর্তা জপমালা লইয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন—তন্ত্রমতে সন্ধ্যাতর্পণ জপ করিবেন।

নিস্তব্ধ নাটমন্দির। পরিচারক পূজারীর দল নিস্তব্ধ ভাবেই আনাগোনা করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে মন্দির-অভ্যন্তর হইতে মোটা ভরাট গলায় রায়-কর্তা ডাকিতেছিলেন, তারা—তারা!

সে কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটি অকৃত্রিম আবেগ রনরন করিয়া বাজিতেছিল।

অনেকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সরকার ও শ্যামপুরের গোমস্তা ঠাকুরদাস চক্রবর্তী আসিয়া ডাকিল, উঠুন সব, খাবারের ঠাঁই হয়েছে।

গুপ্ত নিজে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, মরেছে রে, বেটা চাষারা সব মরেছে। নরম বালিস মাথায় দিয়েছে, কি মরণ-ঘুমে—

গোমস্তা চক্রবর্তী মৃদু স্বরে বলিল, চুপ চুপ, বাইরে হুজুর আছেন।

প্রজারা বাহিরে আসিয়া দেখিল, রায়-কর্তা নিজে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পরনে এখন কোঁচানো মিহি থান-ধুতি, গায়ে গিলা-করা পাঞ্জাবি, পায়ে চটি। সকলে মাথা হেঁট করিয়া খাইতে বসিল।

কর্তা বলিলেন, কি হে, হুব্দা-শ্যামপুরের সব বড় বড় বীরের কথা শুনেছি; কিন্তু কই, আহার কই সব? খাচ্ছ কই তোমরা?

কর্তার কণ্ঠস্বর ঈষৎ জড়িত, কিন্তু একটি অনাবিল প্রসন্নতায় হৃদ্য। গুপ্ত অভয় পাইয়া বলিল, আজ্ঞে হুজুর, মা-লক্ষ্মী বড় কাহিল কাহিল ঠেকছেন, আমরা ভাল খেতে পারছি না হুজুর।

কর্তা বলিলেন, ভেঙে বল তো বাপু, কি হয়েছে!

আজ্ঞে, এই সরু চালের অন্ন আমাদের কেমন জল জল লাগছে। এই মোটা আকাঁড়া চালের ভাত ভিন্ন আমাদের মিষ্টি লাগে না হুজুর।

কর্তা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, তারপর হুকুম করিলেন, ঠাকুর, মোটা চালের ভাত নিয়ে এস।

সুযোগ বুঝিয়া রাধাচরণ দাস বলিয়া উঠিল, হুজুর যদি অভয় দেন তো একটি নিবেদন পাই।

হৃষ্ট কণ্ঠস্বরে কর্তা বলিলেন, বল বল।

হুজুর, রাজায় প্রজায় সম্বন্ধ হ'ল বাপ আর বেটা।

কর্তার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিলেন, শুনে তো আসছি তাই চিরকাল। কিন্তু বেটায় এত বাপ বদল করে কেন হে? পছন্দ হয় না?

রাধাচরণের মাথা হেঁট হইয়া গেল। সকলের আহার শেষ হইলে সমস্ত ঠাকুরবাড়িগুলি ঘুরিয়া রায়-কর্তা দ্বিতলে উঠিলেন।

পরদিন প্রাতে প্রজাদের কাছারিতে তলব হইল। মিটমাটের কথাবার্তা সমস্ত সুশেষ করিয়া প্রজারা বিদায় লইল। প্রত্যেকের বিদায় মিলিল ধুতি ও চাদর, এবং ফিরিবার গাড়িভাড়া প্রত্যেককে দেওয়া হইল। গুপ্তকে চিকিৎসক জানিয়া সম্মানীস্বরূপ পাঁচ বিঘা নিষ্কর ভূমির সনন্দ রায়-কর্তা সহি করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। নূতন জলসাঘরের নকশাগুলি তিনি দেখিয়া দিবেন।

মাস খানের পর।

রাবণেশ্বর রায় আহারান্তে দ্বিপ্রহরে অন্দরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। রায়-গিন্নী পাশে বসিয়া পাখার বাতাস দিতেছিলেন। ঝি আসিয়া খবর দিল, কোন্ গোমস্তার পরিবার এসেছে, খুব কান্নাকাটি করছে।

কর্তা উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, উঠে যাও গিন্নী, দেখ কার কি হ'ল!

রায়-গিন্নী উঠিয়া একটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। স্ত্রীলোকটির কাপড়খানা জীর্ণ নয়, কিন্তু কাদায় ধুলায় মালিন্যের আর তাহাতে শেষ নাই, তাহার কোলে একটি শিশু।

শিশুটিকে রায়-কর্তার পায়ের উপর ফেলিয়া দিয়া মেয়েটি মূর্তিমতী বিষণ্ণতার মত দাঁড়াইয়া রহিল।

গিন্নী সজল চক্ষে কহিলেন, হুদা-শ্যামপুরের গোমস্তা ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর স্ত্রী।

মেয়েটি এবার হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কর্তার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। কর্তা শশব্যস্তে বলিলেন, ওঠ মা, ওঠ, কি হয়েছে বল।

গিন্নী বলিলেন, প্রজারা চক্রবর্তীকে পুড়িয়ে মেরেছে। নগ্‌দী কোন রকমে এদের নিয়ে এখানে এসেছে।

রায়-গিন্নীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। দরদরধারে চোখের জলে বক্ষ-বাস সিক্ত হইয়া উঠিল।

কর্তা গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, যুগলা!

যুগল খানসামা দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কর্তা বলিলেন, দেখ্, কাছারিতে কোথায় হুদা-শ্যামপুরের নগ্‌দী এসেছে। তাকে নিয়ে আয়।

সবিস্ময়ে যুগল প্রশ্ন করিল, এখানে?

কর্তা যুগলার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন শুধু। যুগলা আর উত্তরের প্রতীক্ষা করিল না, দ্রুতপদে চলিয়া গেল। কর্তা ধীর পদক্ষেপে কক্ষের মধ্যে পদচারণা করিতে করিতে বলিলেন, মৃত্যুর ওপরে হাত নেই মা, কি করব বল! তবে নিশ্চিন্ত থাক তুমি, আমার ছেলে বিশ্বেশ্বর যদি খেতে পায়, তা হ'লে তোমার ছেলেও পাবে। যাও গিন্নী, ওঁকে স্নান করিয়ে কিছু খেতে দাও। যাও মা, তুমি ওঁর সঙ্গে যাও।

মেয়েটি ধীরে ধীরে গিন্নীর সহিত চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই যুগলা নগ্‌দীকে সঙ্গে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে যাহা বলিল, তাহা এই—প্রজারা এখানে মৌখিক মিটমাটের কথা শেষ করিয়া গেলেও ভিতরে ভিতরে তাহারা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিতেছিল। হুজুর নাকি এখানে তাহাদের বাপ তুলিয়া কি গালিগালাজ করিয়াছিলেন! জমিদার-পক্ষীয় কেহ কিন্তু তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারে নাই। ঘটনার দিন গোমস্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া গুড়-তৈয়ারি-করা উনানের মধ্যে

পুড়াইয়া মারিয়াছে। সঙ্গের চাপরাসী দুই জনও জখম হইয়া এখনও সেখানে যে কি অবস্থায় আছে, তাহা সে বলিতে পারে না। তাহার পরই উন্মত্ত প্রজারা আসিয়া কাছারি-ঘরে আগুন দেয়। নগদী কোন রকমে গোমস্তার স্ত্রীপুত্রকে লইয়া সদরে আসিয়া হাজির হইয়াছে।

রায়-কর্তা একটা ক্রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হুঁ।

তারপর পাশের ঘরে গিয়া ঘুমন্ত একমাত্র পুত্র বিশ্বেশ্বরের হার খুলিয়া লইয়া নগ্‌দীর হাতে দিয়া বলিলেন, নিয়ে যা। যুগলা, গিন্নীর কাছে একে নিয়ে যা, বলবি, বিশ্বেশ্বর যা খায়, তাই যেন একে খেতে দেওয়া হয়। নিজে পাশে ব'সে যেন তিনি খাওয়ান। আর কেলে বাগদীকে ডেকে নিয়ে আয়—এখুনি—এইখানে।

কিছুক্ষণ পরে যুগলার পিছন পিছন দীর্ঘ শীর্ণ প্রেতের মত এক মূর্তি অন্দরে একেবারে কর্তার শয়নকক্ষে নিঃশব্দ পদক্ষেপে গিয়া প্রবেশ করিল। কালী বাগদীর পদশব্দ নাকি বিড়াল কি বাঘের মত শোনা যায় না। কিন্তু বাগদীর অন্দর-প্রবেশে অন্দরবাসিনীরা সচকিত হইয়া উঠিল। এ ব্যবস্থা অভিনব, রায়-অন্দরে খানসামা ও কদাচিৎ নায়েব ব্যতীত অপর কেহ কখনও প্রবেশ করে নাই। অন্দরের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন গুঞ্জিত হইয়া উঠিল।

রায়-গিন্নী কথাটা শুনিয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কালী বাগদীর পরিচয় তাঁহার কাছে অজ্ঞাত ছিল না। তিনি তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেলেন। ঘরে প্রবেশ-মুখেই তিনি শুনিলেন, রায়-কর্তা বলিতেছেন, ছত্রিশ মৌজা কালো ক'রে দিয়ে আসতে হবে। একখানা চালা বাঁচলে তোর মাথা বাঁচবে না, বুঝলি? কেউ যেন এক ফোঁটা জল আগুনে দিতে না পারে।

কালী অত্যন্ত শান্ত স্বরে বলিল, এই বেলাতেই বেরিয়ে পড়ছি আমরা।

রায়-গিন্নী ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, না, তা হবে না, আমি হতে দেব না।

কর্তা বাঘের মত গর্জন করিয়া উঠিলেন, কি হবে না?

গ্রাম পোড়াতে আমি দেব না। প্রজা-শাসন—

রায়-কর্তা বাধা দিয়া বলিলেন, যা বোঝ না গিন্নী, সে বিষয়ে হাত দিতে যেও না।

গিন্নী এবার বলিলেন, কালী, তুই যদি যাবি—

কালীর দিকে ফিরিয়া তিনি দেখিলেন, কই কালী? কালী কখন নিঃশব্দ পদক্ষেপে চলিয়া গিয়াছে।

গিন্নী বলিলেন, ফিরিয়ে আন, ডাক ওকে।

গিন্নী, মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের। শ্যামপুরের প্রজারা আমার মাথায় পা দিয়েছে।

কেন, আমার বাবাও তো জমিদারি শাসন করেন—

হাসিয়া রায়-কর্তা বলিলেন, বৈষ্ণবী মতে। কিন্তু আমরা শাক্ত গিন্নী, তোমার বাপেদের সঙ্গে আমাদের মতে মিলবে না। দেখলে তো, সেপাই-হাঙ্গামা কোম্পানি কেমন ক'রে শাসন করলে!

রায়-গিন্নীর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, বলিলেন, দেখ, প্রজা না হয় দোষ করেছে, কিন্তু তাদের স্ত্রীপুত্র—

রায়-কর্তা ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। অসময়েই আজ অন্দর হইতে বাহির হইয়া কাছারিতে চলিয়া গেলেন।

দিন পাঁচেক পর। রায়-কর্তা কালীমন্দিরে সন্ধ্যাতর্পণ করিয়া নাটমন্দির হইতে নীচে নামিতেছেন, এমন সময় নাটমন্দিরের থামের সুদীর্ঘ ছায়া যেন কায়া গ্রহণ করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ছায়ার সঙ্গে মিশিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—কালী বাগদী। সে আসিয়া প্রণাম করিয়া এক পাশে দাঁড়াইল।

কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কালী?

শান্ত মৃদুস্বরে কালী কহিল, কাজ হয়ে গিয়েছে হুজুর।

কর্তা বলিয়া উঠিলেন, তারা—তারা!

তারপর ডাকিলেন, অক্ষয়! অক্ষয় কালীমন্দিরের পরিচারক। সে আসিলে বলিলেন, কালীকে মায়ের প্রসাদী কারণ দাও গিয়ে।

আবার বলিলেন, কিছুদিন পর আবার একবার।

কালী নিঃশব্দে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

রায়-গিন্নীর কাছে সংবাদটা কিন্তু গোপন রহিল না। তিনি কাঁদিয়া কহিলেন, উঃ, এই বোশেখ মাস—কাল-বোশেখীর দুর্যোগ—ছেলেমেয়ে নিয়ে—উঃ! রায়-কর্তা গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিলেন।

রায়-গিন্নী আবার বলিলেন, লোকের দীর্ঘশ্বাসকে তুমি ভয় কর না? আমার ওই একটি সন্তান—

বাধা দিয়া রায়-কর্তা বলিলেন, রায়বংশে আমাকে নিয়ে চার পুরুষ, বিশ্বেশ্বর পঞ্চম পুরুষ—ওই এক সন্তানই হয়ে আসছে ব্রজরাণী, আর দুর্দান্ত প্রজা-শাসনও এই ধারায় আমাদের হয়ে আসছে। তুমি ওই ঠাকুরদাস চক্রবর্তীর স্ত্রীপুত্রের দিকে তাকিয়ে কথা বল। জান, দ্রৌপদীর বেণী দুঃশাসনের রক্তেই বাঁধা হয়েছিল? কৌরববংশে বিধবার আর সংখ্যা ছিল না।

ব্রজরাণী বলিলেন, কিন্তু গান্ধারীর অভিশাপ? প্রভাসের কথাও স্মরণ কর।

কর্তা স্থির দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ব্রজরাণী বলিলেন, জান, আজ কদিন থেকেই আমি স্বপ্ন দেখি—

এবার হা-হা করিয়া হাসিয়া কর্তা বলিলেন, ছেড়ে দাও স্বপ্নের কথা। আর ভবিষ্যৎই যদি স্বপ্নে তুমি দেখে থাক, তবে তো সে ভবিতব্য, মা-তারার—আনন্দময়ীর ইচ্ছা।

তারপর গভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, তারা—তারা!

রায়-গিন্নী কি বলিতে গেলেন, কিন্তু তাহার পূর্বেই যুগলা খানসামা সাড়া দিয়া সসম্ভ্রমে দরজা খুলিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। দরদালান হইতে হাসিতে হাসিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন—রায়-কর্তার শ্যালক বীজনগড়ের জমিদার হরিনারায়ণ সরকার। আহ্বানের পূর্বেই তিনি বলিলেন, রাধারাণীর হঠাৎ বিয়ের স্থির হয়ে গেল রায় মশায়। আপনাদের নিতে এলাম।

কর্তা গম্ভীরভাবে বলিলেন, ভগ্নী-ভাগ্নেকে নিয়ে যাও ভাই, আমায় নিয়ে যেও না।

চকিত হইয়া হরিনারায়ণ বলিলেন, কেন, আমাদের কি অপরাধ হ'ল?

ব্রজরাণীও উৎকণ্ঠিত হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাবণেশ্বর গম্ভীরভাবে বলিলেন, তোমাকে যে আমি ছাড়া অপরে শালা বলবে, এ আমার সহ্য হবে না। আমার সম্মানে শরিক—

কথা সমাপ্ত না হইতেই হরিনারায়ণ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ব্রজরাণীও হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, এখনও শখ আছে নাকি? বল তো সত্যভামার মত আমিই না হয় রাধারাণীকে তোমার রথে তুলে দিই।

কর্তা শ্যালকের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, বেশ তো গো সত্যভামা দেবী, তার আগে তোমার নারায়ণ কর্তার মতটা নাও।

ব্রজরাণী চোখ-মুখ লাল করিয়া বলিলেন, যাও।

মাস দেড়েক পর। আষাঢ় মাস। সেদিন রথযাত্রার পূর্বদিন।

রাধারাণীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কর্তা কয়েক দিন পরেই ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু গিন্নী ও পুত্র বিশ্বেশ্বর তখনও ফেরেন নাই। কর্তার শাশুড়ী বলিয়াছিলেন, বাবা, ব্রজয় তো আসা বড় একটা ঘটে না, যখন এসেছে, তখন মাস খানেক মায়ের মুখ চেয়ে রেখে যাও।

রাবণেশ্বর সে অনুরোধ ঠেলিতে পারেন নাই; যুগলা খানসামা, কালী বাগদী প্রমুখ কয়েকজনকে সেখানে রাখিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আগামী কল্য রথযাত্রার দিন রায়বাড়ির সদর পুণ্যাহ হইবে। এই দিনটি পুণ্যাহের জন্য বরাবর নির্দিষ্ট হইয়া আছে। পুণ্যাহের দিন দান-ধ্যান, কাঙালী ভোজন, নাচ-গান, জলসা ইত্যাদি সমারোহের বিপুল আয়োজন হইতেছে। সমস্ত রায়বাড়ির এই সময় রঙ ফিরানো হইয়া থাকে। লতায় পাতায় ঠাকুরবাড়ি সাজানো হইতেছে। কয়েকজন বিখ্যাত গায়ক, ওস্তাদ ও যন্ত্রী আসিয়াছেন, সন্ধ্যায় জলসাঘরে জলসা হইবে। রায়-হুজুর জলসার ও নাচ-গানের জন্য নূতন ঘর তৈয়ারি করাইয়াছেন, সেই ঘরে এই পুণ্যাহ উপলক্ষ্যে প্রথম মজলিস বসিবে। সমারোহের প্রাচুর্য এবার কিছু বেশি।

আজ ব্রজরাণী ও বিশ্বেশ্বর ফিরিবেন। আগামী কল্য রায়-গিন্নী উপস্থিত না থাকিলেই নয়। রায়-কর্তা কালীবাড়ি হইতে পুণ্যাহের রৌপ্য-কলস মাথায় করিয়া রাধাগোবিন্দজীর দরবারে আনিয়া স্থাপন করিবেন, গোবিন্দ-মন্দিরে সে কলসী কাঁখে তুলিবেন রায়-গিন্নী। অন্দরে লক্ষ্মীর সিংহাসনে লইয়া গিয়া সে কলসী তিনি স্থাপন করিবেন; রাত্রে লক্ষ্মীপূজা করিবেন।

রায়-সরকারের ভূ-সম্পত্তি বহুবিস্তৃত, সারা বাংলাময়ই ছড়াইয়া আছে। প্রত্যেক মৌজায় নিমন্ত্রণপত্র গিয়াছে, পুণ্যাহপাত্র মণ্ডল-প্রজারা সব—পুণ্যাহের টাকা লইয়া উপস্থিত হইবেন। হৃদ্দা-শ্যামপুরেও নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হইয়াছে, কিন্তু এখনও কেহ উপস্থিত হয় নাই।

সন্ধ্যার ঠিক পূর্বে নায়েব আসিয়া বলিল, কই, গিন্নীমায়ের বজরা তো এসে পৌছল না?

রায়-কর্তা একবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, সময় এখনও যায় নি। কিন্তু হৃদ্দা-শ্যামপুরের—

কথা শেষ না করিয়াই তিনি নীরব হইলেন।

নায়েব বলিল, কই, এখনও তো কেউ আসে নি।

এ কথায় কোন জবাব না দিয়া কর্তা বলিলেন, জলসাঘরে বাতি দিতে বল, আসর বসবে।

নায়েব বলিল, যে আজ্ঞে। তারপর আবার বলিল, গিন্নীমায়ের বজরা দেখবার ছিপ দুখানা— আজকাল ভরা নদী—

সচকিত হইয়া কর্তা বলিলেন, দাও, পাঠিয়ে দাও।

জলসাঘরে মজলিস চলিতেছিল। প্রকাণ্ড বড় একখানি হল-ঘর; এক শত লোকের স্বচ্ছন্দে স্থান সংস্থান হইতে পারে; এক দিকে বড় বড় জানালা, ও বারান্দার দিকে বড় বড় দরজা। সেই ঘরের মেঝে জুড়িয়া বহুমূল্য গালিচা পাতিয়া তাহার উপর আসর বসিয়াছে। দেওয়াল ঘেঁসিয়া বড় বড় তাকিয়া দেওয়া আছে। মাথার উপরে সারি সারি বেলোয়ারী ঝাড় ও দেওয়ালে দেওয়ালগিরির বাতির আলোয় সমস্ত ঘরখানা ঝলমল করিতেছিল। দেওয়ালের গায়ে রায়বংশের পূর্বপুরুষগণের ছবি টাঙানো হইয়াছে। সকলেরই বিলাসবেশের ছবি। আতর-গোলপজলের গন্ধে ঘর আমোদিত। বারান্দার উপর দরজার মুখে মুখে দাঁড়াইয়া চাকরেরা বড় বড় তালপাখার মৃদু আন্দোলনে ঘরে বায়ুপ্রবাহ সঞ্চারিত করিতেছিল। শ্রোতার দল নিস্তব্ধ, বাহিরে পরিচারকের দল সন্তর্পিত পদক্ষেপে মূকের মত চলাফেরা করিতেছে। একজন সেতারী সেতার লইয়া সুরের জাল বুনিতেছে। তবলচি তবলায় সঙ্গত করিয়া চলিয়াছেন। যন্ত্র-ঝঙ্কারে বাতাসে যেন মৃদু তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে—ঝাড়ের বাতির শিখা মৃদু মৃদু কম্পিত, ঘরের সমস্ত ধাতব পাত্রের মধ্যে সে ঝঙ্কারের রেশ সঞ্চারিত—করস্পর্শে বেশ অনুভব করা যায়। সঙ্গীতে যেন ঘরখানা ভরিয়া উঠিয়াছে।

অকস্মাৎ জলসাঘরের বারান্দায় আর্তনাদ করিয়া কে আছাড় খাইয়া পড়িল। সে আর্তনাদ যত মর্মভেদী, সে কণ্ঠস্বরও তেমনই ভয়াবহ কর্কশ। মুহূর্তে রাক্ষসের মত সে আর্তনাদ পুঞ্জীভূত সঙ্গীত-ঝঙ্কারকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ঘরসুদ্ধ লোক চমকিয়া উঠিল, অতর্কিতে চকিত যন্ত্রীর যন্ত্রের তার ছিঁড়িয়া গেল।

বীজনগড় হইতে আসিবার পথে আকস্মিক একটা ঝড়ের তাড়নায় ময়ূরাক্ষী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে ঘূর্ণিতে পড়িয়া বজরা-ডুবি হইয়াছে। রায়-গিন্নী,

বিশ্বেশ্বর—কেহ ফিরেন নাই। ফিরিয়াছে এক কালী বাগদী। বারান্দার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল কর্দমলিপ্ত দীর্ঘাকৃতি প্রেতমূর্তির মত কালী।

রায় গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, তারা—তারা!

তারপর অন্ধকার স্তব্ধ রায়বাড়ি। গভীর রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে কালীমন্দিরের প্রাঙ্গণে রব উঠিতেছিল, তারা—তারা!

নাটমন্দিরে পদচারণা করিতে করিতে রাবণেশ্বর সহসা স্তব্ধ অন্ধকার পুরীর দিকে চাহিয়া ভাবিলেন, জলসাঘর—আর ও-ঘরে আলো জ্বলবে না। প্রথম দিনেই নিবে গেল। রায়বংশ আজ নির্বংশ। জলসাঘর নয়, রায়বংশের সমাধি-গৃহ।

কোনমতে পুণ্যাহ সমাপ্ত হইল। পুণ্যাহের পরদিন রায়কর্তা নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন, শ্রাদ্ধের ফর্দ কর। পুরনো ফর্দে হবে না, নতুন ফর্দ কর। রায়বাড়িতে এত বড় শ্রাদ্ধ যেন আর কেউ না ক'রে থাকে। দশ দিনের মধ্যেই আমি কাজ শেষ করব।

রায়-কর্তা নিজে অন্দরের মধ্যে বসিয়া মুসাবিদা আরম্ভ করিলেন—দানপত্রের। সমস্ত সম্পত্তি দেবত্রে অর্পণ করিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িবেন। এ অন্ধকার পুরীতে আর নয়। মা-আনন্দময়ীর প্রজা তিনি, নিরানন্দ রাজ্যে থাকিতে পারিবেন না। বার বার ব্রজরাণীর প্রতিকৃতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনে মনে বলিলেন, তুমি জানতে পেরেছিলে, ঐশ্বর্য তোমায় মত্ত করতে পারে নি। তারা—তারা!

ধন এবং জনের অভাব রায়বাড়ির ছিল না, কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রাদ্ধের উদ্যোগ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল। সময় সংক্ষেপের জন্য সমস্ত ফর্দ শ্রীরামপুর হইতে ছাপা হইয়া আসিল।

দেশ-দেশান্তর হইতে সমাগত ব্রাহ্মণপণ্ডিত, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবে রায়বাড়ি শোকের সমারোহে মুখর হইয়া উঠিল। হাজারে হাজারে সমাগত কাঙালীতে রাজারামপুর ভরিয়া গেল। মহলে মহলে নিমন্ত্রণ গিয়াছিল; মাতব্বর মণ্ডল-প্রজাও সকলে আসিয়াছিল। পুণ্যাহে না আসিলেও হৃদা-শ্যামপুরের প্রজারা এবার না আসিয়া পারিল না।

রায় বলিলেন, এসেছ তোমরা, ভালই হয়েছে। গিন্নীর একটা অনুরোধ ছিল তোমাদের কাছে, আমিই সেটা জানাই। তোমরা দুঃখ পেয়েছ,

তোমাদের সে দুঃখে তিনি কাতর হয়েছিলেন। তোমাদের যার যা ক্ষতি হয়েছে, সেটা তোমরা গ্রহণ কর।

প্রজারা এবার সত্যই রাজার পায়ে গড়াইয়া পড়িল।

রায়-কর্তা অবিচলিত অশ্রুহীন চক্ষে পত্নী-পুত্রের শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ করিলেন। একে একে সমাগত ব্যক্তিরা বিদায় লইলেন। হরিনারায়ণও আসিয়াছিলেন, তিনি অপরাধীর মত বলিলেন, আমার অপরাধ আমি ভুলতে পারছি না রায় মশায়। আমিই নিমিত্ত হলাম।

রায় হাসিয়া বলিলেন, নিমিত্ত মানে হ'ল কারণ। আনন্দময়ীর প্রসাদী কারণ একটু খাবে হরিনারায়ণ, তা হ'লে বুঝবে, কারণের মালিক কে।

হরিনারায়ণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাবা-মা একটা কথা আপনাকে জানিয়েছেন।

বল।

ইতস্তত করিয়া হরিনারায়ণ বলিলেন, বলেছেন—ব্রজরাণীর অভাবে এতবড় রায়বংশ যেন ভেসে না যায়।

তারা—তারা!

কর্তা ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিলেন, রায়বংশ-শেষের কথা এই মুহূর্তে হরিনারায়ণ তাঁহার প্রত্যক্ষ চিন্তার মধ্যে আনিয়া দিয়াছেন। বহুক্ষণ পরে হরিনারায়ণ আবার বলিলেন, আমার কথা এখনও শেষ হয় নি রায় মশায়।

রায় বলিলেন, বল তুমি হরিনারায়ণ। মাকে ডাকার তো সময়-অসময় নেই, ডাকলাম একবার এমনই। বল, কি বলবে বল।

বাবা-মার অনুরোধ, আমারও প্রার্থনা আপনার কাছে—নন্দরাণীকে আপনি—

অর্থাৎ আমার শালা-ডাক তোমার বড়ই মিষ্টি লাগে, কেমন?—বলিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। নন্দরাণী হরিনারায়ণের সর্বকনিষ্ঠা বিবাহযোগ্যা ভগ্নী। হরিনারায়ণ কিন্তু এ হাসিতে মাথা নত করিয়া রহিলেন, আর তিনি অনুরোধ করিতে পারিলেন না। সর্বশেষ বিদায় লইলেন তিনি।

রায় এবার নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন, সমস্ত এবার চুকিয়ে দাও, আর বাকি কি?

আজ্ঞে, হিসেবনিকেশ হতে এখনও কিছুদিন লাগবে। তা ছাড়া ভাণ্ডারই

এখনও ভাঙা হয় নি। সব জিনিসই দেখছি অনেক উদ্বৃত্ত হয়েছে—কোন জিনিস ছ-আনা, কোন জিনিস সিকি···

বাধা দিয়া বিরক্তিভরে রায় বলিলেন, থাক্‌, ভাণ্ডার যেমন আছে তেমনই থাক্‌। তুমি এই কাগজগুলো একবার দেখে দলিলে চড়িয়ে নিয়ে এস। এক গোছা কাগজ তিনি নায়েবের হাতে তুলিয়া দিলেন। কাগজ-গোছার একখানার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া নায়েব সকাতরে প্রভুর দিকে চাহিল। রায় সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া অদূরবর্তী ভরা গঙ্গার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই দলিল-দস্তাবেজ প্রস্তুত হইয়া গেল। রায় সেদিন ভাবিতেছিলেন, এগুলি সদরে লইয়া গিয়া পাকা করিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু দারুণ বর্ষা নামিয়াছে, বর্ষণের আর বিরাম নাই, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়। এই দুর্যোগের মধ্যে—

সহসা তাঁহার হাসি আসিল, দুর্যোগ! এখনও দুর্যোগের ভয়!

আবার মনে হইল, আর পাকা করিবারই বা প্রয়োজন কি? যে বস্তু ত্যাগই করিবেন, তাহার জন্য আবার মায়া কেন? বন্দোবস্ত করিয়া ত্যাগের কি কোনও অর্থ আছে? খোলা সিন্দুকের সম্মুখেই দলিলগুলি পড়িয়া রহিল, সিন্দুকের চাবি পড়িয়া রহিল শয্যার উপর। রায় গঙ্গার দিকের জানালা খুলিয়া দাঁড়াইলেন। বৃষ্টির ছাটে বাতাসে ঘরখানা বিপর্যস্ত হইয়া গেল, তাঁহারও সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল। তাঁহার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ ছিল না, সবিস্ময়ে তিনি গঙ্গার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দুই কূল ভাসাইয়া গঙ্গা পাথার হইয়া উঠিয়াছে। আর কি গর্জন! কিন্তু এত ফেনা কেন? রাশি রাশি পদ্মপুষ্পের মত ফেনা ভাসিয়া চলিয়াছে। বহুকাল গঙ্গার এমন ভৈরবী মূর্তি তিনি দেখেন নাই। থাকিতে থাকিতে সব চিন্তা ডুবাইয়া দিয়া ওই গঙ্গার সলিলরাশির মধ্য হইতে ব্রজরাণী ও বিশ্বেশ্বরের মুখ ভাসিয়া উঠিল। গঙ্গার রাক্ষসী-রূপ দেখিয়া তাহাদের কথাই মনে জাগিয়া উঠিল।

হুজুর!

ব্যস্তসমস্ত হইয়া নায়েব আসিয়া বহির্দ্বার হইতে ডাকিল, কিন্তু সে ডাক রায়-কর্তার কানে পৌঁছিল না। সাহস করিয়া নায়েব ঘরে প্রবেশ করিল।

সর্বনাশ হয়েছে হুজুর, ওপরে দীঘলমারীর বাঁধ ভেঙেছে। বানের জল ছুটে আসছে তালগাছের মত উঁচু হয়ে।

রায়ের কানে গেল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, ওই যে গঙ্গার কল-কল্লোল, ও কি তাঁহার ব্রজরাণীর ডাক ? ব্রজরাণী এত মুখরা হইল কি করিয়া ?

নায়েব আর একবার ডাকিল, কিন্তু কোনও সাড়া না পাইয়া অগত্যা চলিয়া গেল।

কতক্ষণ পর রায় হঠাৎ ডাকিলেন, কে রয়েছিস ?

একজন খানসামা আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি বলিলেন, কেলে বাগদীকে পাঠিয়ে দে। সে চলিয়া গেল, রায় তেমনই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালীচরণ আসিয়া নতমুখে জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

রায় বলিলেন, সন্ধ্যের সময় কালীবাড়ির ঘাটে একখানা ডিঙি নিয়ে তৈরি থাকবি। সঙ্গে কাউকে দরকার নেই। আমি ধরব বোটে।

নিঃশব্দে কালীচরণ চলিয়া গেল। ভৃত্যটা এবার সাহস করিয়া বলিল, হুজুর, সর্বাঙ্গ যে ভিজে গেল!

পরম প্রসন্নকণ্ঠে রায় বলিলেন, হ্যাঁ রে, নিয়ে আয়, আমার কাপড় নিয়ে আয়, স্নান সেরে মন্দিরে যাব। তারা—তারা! ও কি, গোলমাল কিসের রে নীচে ?

আজ্ঞে, গাঁয়ে বান ঢুকেছে, তাই লোকে চীৎকার করছে।

রায় দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেলেন। কালীবাড়ি-গোবিন্দবাড়ির সম্মুখে তখন দরিদ্র নরনারীতে ভরিয়া উঠিয়াছে—সামান্য সম্বল পোঁটলায় বাঁধিয়া, মাথায় করিয়া, শিশু-নারীর হাত ধরিয়া রায়বাড়ির সম্মুখে সকলে দাঁড়াইয়া আছে। ক্ষুধাতুর শিশু-বালকের চীৎকারে চারিদিক যেন ফাটিয়া পড়িতেছে।

রায় প্রথমেই বলিলেন, ফটক খুলে দাও, ফটক খুলে দাও।

নায়েব বলিল, সর্বনাশ হয়ে গেল—ওপরে দীঘলমারীর বাঁধ ভেঙেছে।

রায় শিহরিয়া উঠিলেন, সর্বনাশ—তা হ'লে গ্রাম যে ডুবে যাবে। মুহূর্ত চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, এখুনি তুমি বেরিয়ে পড়। গ্রামের সমস্ত ভদ্র পরিবারকে জোড়হাত ক'রে আহ্বান জানিয়ে এখানে নিয়ে এস। অন্দর সদর সমস্ত মহল খুলে দাও।

ওদিকে ক্ষুধার্তের দল চীৎকার করিতেছিল, রাজাবাবু, খেতে দাও। হুজুর, রক্ষে কর।

রায় নায়েবের দিকে চাহিলেন। নায়েব বলিল, কোনও ভাবনা নেই, গিন্নীমায়ের শ্রাদ্ধের ভাণ্ডার এখনও পরিপূর্ণ।

রায় ঊর্ধ্বমুখে ব্রজরাণীকেই স্মরণ করিলেন। এ কি, কে—কে ?

নায়েব ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, উঠুন, উঠুন, উঠুন গাঙুলী মশায়! কি, হ'ল কি?

বৃদ্ধ নবীন গাঙুলী আসিয়া রায়-কর্তার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়াছে।

রায় তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া প্রতি-প্রণাম করিয়া কহিলেন, বলুন, আমাকে কি করতে হবে!

গাঙুলী বলিল, রক্ষে করুন রায় মশায়, আমার মান-ইজ্জত সব গেল। আমার কন্যার আজ বিবাহ। পাত্রপক্ষ এসে গেছে। কিন্তু হঠাৎ বন্যাতে আমার সব পণ্ড হ'ল। তৈরি রান্নার ওপর রান্নাঘর ভেঙে পড়েছে।

রায় নিজেই অগ্রসর হইয়া বলিলেন, আপনার নয়, আমার কন্যার বিবাহ। ভয় কি, আসুন, বিবাহ হবে রায়বাড়িতে। চলুন, আমি পাত্র নিয়ে আসি।

নায়েব হাঁক দিয়া কহিল, ছাতা—ছাতা।

সমস্ত রায়বাড়ির সদর অন্দর গ্রামের লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। চীৎকারে কলরবে গঙ্গার গর্জনও ঢাকা পড়িয়াছে। বন্ধ আছে শুধু রায়-কর্তার শয়নকক্ষ, লক্ষ্মীর ঘর ও জলসাঘর।

রায়-কর্তা ঘরের মধ্যে পদচারণা করিতেছিলেন, আর মুহুর্মুহু বাহিরের দিকে চাহিতেছিলেন। প্রগাঢ় অন্ধকারের প্রতীক্ষায় তিনি আছেন।

নায়েব আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, বিবাহের আসর কোথায় হবে? নাটমন্দির সব ভ'রে গেছে। হুকুম হ'লে জলসাঘরে—

কথা সে সমাপ্ত করিতে পারিল না। রায়ের কানে কিন্তু কোন কথাই প্রবেশ করিল না, তিনি অন্যমনস্কভাবেই বলিলেন, হুঁ।

নায়েব চলিয়া গেল। আরও কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া রায় ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলেন। পরিধানে একমাত্র বস্ত্র, নগ্ন পদ, কপর্দক পর্যন্ত সম্বল নাই; হাতে শুধু এক লাঠি লইয়া রায় অন্দরের খিড়কির পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

গভীর অন্ধকার, ভীষণ দুর্যোগ।

রায় ঘাটে আসিয়া ডাকিলেন, কেলে!

অন্ধকারে গাঢ়তর অন্ধকারের মত কালীচরণ নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল। রায় একবার রায়বাড়ির দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

এ কি, জলসাঘর আলোয় আলোময় হইয়া উঠিয়াছে যে! উন্মুক্ত সুবৃহৎ জানালার মধ্য দিয়া রায় দেখিলেন, জলসাঘরে বিবাহের মণ্ডপ স্থাপিত

হইয়াছে। এক দিকে দাঁড়াইয়া বর, কন্যা তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছে। ঘন ঘন হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে জলসাঘর উৎসবমুখর হইয়া উঠিয়াছে। রায় দেখিলেন, বাতিদানের বাতিগুলি সমস্তই ছোট ছোট, প্রায় অর্ধেক। ওঃ, সেদিনের নির্বাপিত অর্ধদগ্ধ বাতিগুলি আবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে!

রায় স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছিলেন, এ কি, পনরো দিন পূর্বে নির্বংশ রায়বাড়িতে আজ এই ঘনায়মান দুর্যোগের মধ্যে—পৃথিবী যখন আর্ত চীৎকারে ভরিয়া উঠিয়াছে, তখন কেমন করিয়া সেখানে বিবাহের বাসর সাজিয়া উঠিল? অকালে নির্বাপিত দীপমালা, এই দুর্যোগের অন্ধকারে, এই পরম মুহূর্তটিতে কে জ্বালাইয়া দিল? তাঁহার চোখে জল আসিল, সজল চক্ষে সেই অন্ধকারের মধ্যে মৃদু বর্ষণ মাথায় করিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। পাশে নির্বাক কালীচরণ।

এ দিকে নাটমন্দিরে আহার-তৃপ্ত ক্ষুধার্তেরা ঘন ঘন জয়ধ্বনি তুলিতেছিল, অক্ষয় হোক রায়-হুজুরের রাজত্বি, অক্ষয় হোক; আমরা সুখে বেঁচে থাকি। রায় আবার জলসাঘরের দিকে চাহিলেন। দেওয়ালে বিলম্বিত তাঁহার পূর্বপুরুষগণের প্রতিকৃতিগুলি সজল বাতাসে মৃদু মৃদু দুলিতেছিল। এ কি, ভুবনেশ্বর রায়, ত্রিপুরেশ্বর রায় কি তাঁহাকে ডাকিতেছেন? তিনি গভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, তারা—তারা আনন্দময়ী—তারা!

সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে তিনি বলিলেন, ফিরে আয় কেলে।

কালীচরণ নিঃশব্দ দ্রুত পদক্ষেপে উপরে উঠিয়া কালীবাড়ির রুদ্ধ দ্বারে প্রচণ্ড আঘাত করিল।

পিতা-পুত্র

আহ্নিক গতিতে পৃথিবী আবর্তিত হয়, দিনের পর রাত্রি আসে, রাত্রির পর হয় দিন, যুগের শেষে হয় যুগান্তর, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির কত রূপান্তর হয়। এই রূপান্তরের মধ্য দিয়া জগৎ চলে,—যুগের পথ-চলা। নিয়তির লীলার আকর্ষণেই হউক আর মানুষের ভবিষ্যৎ-সন্ধানী মনের [illegible] হউক, সমষ্টিগতভাবে মানুষ চলে, সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও চলিতে হয়। কিন্তু বিপ্রনান্দী গ্রামখানি যেন ইহার ব্যতিক্রম। অবশ্য গতিশীল জগতের সঙ্গে গ্রামখানির যোগসূত্রও

যে অত্যন্ত ক্ষীণবল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বোলপুর রেল-স্টেশন বারো মাইল দূরে, মোটর-বাস বা ট্যাক্সি আসিবার রাস্তা পর্যন্ত নাই; কাঁচা রাস্তায় যানের মধ্যে সনাতনী পদ্ধতিতে গরুর গাড়ি কোন রকমে চলে, আর বাহনের মধ্যে চলিতে পারে ঐ এক গরুই, ক্ষুর জোড়া বলিয়া কাদায় ঘোড়াও চলে না। কিন্তু গরুর উপর মানুষের চড়া চলে না, কাজেই আপন চরণজোড়া ছাড়া অন্য বাহনও অচল। কিন্তু এই যোগসূত্রের ক্ষীণতাই ইহার হেতু নয়। কারণ এই অচলতার মধ্যে জড়তা গ্রামখানিকে স্পর্শ করে নাই, একটি অটল মহিমায় সে সূর্যকরদীপ্ত পাহাড়ের চূড়ার মত দাঁড়াইয়া আছে। আশপাশের গতিশীল জগৎ অহরহ তাহাকে টানিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তবু বিপ্রনান্দী গ্রাম নড়ে না। বারো মাইল দূরে ট্রেন চলিয়া যায়, নিশীথরাত্রে তাহার শব্দ-তরঙ্গে গ্রামের শূন্যমণ্ডলে শিহরণ উঠে, মাটির বুকে সঞ্চারিত কম্পনবেগে গৃহ-প্রাচীর কাঁপে, মধ্যে মধ্যে গ্রামের যুবকেরা দশ জনে মিলিয়া দশমুণ্ড রাবণের মত কুড়ি হাতে জীবনকে নাড়া দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ফল হয় না। সামান্য একটু কম্পন অনুভব করিলেই, কৈলাস-শিখরাসীন বিশ্বম্ভরের মত শিবশেখর ন্যায়তীর্থ বিপ্রনান্দীর বুকে পদনখাগ্র চাপিয়া ধরেন, সঙ্গে সঙ্গে সব স্থির হইয়া যায়।

ন্যায়তীর্থ মানুষটি খর্বকায় ছোটখাট; গায়ের রং উজ্জ্বল গৌর, সর্ব অবয়ব একটি অনমনীয় দৃপ্ততার দীপ্তিতে ভাস্বর, অথচ তাঁহার মুখে চোখে কপালে ঠোঁটে একটি হাস্যময় প্রশান্তি ঝলমল করে। পরনে ক্ষারে-ধোয়া ধবধবে থান ধুতি, অনাবৃত বুকের উপর আঠায়-মাজা শুভ্র উপবীত, গলায় সোনার তারে গাঁথা ছোট রুদ্রাক্ষের একগাছি মালা পরিয়া ন্যায়তীর্থ আপনার টোলের বারান্দায় ছোট একখানি চৌকির উপর বসিয়া থাকেন। তাঁহারই একটি অখণ্ড এবং প্রগাঢ় প্রভাব গ্রামখানিকে নিষ্কম্প দীপালোকের মত আলোকিত এবং আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। গ্রামে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলেও তিনি চঞ্চল হন না, হাসিমুখেই তিনি কথা বলেন, কিন্তু তাঁহার খড়মের শব্দ তখন একটু উচ্চ ও কঠোর হইয়া উঠে, দাঁড়ান ঈষৎ দৃঢ়তর ঋজু ভঙ্গিতে—খড়মের চাপও যেন একটু বেশি পড়ে। তাহাতেই কাজ হইয়া যায় চঞ্চল গ্রাম্য-জীবন স্থির হইয়া শান্ত হয়। তাই বলিতেছিলাম, কৈলাসবাসী বিশ্বম্ভরের মতই পদনখাগ্রে গ্রামের বুকখানাকে চাপিয়া ধরেন।

শিবশেখর ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু ভাগবতেই তাঁহার অনুরাগ প্রগাঢ়। এই প্রগাঢ় অনুরাগের জন্যই তিনি প্রাচীন ধর্মজীবনকে গ্রামখানির মধ্যে

প্রাণশক্তিতে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন। মাত্র গ্রামের মধ্যেই তাঁহার প্রভাব অখণ্ড এবং প্রগাঢ় হইলেও খ্যাতি তাঁহার বহুবিস্তৃত—বাংলা দেশে একজন মনীষী বলিয়া তিনি বিখ্যাত। বিশেষ করিয়া ভাগবত-ধর্মের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য, আলোচনা করিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে মধ্যে মধ্যে অনেক পণ্ডিত এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াও তাঁহার নিকট আসিতেন। সেবার একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আসিয়া তাঁহার সন্ধান পাইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তিনিকেতন বিপ্রনান্দী হইতে মাইল দশেক পথ।

আলোচনা শেষ করিয়া ইউরোপীয় ভদ্রলোক হাসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকটিকে আপন ভাষায় কি বলিলেন। অধ্যাপক ঈষৎ হাসিয়া ন্যায়তীর্থকে বলিলেন,—ইনি কি বলছেন জানেন?

ন্যায়তীর্থ কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন।

অধ্যাপক বলিলেন,—গ্রীক বীর আলেকজান্দার আমাদের দেশে এসে এক যোগী পুরুষকে দেখে বলেছিলেন, আমি যদি আলেকজান্দার না হতাম, তবে এই ভারতের যোগী হ'তে চাইতাম। উনিও ঠিক সেই কথাই বলছেন। বলছেন —ইউরোপে না জন্মালে আমি ভারতবর্ষে এমনি পণ্ডিত হয়ে জন্মগ্রহণের কামনা করতাম।

ন্যায়তীর্থ হাসিয়া বলিলেন,—আমার এ ব্রাহ্মণ-জন্ম না হ'লেও আমি কিন্তু এই দেশের কীটপতঙ্গ হয়েই জন্মাতে চাইতাম, অন্যত্র জন্মকামনা করতাম না।

ইউরোপীয় পণ্ডিতটি ন্যায়তীর্থের কথার মর্ম শুনিয়া অতি মৃদু হাসিয়া অধ্যাপককে ইংরাজীতে বলিলেন,—একে আমরা বলি ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স।

অধ্যাপকটির মুখ লাল হইয়া উঠিলেও ভদ্রতার খাতিরে কোন রূঢ় প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। ন্যায়তীর্থ ইংরাজী বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু বক্তার হাসির রূপ ও ভঙ্গি হইতে ব্যঙ্গ ও শ্লেষের সুরটুকু বেশ বুঝিলেন। তবুও তিনি কথাগুলির মর্মার্থ বুঝিবার কোনও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, প্রশান্ত হাসি-মুখেই সম্মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু ন্যায়তীর্থের যোগ্য পুত্র শশিশেখর দৃঢ়স্বরে ইংরাজীতে বলিয়া উঠিল, না, ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স নয়, এই তাঁর অন্তরের বিশ্বাস। তোমাদের পাশ্চাত্য বিদ্যায় মনকে তোমরা বুঝতে পার, কিন্তু তার বেশি কিছু পার না; আত্মাকে তোমরা চেন না। আমাদের

জ্ঞানের লক্ষ্য হ'ল চিত্তজয়—আত্মোপলব্ধি; আমাদের মন আত্মাকে পরিচালিত করে না, আত্মার নির্দেশে মনকে চলতে হয় বাহনের মত।

ইউরোপীয় ভদ্রলোকটি সপ্রশংস দৃষ্টিতে শশিশেখরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, অধ্যাপকটি ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন—পাছে পরিণতিতে অপ্রীতিকর কিছু ঘটিয়া যায়। ন্যায়তীর্থ বিপুল বিস্ময়ে বিস্মিত হইয়া শশিশেখরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সর্বাগ্রে তিনিই সে বিস্ময়কে জয় করিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, শশী, তুমি ওঁকে কি বলছ তার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু যা বলছ সেটা ভঙ্গিতে ও স্বরে বড় রূঢ় ব'লে মনে হচ্ছে আমার। উনি আমাদের অতিথি, তুমি গৃহস্থ, আপন ধর্ম তুমি লঙ্ঘন করছ।

শশিশেখর চুপ করিল। বক্তব্য তাহার শেষই হইয়াছিল, তবুও তাহার ঈষৎ সঙ্কুচিত ও লজ্জিত ভঙ্গির মধ্যে ন্যায়তীর্থের আজ্ঞাপালনে আনুগত্যটুকু বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ইউরোপীয় ভদ্রলোকটি শশিশেখরের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—এই তরুণ বন্ধুটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

অধ্যাপক বলিলেন,—ইনিই ন্যায়তীর্থের পুত্র, শশিশেখর ন্যায়তীর্থ। এই বৎসরই ন্যায়ের উপাধি-পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

—উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। বলিয়া শশিশেখরকে অভিবাদন করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিলেন, আমি বড় আনন্দ লাভ করলাম আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে। সকলের চেয়ে বেশি আনন্দ হ'ল আপনি ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করেছেন। সমগ্র পাশ্চাত্য দর্শনের দ্বার আপনার কাছে এখন উন্মুক্ত। আশা করি, নিতান্ত সংস্কারবশেই আপনি সে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন না!

শশিশেখর তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, সহস্র ধন্যবাদ আপনাকে। পাশ্চাত্য দর্শন পড়ব ব'লেই আমি ইংরেজী শিখেছি।

গ্রামের প্রান্ত পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ইউরোপীয় পণ্ডিতটির সঙ্গে গিয়া বিদায় দিয়া শশিশেখর বাড়ি ফিরিল। খানিকটা আসিতে আসিতেই মন তাহার সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তাহার গোপন কথা আজ উত্তেজনার অসতর্ক অবস্থায় পিতার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত ইংরেজী পড়িতে ন্যায়তীর্থ বাধা দেন নাই। স্বীকার করিয়াছিলেন, রাজভাষা সাংসারিক প্রয়োজনেও একটু দরকার। ইস্কুলে পড়াটা শেষ করাই ভাল।

শশিশেখর প্রথম বিভাগে বেশ কৃতিত্বের সহিত ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিল। তাহার স্কুলের একজন শিক্ষক ন্যায়তীর্থকে অনুরোধ করিল, আপনি শশীকে কলেজেই পড়তে দিন! ভবিষ্যতে ও খুব ভাল ফল করবে। অঙ্কে কাঁচা ব'লেই শশী বৃত্তি পেলে না, নইলে সংস্কৃতে ইংরেজীতে খুব ভাল ফল করেছে।

ন্যায়তীর্থ প্রসন্ন হাস্যের সহিত বলিয়াছিলেন, আপনি ভালবাসেন শশীকে, আপনার কল্যাণ হোক। কিন্তু আপনি যা বলছেন, সে হয় না মাস্টার মশায়!

—কেন? ইংরেজী খারাপ কিসে?

তেমনি হাসিয়াই ন্যায়তীর্থ বলিলেন—না না, ইংরেজী বিদ্যার উপর আমার বিদ্বেষ নেই কিছু, তবে আস্থাও নেই; আর আমাদের বংশগত বিদ্যার উপর একটা বিশেষ শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস দুইই আছে। ইংরেজী জ্ঞানের দৃষ্টিটা নিতান্তই ঐহলৌকিক, চর্মচক্ষুর দৃষ্টির ওপারে আর তার গতি নেই। অথচ 'অবাঙ্‌মনসোগোচরে'র সাধনা আমাদের কুলধর্ম। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ; সুতরাং ও অনুরোধ আর করবেন না।

মাস্টার ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, আমাদের ইচ্ছা ছিল শশিশেখর সংস্কৃত এবং ইংরেজী দুইয়েই পণ্ডিত হয়।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন, ওটা নিতান্তই বিলাতী পিণ্ড রাঁধার ব্যবস্থা মাস্টার মশায়। জীবনের সাধনা একমুখী হওয়াই ভাল। মন দ্বিধাবিভক্ত হ'লে অবস্থা হবে গরুর ক্ষুরের মত, দ্রুত চলার শক্তি হারিয়ে যাবে। জন্মান্তরের ফের বেড়ে যাবে।

মাস্টার মহাশয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন শুধু, মুখে কিছু বলিলেন না। ন্যায়তীর্থ বলিলেন, আর শিখলেও তো খানিকটা। কাজ অনেকটা ওতেই চ'লে যাবে। মাস্টার হাসিলেন, বলিলেন, ও যা শিখেছে তাতে ভাল ক'রে কথা কওয়াও চলে না, ন্যায়তীর্থ মশাই।

এ অনেক দিনের কথা। ইহার পর শশিশেখর ন্যায়তীর্থের কাছেই কয়েক বৎসর পড়াশুনা করিয়া ব্যাকরণ পরীক্ষা দিল, তারপর সাহিত্য অলঙ্কার পড়িয়া দর্শন পড়িতে আরম্ভ করিল। এই সময়েই ন্যায়তীর্থ তাহাকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, চিকিৎসকের যেমন আপনার পরম আত্মীয়ের চিকিৎসা করা উচিত নয়, এও তেমনি আর কি!

আমার অনেকগুলি ছাত্র, শশী এখানে পড়লে শিক্ষা আমার পক্ষপাতদুষ্ট হ'তে পারে।

শশিশেখর নবদ্বীপে আসিয় ন্যায় পড়িতে পড়িতে পিতার চোখের আড়ালের সুযোগ পাইয়া সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে গোপনে ইংরেজীর চর্চাও আরম্ভ করিল। মনীষী পিতার মেধাবী সন্তান সে, তাহার উপর ছিল জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ। ন্যায়ের উপাধি-পরীক্ষা দিবার পূর্বেই সে পাশ্চাত্য দর্শন মোটামুটি পড়িয়া ফেলিল। শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও তাহার আয়ত্ত হইয়াছে। এ সংবাদ ন্যায়তীর্থের কাছে অতি যত্নে সে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাহা এমনি এক অভাবনীয় ঘটনা-সংস্থানে উত্তেজনাময় অবস্থার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

শশিশেখর মনে মনে শঙ্কিত হইয়াই বাড়ি ফিরিল।

প্রশান্তমুখে ন্যায়তীর্থ বসিয়া ছিলেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া ইতিমধ্যেই একটি ক্ষুদ্র জনতা জমিয়া উঠিয়াছে। একদিকে টোলের ছাত্রেরা দাঁড়াইয়া আছে, ন্যায়তীর্থের কয়েকজন বন্ধু ও মুগ্ধ ভক্ত একখানি কম্বল বিছাইয়া আসর করিয়া সম্মুখেই বসিয়াছে, এমন কি সদ্‌গোপ-পাড়ার জন তিনেক মণ্ডলও আসিয়া বারান্দার নীচে উপু হইয়া বসিয়া আছে।

কোন একটা কথা হইতেছিল। শশিশেখর আসিয়া দাঁড়াইতেই কথাটার যেন মোড় ফিরিয়া গেল। ন্যায়তীর্থের বন্ধু হিরণ্যভূষণ চক্রবর্তী শশীকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, এস বাবাজী, এস। তোমার কথাই হচ্ছিল। তুমি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছ। মহৎ থেকেই মহতের উদ্ভব হয়, উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান তুমি। তোমা হ'তে বিপ্রনান্দীর গৌরব বজায় থাকবে। বলিহারি বলিহারি! ইংরেজী বলে গেলে তুমি একেবারে ঝর ঝর ক'রে— খাজা বিলিতী সাহেবের সঙ্গে!

প্রৌঢ় হরিশ চাটুয্যেও ন্যায়তীর্থের বন্ধু, গ্রামের মধ্যে তিনি বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি, তিনি বলিলেন, কথাটা তোমার ঠিক হ'ল না হিরণ্য! শশিশেখর হ'তে গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি হবে। ন্যায়তীর্থের বংশের মুখ আরও উজ্জ্বল হবে। পুত্রের কাছে পরাজয় মহাভাগ্যের কথা। শিবশেখর ধার্মিক জ্ঞানী। জ্ঞানবান পুণ্যবানের বংশ। এমন ভাগ্য শিবশেখরের হবে না তো কি হবে তোমার আমার? পুণ্যবল না থাকলে কি ভগবানের আশীর্বাদ পাওয়া যায়!

শশিশেখরের শঙ্কা ইহাতেও দূর হইল না, সে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ন্যায়তীর্থের মুখ প্রসন্ন, এতক্ষণে তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, দশের আশীর্বাদই হ'ল ভগবানের আশীর্বাদ। এ সমস্তই হ'ল তোমাদের দশ জনের স্নেহের ফল হরিশ। এখন আশীর্বাদ করো যেন শশী স্বধর্মচ্যুত না হয়।

হরিশ চাটুয্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, সহস্র বার, লক্ষ বার সে আশীর্বাদ করি এবং আজও করছি শিবশেখর।

হরিশের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলেই তাঁহার আশীর্বাদ-বাক্যকে সমর্থন করিয়া একটি মৃদু গুঞ্জনধ্বনি তুলিয়া ফেলিলেন। শশিশেখর অভিভূত হইয়া গিয়াছিল, এমনভাবে প্রশংসার অজস্র বর্ষণের মধ্যে চোখ তুলিয়া সে যেন দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। ন্যায়তীর্থ বলিলেন, প্রণাম করো শশী। তোমাকে আশীর্বাদ করলেন আর তুমি প্রণাম করতে ভুলে গেলে! ইংরেজী শিক্ষা না ক'রে যদি শুধু সংস্কৃত শাস্ত্র পড়তে, তবে এ ভুল তোমার কখনই হ'ত না।

শশিশেখর অতিমাত্রায় লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি সকলকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল। হরিশ কিন্তু বলিলেন, এটা তোমার বক্রোক্তি হ'ল ভাই ন্যায়তীর্থ। শুধু বক্রই নয়, তীক্ষ্ণও যথেষ্ট পরিমাণে।

ন্যায়তীর্থ হাসিয়া বলিলেন, অলঙ্কৃত করতে গেলেই নাক কান সূচ দিয়ে ফুঁড়তে হয় হরিশ। সূচ তীক্ষ্ণ এবং অলঙ্কারগুলি এক্ষেত্রে বক্রই হয়ে থাকে।

ঠিক এই সময়েই সকলকে প্রণাম শেষ করিয়া শশিশেখর ন্যায়তীর্থকে প্রণাম করিল। ন্যায়তীর্থের অসাধারণ সংযম সত্ত্বেও চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মুখে তিনি কিছু বলিলেন না, শুধু হাতখানি ছেলের মাথার উপর রাখিলেন।

হিরণ্যভূষণ বলিলেন, কিন্তু তুমি এমন ইংরেজী কেমন ক'রে শিখলে শশী? একেবারে ঝর ঝর ক'রে জলের মত ব'লে গেলে! কি বলে এন্‌টেরান্স না ম্যাট্রিক পাশ তো হামেশাই দেখছি হে, বি, এ, এম, এ, পাশ করা উকিলের বহরও দেখেছি। একেবারে ঝর ঝর ক'রে জলের মত, অ্যাঁ!

শশী কুণ্ঠিতভাবে সংক্ষেপে ইংরেজী শেখার ইতিহাস প্রকাশ করিয়া বলিয়া অপরাধীর মতই ন্যায়তীর্থের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হরিশ শশীর মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাপারটা খানিকটা অনুমান করিয়া লইলেন, শিবশেখর কিছু বলিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন, শশীকে এর জন্যে

তোমার পুরস্কৃত করা উচিত শিবশেখর। শশিশেখরের এ সাধনা একলব্যের সাধনার সঙ্গে তুলনীয়।

শিবশেখর হাসিয়া বলিলেন, পুরস্কৃত না করলেও তিরস্কার করব না হরিশ, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমার মনোভাব আমি বুঝতে পেরেছি।

হরিশও হাসিয়া বলিলেন, বুঝবে বইকি শিবশেখর, আমাদের পরস্পরকে জানা যে অনেক দিনের। বাল্যকালে চীৎকার ক'রে ডাকলে তুমি চীৎকার ক'রে সাড়া দিয়ে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতে, আবার আম-জাম চুরির মতলব নিয়ে যখন চুপি চুপি জানালার ধারে দাঁড়াতাম, তখন তুমিও বেরিয়ে আসতে চুপি চুপি খিড়কির দোর দিয়ে। আমাকে বুঝতে কোন দিনই তোমার ভুল হয় না। যে দিন ভুল হবে, সে দিন বুঝব তুমি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছ, মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয়েছে তোমার। সে দিন তুমি তোমার গৃহিণীকেও বুঝতে পারবে না।

শিবশেখরের অন্তরঙ্গের দল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। শশিশেখর এবং অল্পবয়স্কেরা লজ্জিত হইয়া মাথা নীচু করিল; শিবশেখরও লজ্জিত হইলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, রসের আধিক্য হ'লে বিকার হয় হরিশ; তুমি বৈদ্যের শরণাপন্ন হও।

হরিশ বলিলেন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রও তোমার পড়া আছে ন্যায়তীর্থ; আজ রাত্রে আমার বাড়িতে তোমার আহ্বান রইল। ষড়্ রস আস্বাদন করতে করতে তোমার পরামর্শ গ্রহণ করা যাবে। বাবাজীকেও নিয়ে যেতে হবে। বাবাজীকে খাইয়ে দাইয়ে তারপর দুজনে ব'সে একসঙ্গে খাব, বুঝলে?

মজলিস শেষ করিয়া ন্যায়তীর্থ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, গৃহিণী যেন প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, মুখে তাঁহার শঙ্কার ছায়া। ব্যস্ত হইয়া ন্যায়তীর্থ প্রশ্ন করিলেন, কি হয়েছে শিবরাণী, তুমি এমন ভাবে দাঁড়িয়ে?

শিবরাণী কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন,-- হ্যাঁ গো, শশী নাকি তোমাকে না জানিয়ে ইংরেজী শিখেছে?

হাসিয়া শিবশেখর বলিলেন,—হ্যাঁ। সাহেবটির সঙ্গে চমৎকার ইংরেজীতে কথা কইলে! তুমি রত্নগর্ভা!

—তুমি রাগ করেছ? সত্যিই শশী অন্যায় করেছে।

—না না না, রাগ করব কেন শিবরাণী, শশী আমাদের বংশগৌরব উজ্জ্বল করেছে। এ কি রাগ করবার কথা?

এতক্ষণে শিবরাণীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন, আমার কিন্তু ভারি ভয় হয়েছিল। তার ওপর খড়মের শব্দ শুনে—আজ তোমার খড়মের শব্দ টোলের বারান্দা থেকে শোনা যাচ্ছিল!

শিবশেখর শিবরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—রাগ নয়, দুঃখ আমার হয়েছিল শিবরাণী; শশিশেখরের এ কথাটা এতদিন ধ'রে আমার কাছে গোপন ক'রে রাখাটা উচিত হয় নি।

সন্তানের অপরাধ শিবরাণীই যেন মাথায় করিয়া লইলেন, মাথা হেঁট করিয়া বলিলেন,—সত্যিই এ শশীর অপরাধ। আমি শশীকে বলব।

—না না না। উপযুক্ত ছেলে, তা ছাড়া—শশী আজও পর্যন্ত কোন দুঃখ আমাদের দেয় নি। এ নিয়ে তাকে কিছু বললে সে কি মনে করবে? তা ছাড়া বউমা কি মনে করবেন?

—কি মনে করবেন? শশীই বা কি মনে করবে? কেন করবে?

শিবরাণী আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া শিবশেখর বলিলেন,—নাঃ, অপরাধের চেয়ে গুণের পরিচয়ই শশীর বেশি। তাকে আমার পুরস্কৃত করাই উচিত। তুমি অনিরুদ্ধ স্বর্ণকারকে একবার ডাকাবে তো, বউমার জন্যে একজোড়া রুলি গড়াতে দেব, শশীর জন্যে একটি আংটি আর চন্দ্রশেখরের জন্যে বিছেহার।

চন্দ্রশেখর শশিশেখরের এক বৎসরের খোকা।

শিবরাণী হাসিয়া বলিলেন,—আর ছেলের মা বুঝি বাদ যাবে?

ন্যায়তীর্থও হাসিলেন, বলিলেন,—স্ত্রীলোকের ঈর্ষা সাহিত্যকারদের মিথ্যা কল্পনা নয়; অলঙ্কারের বিষয়ে মাতা কন্যার ঈর্ষা করে, কন্যা মাতার ঈর্ষা করে।

শিবরাণী ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে হাসিতেই বলিলেন,—আর পুরুষেরা?

ন্যায়তীর্থ বলিলেন, পুরুষেরা যা নিয়ে বিবাদ করে, ঈর্ষা করে, ভগবান তার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। সাম্রাজ্য দূরের কথা, সামান্য বিষয় আমার নেই শিবরাণী। ক' বিঘে ব্রহ্মত্র, তাও নারায়ণের। দাও এখন আমার আহ্নিকের জায়গা ক'রে দাও।

পল্লীবাসী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মাটির ঘর, দেওয়ালগুলি রাঙা মাটির গোলা দিয়া নিকানো; প্রদীপের মৃদু আলোয় চারিদিকে একটি নম্র, পরিচ্ছন্ন শ্রী

ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পিলসুজের উপর প্রদীপটি জ্বলিতেছিল, তাহারই সম্মুখে আসনের উপর বসিয়া শশিশেখর কি লিখিতেছিল। ঘরের ভেজানো দুয়ার ঠেলিয়া শিবশেখর ঘরে প্রবেশ করিলেন। শশিশেখর কিন্তু মুখ ফিরাইল না, পিছন দিক হইতেও শিবশেখর পুত্রের একাগ্রতার গভীরতা সুস্পষ্টরূপেই অনুভব করিলেন। একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবেই ডাকিলেন, শশী!

সে আহ্বানে সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া শশী বিস্ময়ে যেন অভিভূত হইয়া গেল।

তাহার বিবাহের পর ন্যায়তীর্থ কখনও তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন নাই। শিবশেখর কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন,—কোন আলোচনা করছ বুঝি?

শশী ততক্ষণে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাপের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিল—আমাকে কিছু বলছেন?

হাসিয়া শিবশেখর বলিলেন—আমাকে দেখে এত চঞ্চল হচ্ছ কেন শশী! তুমি উপযুক্ত হয়েছ, পাণ্ডিত্য অর্জন করেছ। এখন আমরা পিতাপুত্রে আলোচনা করব, তর্ক করব।

শশী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—তোমার কাছে আমার কিছু শিক্ষার বিষয় আছে শশী। পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা আমি তোমার কাছে পেতে চাই, ইংরেজী ভাষা আমি জানি না। তুমি আমায় অনুবাদ ক'রে বলবে, আমি শুনব।

শশিশেখর এবারও মুখে কথার জবাব দিল না, নীরবে বাপের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় স্পর্শ করিল। স্নেহের উচ্ছ্বসিত আবেগে ন্যায়তীর্থের কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—তুমি আমার মুখোজ্জ্বল-কারী পুত্র। তুমি দীর্ঘজীবী হও, ধর্মে জ্ঞানে নিষ্ঠা তোমার অটুট থাক।

শশী নীরবে মাথা নত করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিল। শিবশেখর বোধ করি শশীর একাগ্রতার কথা তখনও ভুলিতে পারেন নাই, তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন—এমন একাগ্রভাবে কি লিখছিলে শশী? কোন পত্র কি?

শশী কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে বলিল—আজ্ঞে না। আমি বেদান্ত ও পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করছি।

ন্যায়তীর্থের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তিনি কোনও কথা না বলিয়া

বিপুল আগ্রহে শশীর আসনে বসিয়া খাতাখানি টানিয়া লইলেন। পরক্ষণেই বলিলেন—আমার চশমা জোড়াটা আন ত শশী।

শশী চশমা আনিয়া হাতে দিতেই গভীর মনঃসংযোগ করিয়া শশীর লেখার উপর তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

"শব্দস্পর্শাদয়োবিদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্।
ততোবিভক্তা তৎসন্বিদৈকরূপান্ন ভিদ্যতে॥"

ন্যায়তীর্থ শ্লোকের নীচের টীকায় মনোনিবেশ করিলেন। অদ্ভুত! এত চমৎকার টীকা করিয়াছে শশিশেখর! ন্যায়তীর্থ শ্লোকের পর শ্লোক পাতার পর পাতা পড়িয়া চলিলেন।

রাত্রি প্রায় দু-পহর হইয়া আসিল। গৃহিণী শিবরাণী আসিয়া কাসিয়া সাড়া দিয়া স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। ন্যায়তীর্থ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পড়িতে পড়িতেই বলিলেন—কি, হ'ল কি?

—রাত্রি যে দুপুর গড়িয়ে এল।

—কি হয়েছে তাতে? আমার শুতে বিলম্ব আছে।

—বউমা চাঁদকে কোলে ক'রে দাওয়ায় ব'সে ব'সে ঢুলছেন। মশায় যে খেয়ে ফেললে! শশীও যে শুতে পাচ্ছে না।

—ও! বলিয়া খাতার পাতা উল্টাইয়া দেখিয়া আবার বলিলেন—তত্ত্ব-বিবেক অধ্যায়টা শেষ হ'লেই উঠব। একটু অপেক্ষা কর। আমি যা পারিনি, শশী তাই করেছে। শশী গ্রন্থ রচনা করেছে।

অধ্যায়টি শেষ করিয়া তিনি খাতাখানি হাতে লইয়া উঠিয়া আপনার ঘরে আসিয়া বসিলেন। শিবরাণী প্রশ্ন করিলেন—শশী গ্রন্থরচনা করেছে?

বেদান্তের প্রভাব হইতে তখনও ন্যায়তীর্থ মুক্ত হন নাই, তবুও একাগ্র গম্ভীর মুখে অল্প একটু হাসি টানিয়া বলিলেন—হুঁ।

স্নেহ-গৌরবে পুলকিত শিবরাণী বলিলেন—কেমন হয়েছে?

—সুন্দর, চমৎকার! কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—সঠিক এখন বুঝতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে যেন জ্ঞানে শুষ্কতা একটু প্রকট হয়ে উঠেছে।

শিবরাণী তেলের বাটি, জল ও গামছা লইয়া স্বামীর পায়ের তলায় বসিয়া বলিলেন—সে তুমি দেখে-শুনে দিয়ো।

ন্যায়তীর্থ চিন্তা-বিভোর অবস্থাতেই বলিলেন—দেখ।

স্বামীর একটু পা টানিয়া লইয়া শিবরাণী বলিলেন—কি এত ভাবছ বল তো?

মৃদু হাসিয়া এবার যেন কতকটা সচেতন ভাবে ন্যায়তীর্থ বলিলেন— বড় কঠিন চিন্তা করছিলাম শিবরাণী। ফলভোগের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে মনে।

শিবরাণী রহস্যের সুরেই হাসিয়া বলিলেন—আমার এক মুস্কিল হয়েছে বাপু, স্বামী পণ্ডিত, ছেলে পণ্ডিত, কে যে কি বলছে, মূর্খ মানুষ আমি, বুঝতেই পারি না। আবার ওই চাঁদটা, সেও এক পণ্ডিত হবে আর কি!

গম্ভীর মুখেই ন্যায়তীর্থ বলিলেন—এইবার সংসার ত্যাগ ক'রে ভগবানের শরণ নেওয়া উচিত হয়েছে শিবরাণী। কিন্তু প্রলোভনও হচ্ছে, এমন ছেলে নিয়ে ঘর করি—বাপ-বেটায় মিলে আগেকার কালের মত পাণ্ডিত্যে দিগ্বিজয় ক'রে আসি। কিন্তু বর্তমানের সুখের মধ্যেই নাকি ভবিষ্যতের দুঃখ লুকিয়ে থাকে, সেই হেতু ফলভোগের অধিকার গীতায় নিষিদ্ধ। চল, এইবার আমরা কোনও তীর্থে গিয়ে বাস করব।

শিবরাণী অবাক হইয়া গেলেন। ন্যায়তীর্থের এমন সঙ্কল্পের কথা তাঁহার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত, ইহার পূর্বে কোনও দিন ঘুণাক্ষরেও ন্যায়তীর্থ প্রকাশ করেন নাই, শিবরাণীও আভাসে পর্যন্ত অনুমান করিতে পারেন নাই।

কিছুক্ষণ পর বিস্ময়ের ঘোরটা কাটাইয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন—তোমার যত উদ্ভট কল্পনা! সুখের মধ্যে দুঃখ লুকিয়ে থাকে?

আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কথাটা যেন ভাবিয়া বুঝিয়া দেখিলেন, তারপর বলিলেন,—থাকে তো থাক। এই যদি বিধানই হয়, তবে তা মাথা পেতে নিতেও হবে।

ন্যায়রত্ন চুপ করিয়া রহিলেন। এমনই ধারার উদ্ভট চিন্তায় মন তাঁহার উদাসীন হইয়া উঠিয়াছে।

প্রগাঢ় যত্নের সহিত সমস্ত খাতাখানি পড়িয়া, অনেক চিন্তা করিয়া শশিশেখরের রচনার কয়েকটি স্থান ন্যায়তীর্থ সংশোধন করিয়া দিলেন; শশিশেখর খাতাখানি লইয়া ঘরে আসিয়া সংশোধন করা জায়গাগুলি দেখিতে আরম্ভ করিল। প্রথম সংশোধন শশী দেখিল—'সুস্পষ্ট' শব্দটিকে কাটিয়া

স্থায়তীর্থ লিখিয়াছেন 'বিস্পষ্ট'। আবার সে পাতা উল্টাইল। বেলা অনেক হইয়াছে, বধূ চারু আসিয়া বলিল—মা স্নান করতে বললেন। বেলা কত হয়েছে দেখ তো!

শশী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া খাতাটির সংশোধিত পাতাগুলিতে কাগজ দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িল। শিবরাণী নিজেই ততক্ষণে আসিয়া হাজির হইলেন, বলিলেন - বাবা, তোমাদের বাপ-বেটার বিদ্যের আঁচে আমাদের শাশুড়ী-বউয়ের হাড়ে কালি পড়ল। গরম ভাত যে কেমন, তা ভুলেই গেলাম।

শশিশেখর অপরাধ বোধ করিল, তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল,—কই, এর আগে তো ডাক নি তুমি!

শিবরাণী হাসিয়া বলিলেন—দোষ হয়েছে বাবা! তোমাদের ক্ষিদে পেয়েছে, সেটা আমার মনে করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল! ক্ষিদে-তেষ্টা বুঝতে না পারা পণ্ডিতদের একটা লক্ষণ, ওটা আমি জানতাম না! ব'স, আমি মাথায় তেলটা দিয়ে দিই। ছেলের মাথায় তেল দিতে দিতে শিবরাণী বলিলেন,—হাঁরে, উনি তোর খাতা দেখে কেটেকুটে ঠিক ক'রে দিলেন?

শশিশেখর চিন্তান্বিত হইয়াই তেল মাখিতেছিল, মায়ের কথা তাহার কানে ঢুকিলেও মনকে যেন স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না, সে চিন্তা-বিভোর ভাবেই উত্তর দিল—হ্যাঁ, দিয়েছেন।

শিবরাণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—কি ভাবছিস এত?

শশী উত্তর দিল—ভাবি নি। এমনি আর কি!

•

রাত্রেও শশী এমনি চিন্তান্বিত ভাবে খাতাখানি খুলিয়া বসিয়া ছিল। চারু আসিয়া ছেলেকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বামীকে এমনি ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—হ্যাঁ গা, তুমি সারাদিন এমন ক'রে কি ভাবছ বল তো?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শশী বলিল—বড় সমস্যায় পড়েছি চারু! বোধ হয় এমন সমস্যায় জীবনে কখনও পড়ি নি।

চারু বলিল—বেশ! ঠাকুরের কাছে যাও না। দেশ-বিদেশের লোক এসে তোমার বাপের কাছ থেকে মুস্কিলের আসান ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি ঘরে ব'সে মুস্কিল নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছ!

শশী কথার উত্তর দিল না, একটু হাসিল।

চারুর মনে হইল শশী তাহাকেই অবজ্ঞা করিয়া হাসিল, এই জন্য সে রাগ করিয়াই প্রশ্ন করিল—হাসলে যে?

শশী আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও, তারপর বলছি। চারু দরজা বন্ধ করিয়া দিল, শশী বলিল—ব'স এইখানে, একটা পরামর্শ দাও দেখি। তুমি আমার সচিব, সখী, অনেক কিছু। একথা তুমি ছাড়া আর কাউকে বলার আমার উপায় নেই, মাকে পর্যন্ত না। কথা যে বাবাকে নিয়েই।

কথাটার ভূমিকা শুনিয়াই চারু ভয় পাইয়া গেল, সে শঙ্কিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শশী বলিল অত্যন্ত মৃদুস্বরে—বাবা যে সংশোধনগুলি করেছেন, সেগুলি ভাষার দিক দিয়েই সংশোধন করেছেন, দু-এক জায়গায় বৌদ্ধ-শূন্যবাদ সম্পর্কে মন্তব্যে তিনি অত্যন্ত কঠোর হয়ে পড়েছেন। কিন্তু দুই-ই আমার মতে অন্যায় হয়েছে। ভাষার দিক দিয়ে প্রাচীন ধারা অনুযায়ী আধুনিক লেখার সংশোধন খাপ খায় না; কটু হয় শুনতে, আরও অনেক দোষ হয়। আর বৌদ্ধশূন্যবাদ কেউ গ্রহণ করতে না পারে, কিন্তু বিদ্বেষ নিয়ে তাকে বিচার বিশ্লেষণ করতে গেলে গ্রন্থকারকে ধর্মভ্রষ্ট হতে হবে।

চারুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, ভয়ার্ত অথচ মৃদুস্বরে সে বলিল—না, না, ওগো, বাবাকে তুমি অমান্য ক'র না।

শশী চিন্তিত ভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতে অস্বীকারের ভঙ্গিতে ধীরভাবে বার কয় মাথা নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল—জ্ঞান হ'ল সত্য, সত্যের মর্যাদা আমি ক্ষুণ্ণ করতে পারব না চারু।

বহুদিনের রঙ-করা মাটির পুতুলের মত চারু বসিয়া রহিল।

কয়েকদিন পর সেদিন প্রাতঃকালেই টোলের একটি ছাত্র বাড়ির ভিতর আসিয়া শশিশেখরকে ডাকিল—অধ্যাপক মশায় ডাকছেন আপনাকে।

শশী সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া আসিল। টোলের ছেলেরা বারান্দায় বসিয়া পড়িতেছে, ন্যায়তীর্থ অভ্যাসমত ছোট চৌকিটির উপর বসিয়া আছেন, শশী আসিয়া বিনীতভাবে প্রশ্ন করিল, আমাকে ডেকেছেন?

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—হ্যাঁ। ব'স। তোমার সঙ্গে কিছু পরামর্শ আছে।

ব'স কম্বলের উপর ব'স। দেখ, কয়েকদিন ধ'রেই আমি একটা কথা ভাবছি—ভাগবতধর্মের তত্ত্বব্যাখ্যা বোধ হয় আমার লিপিবদ্ধ ক'রে যাওয়া উচিত। কি বল তুমি?

শশী উৎসাহিত হইয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। এটা আপনার কর্তব্য ব'লে আমার মনে হয়।

—তা হ'লে আরম্ভ ক'রে দেওয়াই উচিত, কি বল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

এবার মৃদু হাসিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—দেখ, কাজটা আমি আরম্ভ ক'রে দিয়েছি। অপেক্ষা কর, আমি আসছি। বলিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া খালি পায়েই বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেলেন। শশী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বাপের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি সত্ত্বেও তাঁহার আজিকার এই উৎসাহ দেখিয়া সে মনে মনে কৌতুক বোধ না করিয়া পারিল না। চারিদিকে ছাত্রেরা মৃদুগুঞ্জনে পড়িতেছে; তাহার মধ্য হইতে সহসা একটা কথা যেন তাহার কানে আসিয়া খট করিয়া বাজিল। কথাটা—বিস্পষ্ট। শশী ছেলেটিকে ডাকিয়া বলিল—শোন। 'বিস্পষ্ট' না ব'লে 'সুস্পষ্ট' বল। 'বিস্পষ্ট' কথাটা ধ্বনির দিকে রূঢ় আর ব্যবহারেও প্রায় অপ্রচলিত।

ছেলেটি বলিল—আজ্ঞে না, ওটা 'বিশেষ রূপে স্পষ্ট' কিনা। 'সু'-শব্দ 'সুন্দর'দ্যোতক—ওতে কাব্যের মাধুর্য আছে।

হাসিয়া শশী বলিল—তা হ'লে 'সুকঠিন' প্রয়োগ-বিধিটা ভুল হ'ত। প্রচলন ভেদে ধাতুগত অর্থের তারতম্য হয়ে যায়, সেটাকে স্বীকার ক'রে নিলে শব্দের মধ্যে অর্থের ব্যাপকতা বাড়ে; তাতে ভাষার গৌরববৃদ্ধিই হয়।

ঠিক এই সময়েই গলার সাড়া দিয়া ন্যায়তীর্থ বাহির হইয়া আসিলেন। আসনে বসিয়া খাতাখানি কোলের উপর রাখিলেন, তারপর বলিলেন—তুমি 'বিস্পষ্ট' স্থলে 'সুস্পষ্ট' ব্যবহারের পক্ষপাতী শশী?

শশী বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, শব্দের ধ্বনি—

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—তোমার যুক্তি শুনেছি আমি। তারপর ছাত্রটির দিকে চাহিয়া বলিলেন—ওটা তুমি এখন 'বিস্পষ্ট'ই প'ড়ে যাও, পরে আমি বিচার ক'রে দেখব।

ছাত্রটি চলিয়া গেল। ন্যায়তীর্থ নীরব হইয়াই বসিয়া রহিলেন, খাতাখানি কোলের উপরেই পড়িয়া রহিল; তিনিও শশীর হাতে তুলিয়া দিলেন না,

শশীও নিজে হাত বাড়াইয়া লইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শশী বলিল—তা হ'লে—

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—হ্যাঁ, যেতে পার তুমি। মনে খানিকটা উত্তাপ জমা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে যেন তাঁহার কোন হাত ছিল না। ধীরে ধীরে সে উত্তাপ কমিয়া আসিলে মনে মনে তিনি শশীর যুক্তিকে স্বীকার করিয়া লইলেন। ছাত্রটিকে ডাকিয়া একথা বলিবার পূর্বে তিনি শশীকে কথাটা জানানো প্রয়োজন মনে করিলেন। শশীর রচনার মধ্যেও তিনি প্রথমেই 'সুস্পষ্ট'কে কাটিয়া 'বিস্পষ্ট' করিয়াছেন। সেটিও নিজে হাতে কাটিয়া দিবার সঙ্কল্প লইয়া শশীর ঘরের দুয়ারে আসিয়া ডাকিলেন—শশী!

ঘরের দুয়ার খুলিয়া দিল পুত্রবধূ চারু। ন্যায়তীর্থ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শশী নাই। চারু ঘর পরিষ্কার করিতেছিল। ন্যায়তীর্থ বাহিরে আসিতে গিয়া আবার ঘুরিলেন, শশীর কলমটি তুলিয়া লইয়া খাতাখানি খুলিলেন। দেখিয়াও তিনি যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার লেখা 'বিস্পষ্ট' শব্দ কাটিয়া আবার 'সুস্পষ্ট' লেখা হইয়া গিয়াছে! কলমটি তিনি রাখিয়া দিলেন। তারপর একে একে পাতা উল্টাইয়া গেলেন। তাঁহার সমস্ত সংশোধন শশী কাটিয়া দিয়াছে। ন্যায়তীর্থের হাত কাঁপিতেছিল, পাতার লেখা সেই কম্পনহেতু আর পড়া যায় না; তিনি খাতাখানি রাখিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। দেওয়ালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন বউমা, খড়ম জোড়াটা এগিয়ে দাও তো।

চারু খড়ম জোড়াটি আনিয়া একরূপ পায়ে পরাইয়া দিল। ন্যায়তীর্থ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। চারু শঙ্কায় বিবর্ণ হইয়া গেল, নীচে রান্নাঘরে শিবরাণীর হাতের দ্রুত-সঞ্চালিত খুন্তি স্তব্ধ হইয়া গেল। এ কেমন খড়মের শব্দ! অপটু পায়ের চালিত খড়মের শব্দের মত ছন্দোহীন কেন? অথবা অধীর ন্যায়রত্নের পায়ের অস্থিরতা হেতু এমন অসমচ্ছন্দে পা পড়িতেছে!

ন্যায়তীর্থ যেন অতিমাত্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন, অথচ সেই স্তব্ধতার মধ্যে তাঁহার নিকটে আসিবার অবসরও কেহ পায় না। পুঁথির সাগরে তিনি ডুব দিয়াছেন। যে সময়টা পড়েন না, সে সময় তিনি ঠিক স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন। কথা বলিলে দুই-একটার উত্তর দেন; বাকিগুলি নিরুত্তরই রহিয়া যায়। সেদিন তখন তিনি বসিয়াই ছিলেন, বন্ধু হরিশ চাটুয্যে একখানি কাগজ

হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ন্যায়তীর্থ সংক্ষেপে আহ্বান করিলেন—এস।

হরিশ স্থূল দেহখানি লইয়া ধপ করিয়া কম্বলের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—হাঁঃ, হাঁপ ধরে গেল, মোটা শরীর নিয়ে ছোটা কি সোজা কথা! জিভ বেরিয়ে গেল। ক'টি মেয়ে দেখে যা হাসলে শিবশেখর, লজ্জায় আমি থেমে গেলাম।

ন্যায়তীর্থ অল্প একটু হাসিলেন, নিতান্ত ভদ্রতা রক্ষার জন্য শুষ্ক হাসি। হরিশ কাগজখানি ন্যায়তীর্থের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—নাও, দেখ!

—কি?

—সেই সাহেবের কাণ্ড। 'ভারতে কি দেখিলাম' তাই লিখেছে খবরের কাগজে। এখানকার কথা, তোমাদের পিতা-পুত্রের খুব প্রশংসা ক'রে সব লিখেছে। অমর আমাকে পত্র লিখেছে, কাগজও পাঠিয়ে দিয়েছে।—অমর হরিশের বড় ছেলে, কলিকাতায় চাকরি করে।

কাগজখানি হাতে লইয়া ন্যায়তীর্থ হাসিয়া বলিলেন—দুধ ব'লে পিটুলি গোলা খাওয়াচ্ছ যে। এ যে ইংরেজী!

হরিশ বলিলেন—বাবাজী কই, আমাদের পণ্ডিতের পুত্র পণ্ডিত-প্রবর? পড়ুক, প'ড়ে শোনাক আমাদের! তবে অমর লিখেছে আমাকে মোটামুটি। সাহেব বলেছে—বলিয়া পকেট হইতে অমরের পত্র বাহির করিয়া পড়িলেন—একটি বড় দুর্গম গ্রামের মধ্যে এমন প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার। সমুদ্রের তলদেশের মণিরত্নের সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। অথচ দেশের গভর্ণমেণ্ট এঁদের খোঁজ রাখেন না, এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কিছু হ'তে পারে না। পণ্ডিত শিবশেখর ন্যায়তীর্থ ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর পুত্র সংস্কৃত এবং ইংরেজী উভয় ভাষাতেই সুপণ্ডিত, প্রাচ্য-প্রতীচ্য দর্শনে ইনি পিতার মতই সুপণ্ডিত। ভাবীকালে এঁর ভবিষ্যৎ—

বাধা দিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—থাক্। প্রশংসার কামনায় শাস্ত্রচর্চা করিনি হরিশ, ওতে আমার প্রয়োজন নাই। ওটা বরং শশীকে পাঠিয়ে দাও। তরুণ বয়স, তাতে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাব কিছু আছে—সে পড়ে খুশী হবে।

হরিশ হাসিয়া বলিলেন—সেই ভাল। ওহে, এটা আমাদের বাবাজীকে দিয়ে এস তো; কি নাম তোমার?

হরিশ বলিলেন—কিন্তু তোমার এমন ভাবান্তর হ'ল কেন বল দেখি? তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ!

শিবশেখর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তোমার কাছে গোপন করব না হরিশ। আমি বড় অশান্তি ভোগ করছি; ভবিষ্যতের চিন্তায় একটু ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। এই টোল, দেবসেবা চলবে কি ক'রে?

হরিশ বলিলেন—তোমার এমন পণ্ডিত পুত্র—

বাধা দিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—এ পাণ্ডিত্যের প্রভাবে তো অন্নবস্ত্র হয় না হরিশ! অর্থের প্রয়োজন, দিন দিন সংসার বাড়ছে! কিন্তু শশী বাড়ি থেকে থেকে বেরোবে না। আমি তাকে বলতেও পারছি না। তুমি যদি তাকে একটু বুঝিয়ে বল হরিশ—

হরিশ কিছু বলিবার পূর্বে শশীই কাগজখানি হাতে বাহির হইয়া আসিল। প্রসঙ্গটা তখনকার মত বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু অপরাহ্নে শশী নিজেই প্রসঙ্গটা তুলিয়া বলিল—আমি এইবার বাড়ি থেকে বের হতে চাই বাবা; উপার্জনের চেষ্টা করতে চাই আমি।

পলকের জন্য ছেলের মুখের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরাইয়া সম্মুখে নিবদ্ধ করিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—বেশ্!

মাইল কয়েক দূরে মহকুমা শহরে শশিশেখর এক টোল খুলিয়া বসিল। চাকরির চেষ্টা সে করিয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অধ্যাপকটির কাছেও সে গিয়াছিল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর অভাবে সেখানে কোন সম্মানজনক পদলাভ সম্ভব হয় নাই। স্কুলে চাকরির ব্যবস্থা হইতে পারিত, কিন্তু শশী নিজে তাহা প্রত্যাখ্যান করিল, আসিয়া বলিল—ষড়্দর্শন প'ড়ে অবশেষে 'ক্লিলোৎপাটীব বানর'-কথা পড়াতে পারব না আমি, মাপ করবেন।

দেশে ফিরিয়া এই শহরটিতে কয়েকজন সরকারী কর্মচারীর উৎসাহে সে টোল খুলিয়া বসিল। সেই ইউরোপীয় পণ্ডিতটির লেখার কথা ইহারই মধ্যে দেশে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। সরকারী কর্মচারীরা শশিশেখর সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন—আপনি আরম্ভ করুন টোল; সরকারী সাহায্য আমরা যেমন ক'রে হোক ক'রে দেব।

শশী টোল খুলিয়া প্রচার করিল, প্রাচ্য দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীচ্য দর্শনের মর্মও সে ছাত্রদের শিক্ষা দিবে।

অকস্মাৎ সেদিন পিতৃবন্ধু হরিশ চট্টোপাধ্যায়ের বড় ছেলে অমর শশীর টোলে আসিয়া হাজির হইল। কলিকাতা হইতে বাড়ি আসিবার পথে স্টেশনে

নামিয়া গাড়ি না পাইয়া শশীর শরণাপন্ন হইল। পরম সমাদরে শশী অভ্যর্থনা করিয়া তাহার পরিচর্যায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

অমর বলিল—তুমি ভাই, এমন খাতির করলে তো আমাকে বিদেয় নিতে হয় এখুনি।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতটি অপ্রতিভের মত হাসিল মাত্র, উত্তর দিতে পারিল না। অমর বলিল—তুমি শুধু বন্ধু নও। তুমি আমাদের গৌরব। সেদিন কাগজে কাগজে যখন ঐ লেখাটা পড়লাম শশী, তখন বলব কি তোমাকে, আনন্দে আমার চোখে জল এল। আমাদের মেসের প্রত্যেককে আমি কাগজখানা দেখিয়েছি, আর বলেছি—দেখ, আমাদের গ্রাম কেমন দেখ!

শশীর চোখ মুখ এবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেও লজ্জিত ভাবে বৃষ্টিধারা-নমিত ফলবান বৃক্ষের মতই মাথা নত করিল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া শশী বলিল—তোমাকে পত্র আমি লিখতাম অমর, তা দেখা হয়ে গেল ভালই হ'ল। কিছু চাঁদা তোমাকে দিতে হবে!

—তোমার টোলের জন্য ?

—না না। আমাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর সুধাকৃষ্ণ মুখুজ্জে মহাশয় উদ্যোগ ক'রে জেলাতে এবার পণ্ডিত-সভা আহ্বান করেছেন, আমায় করেছেন সম্পাদক। অবশ্য টাকাকড়ি সাহেবের ঠেলাতেই উঠবে। তবু সম্পাদক যখন হয়েছি তখন আমি দু-দশ টাকা যা পারি তোলবার চেষ্টা করছি।

অমর একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বলিল—নিশ্চয় দেব। আর কলকাতায় আমাদের জেলার যে সব লোক আছেন—তাঁদের কাছেও যাব আমি। তুমি বরং সায়েবের সই-করা কয়েকখানা চিঠি আমায় দিয়ো। জ্যেঠামশায় নিশ্চয় সভাপতি হবেন ?

—না, তাঁকে অভ্যর্থনা-সভার সভাপতি করা হয়েছে। কাশীর মহামহোপাধ্যায় শ্যামাচরণ তর্করত্ন হবেন সভাপতি।

—বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে! তারপর নীরবে কিছুক্ষণ অমর যেন কল্পনায় ভাবী সভার রূপ দেখিয়া লইয়া আবার বলিল—তোমরা বাপ-বেটায় একদিকে দাঁড়ালে যেখান থেকেই যিনি আসুন শশী, আমাদের জেলারই জয় হবে এ একেবারে নিশ্চিত।

শশী চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—পরাধীন দেশে পাণ্ডিত্যের কোন অর্থ হয় না অমর! আর্থিক ব্যর্থতার কথাই

শুধু বলছি না আমি; পরাধীনতার জন্তে এমন মনোভাব হয়েছে যে প্রাচীন পণ্ডিত ভুল বললেও তার প্রতিবাদ করাটা পর্যন্ত অন্তায়ের তালিকাভুক্ত হয়ে পড়েছে।

অমর বলিল—তার জন্তে ভাবনা কি তোমার, জ্যেঠামশায় তোমার পাশে থাকবেন, তিনি তো আর নবীন নন।

কথাটা শেষ করিয়া অকস্মাৎ সে হাসিয়া ফেলিল, বলিল—নবীন বলতে একটা কথা মনে হ'ল। তোমার বউ কোথায়?

হাসিয়া শশী বলিল—বাড়িতে।

—এখানে নিয়ে এস। কত আর হাত পুড়িয়ে খাবে?

—তোমারও তো তাই। ঐ যে বললাম, ও স্বাধীনতা পর্যন্ত আমাদের নেই।

অমর সরবে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—কথাটা বড় ভাল বলেছ শশী!

এই বিংশ শতাব্দীতেও জেলার সদর শহরটি পণ্ডিত-সভার অধিবেশনে চঞ্চল উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর সুধাকৃষ্ণবাবু বয়সেও প্রাচীন এবং হিন্দুধর্মেও অনুরাগী ব্যক্তি। দীর্ঘকাল শাসনবিভাগে কাজ করিয়া মধুচক্র হইতে মধুনিষ্কাশনের কৌশলেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল প্রচুর। তিনি নিজে অধিবেশনে উপস্থিত থাকায় জেলার ধনী জমিদার, রায়সাহেব, রায়বাহাদুর, এমন কি জেলার একমাত্র রাজাসাহেব পর্যন্ত সভা অলঙ্কৃত করিয়া হাজির ছিলেন। সাহেব হাসিলে তাঁহারা হাসিতেছিলেন, গম্ভীর হইলে গম্ভীর হইতেছিলেন, আর কোন পণ্ডিতের বক্তব্য শেষ হইলে হাততালি দিতেছিলেন—সজোরে।

অধিবেশন-প্রারম্ভে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সভার উদ্বোধন করিলেন, বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিলেন—এই জেলায় এখনও সংস্কৃত-চর্চার গৌরব অটুট আছে। বিশেষ ক'রে পণ্ডিত শিবশেখর ন্যায়তীর্থ ও তাঁর পুত্র পণ্ডিত শশিশেখর ন্যায়-তীর্থের গৌরবে এ জেলা গৌরবান্বিত। পণ্ডিত শশিশেখরকে এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারছি না। তিনি না থাকলে এ সভা কার্যে পরিণত করা অসম্ভব হ'ত। তিনি নবীন, এবং পাশ্চাত্য ভাষা, পাশ্চাত্যদর্শন অধ্যয়ন ক'রে প্রাচীন কালের রক্ষণশীলতার প্রভাব হ'তে অনেকাংশেই মুক্ত। আজ যুগধর্মকে স্বীকার ক'রে সংস্কৃত সাহিত্য এবং শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির উপর নূতন

আলোকপাতের প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন। সেই জন্যই তাঁর এ আন্তরিক প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয়েছে ব'লে আমার বিশ্বাস। এ প্রয়োজনের পূরণের জন্য মহামহোপাধ্যায় শ্যামাচরণ, পণ্ডিত শিবশেখর প্রমুখ মনীষিবৃন্দ এখানে মিলিত হয়েছেন। আজ তাঁদের কাছে আমাদের নিবেদন উপস্থাপিত ক'রে আমি সবিনয়ে সভা আরম্ভ করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

পণ্ডিতদের সাধুবাদ এবং রায়বাহাদুরগণের হাততালির মধ্যে সুধাকৃষ্ণবাবু উপবেশন করিলেন। পরমুহূর্তেই সভা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ন্যায়তীর্থ শিবশেখর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গম্ভীর প্রশান্ত মুখে কঠোর দৃঢ়তা, গায়ে গরদের চাদর, পরনেও দুধের মত সাদা গরদ, অনাবৃত দক্ষিণ বাহুতে সোনার তারের তাগায় একটি প্রবাল ও রুদ্রাক্ষ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। বাঁ হাতে আপনার অভিভাষণটি ধরিয়া বলিলেন—সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করবার জন্যই আমি দণ্ডায়মান হয়েছি। আমি প্রাচীন, কিন্তু বর্তমান এই সভার রীতি-পদ্ধতি সমস্তই নবীন; সত্য বলতে কি, এ ধরনের সভা আমাদের দেশে প্রচলিতই ছিল না। এ রীতি বৈদেশিক। প্রাচীন-কালে সভা আহ্বান করতেন রাজা, ধনী, জমিদার যাঁরা তাঁরাই, এবং তারও উপলক্ষ্য ছিল সামাজিক ক্রিয়ানুষ্ঠান। এই উভয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে, সে পার্থক্য সূক্ষ্ম হ'লেও শূন্যমণ্ডলের মত অনতিক্রম্য ব'লেই আমার মনে হয়। সামাজিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে সর্বোচ্চে, এবং সর্বাগ্রে স্থাপিত করতে হয় যজ্ঞেশ্বরকে। তাঁকে অনুভব ক'রে অনুষ্ঠানের সর্বত্র বিরাজ করে ভক্তিসিক্ত নিষ্ঠা এবং সদাচার; সে প্রভাব এই ব্যবস্থার মধ্যে সঞ্চারিত করা অসম্ভব ব'লেই মনে হয়। এ হ'ল শুষ্ক জ্ঞানপ্রকাশের ক্ষেত্র।

একদল প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত ধ্বনি তুলিলেন—সাধু সাধু!

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—সুতরাং সেই ত্রুটি পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা আমাদের করা উচিত। সেই জন্যই আপনাদের প্রতি স্বাগতসম্ভাষণ উচ্চারণ করার পূর্বে যজ্ঞেশ্বরকে এই যজ্ঞস্থলে অধিষ্ঠিত হবার প্রার্থনা আমি জানাব।

সমগ্র সভাস্থল এবার সাধুবাদে মুখর হইয়া উঠিল। শুধু শশিশেখর বিবর্ণ মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কলরব প্রশমিত হইতেই তাহার পিতার কণ্ঠস্বর আসিয়া তাহার কানে পৌঁছিল। তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, কিন্তু শশী তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না।

তাহার পর মর্মস্পর্শী ভাষায় রচিত শ্লোকে ন্যায়তীর্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকে স্বাগত

সম্ভাষণ জানাইয়া বসিলেন। অতঃপর মূল সভাপতি মহামহোপাধ্যায়ের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সভা ভরিয়া উঠিল।

পরদিন ছিল বিচার-সভা।

সভার প্রারম্ভেই শশিশেখর উঠিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে। প্রসন্ন হাসি হাসিয়া মহামহোপাধ্যায় বলিলেন—জ্যোতিষ্কের ভগ্নাংশ থেকেই জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি, জ্যোতি হ'ল তার জন্মগত সম্পত্তি। কোন্ গুহাতে সে জ্যোতি ব্যাহত হ'ল, ছোট ন্যায়তীর্থ? বল শুনি।

—অদ্বৈত-পরমব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপে ভাসমান কিনা?

—নিশ্চয়ই।

—এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত ক'রেই ভাসমান?

—অবশ্য।

—চৈতন্যে যিনি সর্বদা বিরাজিত, আহ্বান ক'রে তাঁর চৈতন্য সম্পাদন প্রচেষ্টা সুতরাং ভ্রমাত্মক?

এবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শশিশেখরের মুখের দিকে চাহিয়া মহামহোপাধ্যায় বলিলেন—স্বীকার করলাম।

ন্যায়তীর্থ সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন—আমি কিন্তু সম্পূর্ণ স্বীকার করলাম না। স্বপ্নাতুর অবস্থাতেও মানব ভ্রমাত্মক চৈতন্য অনুভব করে। সেখানে আহ্বানের প্রয়োজন আছে।

শশিশেখর বলিল—জ্ঞানযোগীর ধ্যান নিদ্রাও নয়, স্বপ্নও নয়। যদি স্বপ্ন হয় তবে সে জ্ঞানযোগী নয়, অন্যথায় আহ্বানকারীই ভ্রান্ত—সে-ই স্বপ্নাতুর, চৈতন্যের প্রয়োজন তারই।

মহামহোপাধ্যায় গম্ভীরমুখে বলিলেন—পণ্ডিত শশিশেখর, সভাপতি হিসাবে তোমাকে আমি নিবৃত্ত হ'তে আদেশ করছি। ন্যায়তীর্থ, আমি আপনাকে সবিনয়ে অনুরোধ করছি।

উভয়েই নিরস্ত হইলেন; কিছুক্ষণ পরে ন্যায়তীর্থ বলিলেন—মহামহোপাধ্যায় যদি অনুমতি করেন তবে আমি উঠতে পারি। শরীর বড় অসুস্থ ব'লে মনে হচ্ছে আমার।

মহামহোপাধ্যায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ন্যায়তীর্থ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই পণ্ডিত শশিশেখর যুগধর্মকে স্বীকার

করিয়া বৌদ্ধ দর্শন, পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত সমন্বয় করিয়া দর্শনের নূতন অধ্যায় রচনার প্রস্তাব উত্থাপন করিল। তীক্ষ্ণব্যঙ্গে গণ্ডীবদ্ধ মনোভাবকে বিদ্ধ করিয়া অকাট্য যুক্তি দেখাইয়া সুললিত ভাষায় অনর্গল সে বলিয়া গেল।

মহামহোপাধ্যায় তাহাকে স্বীকার করিয়া বলিলেন—তোমার প্রস্তাব সাধু। তোমাকে আমি সমর্থন করি। কিন্তু সে ভার নিতে হবে তোমাদেরই। আমরা প্রাচীন, আমাদের সে আর সাধ্যাতীত।

বাসায় আসিয়া ন্যায়তীর্থ বসিয়া ছিলেন স্তম্ভিতের মত। জ্বরগ্রস্তের মত মাথার মধ্যে একটা প্রদাহ তিনি অনুভব করিতেছিলেন। পরিপূর্ণ জাগ্রত অবস্থাতেও পারিপার্শ্বিককে তিনি স্পষ্ট প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতে-ছিলেন না। রাজপথে মানুষ, গাড়ি-ঘোড়া যাইতেছে আসিতেছে, কলরবের কথা কানে আসিতেছে, কিন্তু চিত্তে স্পর্শানুভূতি যেন হারাইয়া গিয়াছে।

মুখ দিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, মাথা নাড়িয়া তিনি যেন জাগিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন। হাঁ—তিনিই স্বপ্নাতুর, তাঁহারই চৈতন্যের প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া তিনি বালতি হইতে জল লইয়া বার-বার মাথাটা ধুইয়া ফেলিলেন। মাথাটা ধুইয়া তিনি খানিকটা সুস্থ বোধ করিলেন। নিজেই বিছানাটি বিছাইয়া লইয়া শুইয়া পড়িলেন। প্রায় সমস্ত দিনটা আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকিয়া অপরাহ্নে তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার ছাত্র মণিভূষণ বলিল—শশীদাদা এসেছিলেন দু-বার। কিন্তু আপনি ঘুমুচ্ছেন দেখে ফিরে গেছেন।

ন্যায়তীর্থ গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইলেন, সে শব্দের উচ্চতায় এবং অস্বাভাবিকতায় ছেলেটি চমকিয়া উঠিল। ন্যায়তীর্থ বলিলেন—এবার এলেও তাকে নিষেধ ক'রে দিয়ো, কোন প্রয়োজন নেই। ব'ল—চৈতন্য আমার হয়েছে, আহ্বানে প্রয়োজন নেই।

খড়ম জোড়াটা পায়ে দিয়া তিনি ঘরের মধ্যেই পদচারণা আরম্ভ করিলেন, উচ্চ কঠোর শব্দ—অস্বচ্ছন্দ বা অসমচ্ছন্দ নয়, অত্যন্ত দৃঢ় এবং কঠিন।

কিছুক্ষণ পর আবার ছাত্রটি আসিয়া শঙ্কিত ভাবে দাঁড়াইয়া ন্যায়তীর্থের মুখের দিকে চাহিল। ন্যায়তীর্থ আবার তেমনি ভাবে গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন—কি?

—রায় বাহাদুর জ্ঞানরঞ্জন বাবু এসেছেন, দেখা করবেন।

ব্যস্ত হইয়া ন্যায়তীর্থ বাহিরে আসিয়া সম্ভ্রমভরেই রায় বাহাদুরকে আহ্বান করিলেন—আসুন, আসুন।

হে-হে-হে শব্দে এক বিচিত্র হাসি রায় বাহাদুর হাসিয়া থাকেন, সেই হাসি হাসিয়া বলিলেন—সায়েব পাঠালে আপনার কাছে। যেতে হবে আমার সঙ্গে। বাপ রে বাপ -খাটিয়ে মেরে ফেললে মশায়, আর বলবেন না। আমার দফা রফা, সব তাতেই বেটার আমাকে না হ'লে চলবে না। চলুন, গাড়ি আছে আমার।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—এখুনি ?

হে-হে করিয়া আবার হাসিয়া রায় বাহাদুর বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ। খেতাব দেবে মশায়—আপনি তো নেবেন না, তাই আপনার ছেলেকে খেতাব দেবে মহামহোপাধ্যায়। তবু আপনাকে একবার জিজ্ঞেস করা তো দরকার। চলুন, চলুন।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—মণি, আমার চাদরখানা দাও তো।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুধাকৃষ্ণবাবু শশীকে সত্যই স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তিনি মানুষও ছিলেন সত্যকার গুণগ্রাহী ব্যক্তি। আজিকার এই আহ্বানের মধ্যে আরও একটু উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল। পিতা-পুত্রের এই আকস্মিক মতদ্বৈধের রূঢ়তাটুকু মুছিয়া দিয়া উভয়ের সম্বন্ধের স্বাভাবিক অবস্থার প্রতিষ্ঠাও ছিল গোপন সঙ্কল্প। শশীকেও তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন। ন্যায়তীর্থকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া বলিলেন—আপনার সঙ্গে পরিচয় লাভ ক'রে আমি গৌরব অনুভব করছি ন্যায়তীর্থ। পরম আনন্দলাভ করলাম।

ন্যায়তীর্থ সবিনয়ে বলিলেন—আপনি জেলার রাজ-প্রতিনিধি; আপনার সঙ্গে পরিচয় আমারও পরম সৌভাগ্য। রাজা-রাজপ্রতিনিধিরাই আমাদের রক্ষক, আপনারাই তো আমাদের ভরসা।

সুধাকৃষ্ণবাবু বলিলেন—অতি সত্য কথা। ক্রটি আমাদেরই—আমরাই আপনাদের সন্ধান রাখি না, সম্মান করি না। সেই সায়েবের লেখার প্রতি এবার সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। আপনাদের সম্মান সরকার করতে চান।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—আমাদের সৌভাগ্য।

—সম্মান অবশ্য উপাধি দিয়ে। তা' সরকারের পত্র পেয়ে আমি হাসলাম। মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ন্যায়তীর্থের গৌরব আর কি বৃদ্ধি হবে! নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—অকিঞ্চিৎকর হ'লেও যখন রাজার দান এবং আমার প্রাপ্য তখন না নিলে উপায় কি বলুন! অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করব।

সুধাকৃষ্ণবাবু চুপ করিয়া গেলেন; কিছুক্ষণ পর বলিলেন—খুব সুখী হলাম আপনার কথা শুনে। সরকারকে আমি জানাব। শশিশেখরকেও আমরা দু-এক বছরের মধ্যেই উপাধি দেব। আর একটা কথা, শশী আজ বড়ই অন্যায় করেছে—তাকে আপনার মার্জনা করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে অনুতপ্ত হয়েছে।

কঠিন হাসি হাসিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—তা হ'লে বলছেন, অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছে; স্বপ্নাতুর বা তন্দ্রাতুর অবস্থা থেকে জাগ্রদবস্থায় অবস্থান্তর। আহ্বানের তা হ'লে প্রয়োজন আছে!

সুধাকৃষ্ণবাবু হাসিলেন, বলিলেন—তরুণ বয়সের ধর্মকে সহ্য ক'রে নিতে হবে ন্যায়তীর্থ মশাই, না নিলে উপায় কি?

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—দুদিন পরে, দুদিন পরে। আজ আদেশ করবেন না, পারব না। আজ আমি যাই।

ন্যায়তীর্থের খড়ম ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ন্যায়তীর্থ চলিয়া যাইতেই সুধাকৃষ্ণবাবু পাশের ঘরের দিকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিলেন—পণ্ডিত! শশীকে তিনি পাশের ঘরেই বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ উত্তর দিল না। সুধাকৃষ্ণবাবু উঠিয়া পাশের ঘরে গিয়া দেখিলেন, ওপাশে দরজা খোলা, ঘরে কেহ নাই।

শশী সমস্তই শুনিয়াছিল। সে উদ্‌ভ্রান্তের মতই ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। আজ সে স্পষ্ট অনুভব করিল তাহার প্রতিষ্ঠায় তাহার পিতার ঈর্ষা; জীবনের প্রতিটি ঘটনা আজ নূতন আলোকে আলোকিত হইয়া নূতন রূপে তাহার চোখে দেখা দিল। সহসা তাহার মাকে মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার সম্মুখে সে দাঁড়াইবে কেমন করিয়া! চলিতে চলিতে সে হোঁচোট খাইল, চটিটা ছিঁড়িয়া গেল। কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রুক্ষেপ ছিল না। ধিক্কারে

লজ্জায় তাহার মন ছি-ছি করিয়া সারা হইতেছে। মাথার ভিতরটা কেমন করিতেছে! মনে ইচ্ছা হইল—দুই হাতে দলিয়া পৃথিবীর সব কিছু যদি সে মুছিয়া দিতে পারিত।

চারিদিকে অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছে, সে বিভ্রান্তের মত লোকালয় ছাড়িয়া চলিল। কে যেন তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে। সে তাহার পিতা—দাম্ভিক ন্যায়তীর্থ। শহর পার হইয়া ঘন জঙ্গল—জঙ্গলের পরে রেল-লাইন। শশিশেখর সেই জঙ্গলের অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল।

শশিশেখরের আর সন্ধান মিলিল না। সন্ধান করিয়া পরদিন মিলিল রেল-লাইনের উপরে কোন অসতর্ক পথিকের খণ্ড খণ্ড ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহের মাংস, অস্থি, মেদ, অন্ত্র! মাথাটা পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। চিনিবার উপায় নাই।

মাস-ছয়েক পর।

ন্যায়তীর্থ টোলের বারান্দায় অভ্যাসমত বসিয়া ছিলেন। ইহারই মধ্যে তিনি স্থবির হইয়া গিয়াছেন। পৌত্র চন্দ্রশেখর কাছেই দাওয়ার উপর বসিয়া একটা কাগজ চুষিতে ব্যস্ত ছিল। ন্যায়তীর্থ উদাস দৃষ্টিতে দিক্‌চক্রবালের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

একটি ছাত্র সহসা ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া চন্দ্রশেখরের হাত হইতে কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া বলিল—এ-হে-হে, উপাধি-পত্রখানা নষ্ট ক'রে ফেললে!

কাগজখানি সরকার-প্রদত্ত মহামহোপাধ্যায় উপাধিপত্র,—আজই কিছুক্ষণ পূর্বে সেটা আসিয়াছে। চন্দ্রশেখর এমন উপাদেয় ভোজ্য বস্তুটি হইতে বঞ্চিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এতক্ষণে ন্যায়তীর্থের চমক ভাঙিল। তিনি পৌত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—কি হ'ল, কাঁদছ কেন দাদু?

ছাত্রটি শঙ্কিত স্বরে বলিল—খোকা উপাধি-পত্রখানা মুখে পুরে নষ্ট ক'রে ফেলছে।—ওটা নেওয়াতেই ও কাঁদছে।

ন্যায়তীর্থ ছাত্রের হাত হইতে উপাধি-পত্রখানা লইয়া খোকার হাতে তুলিয়া দিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া কার্তিকবাবু বলিলেন, সাহেবদের তাড়িয়ে কি রাজত্ব করবে তোমরা? ভাইয়ে ভাইয়ে লাঠালাঠি করা তোমাদের স্বভাব।

অতঃপর তিনি যাহা বলিলেন সেটুকু চর্বিত-চর্বণের সামিল; বহুবার তিনি একথা বলিয়াছেন। সুতরাং তরুণের দল মুখ টিপিয়া হাসিয়া ফেলিল। কার্তিকবাবু এটুকু লক্ষ্য করিলেন; তিনি তীক্ষ্ণ ঘৃণার সহিত বলিলেন—হেসো না, হাসির কথা নয়! ইংরেজরা আমাদের ভাই, এক বংশ। ওরা আর্য, আমরাও আর্য। আমরা বাবাকে প্রাচীন ভাষায় বলি, পিতা—পিতর, ওরা বলে ফাদার, মাতা—মাদার, বাবা পাপা, মা মামা, ভ্রাতা ব্রাদার! তফাৎ কোন্‌খানে? আমরা ভয় লাগলে বলি, হরিবোল হরিবোল, ওরা বলে 'হরিবল্ হরিবল্'। চামড়ার তফাৎ—সে তোমার দেশের জলবাতাসের গুণে। আমাদের বৈষ্ণবধর্মে বলেছে, তৃণাদপি সুনীচেন—তৃণের চেয়ে নত হবে। তা না, ধ্বজা পতাকা উঁচু করে বন্দেমাতরম্ আর ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা।

ছেলেরা কি একটা ডে উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছিল, তাহারা আর তর্ক না করিয়া পথ ধরিয়া অগ্রসর হইল। কার্তিকবাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হাঁ যাও, বাড়ি যাও সব। পড়াশুনো কর মন দিয়ে, চাকরিবাকরি কর।

কিন্তু ছেলের দল গান ধরিল—সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং—কার্তিকবাবু তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—An idle brain is the devil's workshop! বেকার—যত সব অপোগণ্ডের দল!

সত্যকার গোপন কথাটি হইতেছে পেন্‌শন। কার্তিকবাবু বড় সরকারী চাকুরে ছিলেন, এখনও মোটা পেনশন পাইয়া থাকেন। সংসারের কয়েকজন এখনও সরকারী কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে। প্রাচীন জমিদার-বংশের ভূতপূর্ব নায়েব প্রৌঢ় রামসুন্দর বলিল, সর্বদেবময়ো রাজা! এখনও আপনার এক দুই তিন বললে লাট নীলেম হয়; কিন্তু দরখাস্ত কর, নীলেম করাবো না। ব্যবস্থা কি! বন্দোবস্ত কি!

কার্তিকবাবু বলিলেন, তোমার বাবুর ছোট ছেলেটি আবার এককাঠি

সরেশ। সে আবার কি বলে কংগ্রেসের Leader, একেবারে extremist, উগ্রপন্থী! বাপ রে!

রামসুন্দর অপেক্ষা করিয়া বলিল, আর বলেন কেন মশাই, সে আবার বলে ঈশ্বর মানি না।

—তোমার বাবুকে ছেলের বিয়ে দিতে বল, ছেলের বিয়ে দিন।

—বিয়ে করে খাওয়াবে কি বলুন, ছেলেপিলে হবে তাদের ভরণ-পোষণ করবে কি দিয়ে। সেই জন্যেই তো আপনাকে বারবার বিরক্ত করছি।

জমিদারবাবু রামসুন্দর মারফৎ ছেলের চাকরির জন্য কার্তিকবাবুকে ধরিয়াছেন।

কাত্তিকবাবু একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বড় দুঃখ হয়, বুঝলে রামসুন্দর, এতবড় বংশের এই রকম পরিণাম দেখলে বড় দুঃখ হয়! বিশেষ ক'রে আমাদের দুঃখ হয় বেশি।

রামসুন্দরও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বলিল, তা তো হবারই কথা, আপনারা হলেন আত্মীয়—আপনার জন, দশজন পরের হয়, তো আপনাদের কথা তো স্বতন্ত্র।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কাত্তিকবাবু বলিলেন, যা হয়েছিল তা হয়েছিল, দৈবের উপর হাত ছিল না, কিন্তু কর্তার মাথাটা যদি খারাপ না হ'ত তা হ'লে বাড়িটা বজায় থাকত। ধীরেনের কাণ্ডটি থেকেই ওঁকে সেরে দিয়ে গেল।

রামসুন্দর এ তথ্যটা অস্বীকার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না মশাই, মাথার ওঁর অনেকদিন থেকেই গোলমাল হয়েছে। বুঝলেন, বহুদিন পূর্বে প্রথম সংসার শেষ হবার পরই এর সূত্রপাত। তখন মধ্যেমধ্যে কবরেজ ডাকিয়ে ফিস্‌ফাস্ ক'রে পরামর্শ করতেন। একদিন কবরেজ আমাকে বলেছিলেন, বড়লোকের কেমন অদ্ভুত ভয় দেখ দেখি। বলেন কি—দেখ, আমার হাতে কুষ্ঠ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কেন? না—হাত কিরকম লাল হয়েছে দেখ।

কার্তিকবাবু আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন, বল কি! কুষ্ঠ?

—আরে মশাই, কুষ্ঠ কোথায় পাবেন, মনের ভয়। আমার মনে হয় ঐটাই মাথাখারাপের সূত্রপাত। হাতের তালু অল্প অল্প লাল সকলেরই হয়—আবার ওঁদের বংশের কথা আলাদা—ওঁদের হাতেই যেন লাল রঙ মাখানো। এখন আর তাও নাই—রক্তহীন সাদা ফ্যাকাসে চেহারা হয়ে গেছে বাবুর।

কার্তিকবাবুর কিন্তু কথাটায় বিশ্বাস হইল না। তিনি মনে মনেই কথাটা লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন। রামসুন্দর কোন উত্তর না পাইয়া আবার বলিল, এখনও তো আপনার সেই একই বাতিক—ধীরেনবাবুর দ্বীপান্তর হবার পর থেকে বাতিক—বাঁ হাতে আমার কুষ্ঠ হচ্ছে! তোমরা কেউ বুঝতে পারছ না—আমি বেশ বুঝতে পারি। আগে চুপচাপ থাকতেন, যা বলা কওয়া কবরেজের সঙ্গেই হ'ত। এখন সেটা প্রকাশ্যে—আর ওই একটা মনগড়া লজ্জায় ঘর থেকে বেরুবেনও না, কিছু করবেন না হাত দিয়ে, চুপচাপ ঘরে বসে আছেন।

ধীরেন জমিদার মহাবিষ্ণু সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ছয় বৎসর পূর্বে খুনের অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

কার্তিকবাবু বলিলেন, দেখ রামসুন্দর, বলতেও আমার বাধে—লজ্জা কষ্ট দুইই হয়। ওঁরা হয়ত মনে করবেন কার্তিক কাজ ক'রে দিলে না। কিন্তু যার বাপ পাগল, ভাই খুন করে দ্বীপান্তরবাসী, নিজে যে সরকারের বিরোধী, তার চাকরি কি হয়? অন্তত সরকারী চাকরি।

রামসুন্দর সরকার-বাড়ির পুরাতন নায়েব। বর্তমানে সরকার-বংশের সম্পত্তিও নাই, রামসুন্দর আর নায়েবও নয়, তবুও মমতার একটা নিবিড় বন্ধনে পুরাতন প্রভুবংশের সহিত তাহার জীবন জড়াইয়া গিয়াছে। সে এখনও তাঁহাদের জন্য এই সংসারসমুদ্রে ভারবহনক্ষম একখানি তরণীর সন্ধানে ব্যাকুল আগ্রহে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তরণীতে তাহার মন উঠে না; গোপন ইচ্ছা—একখানি ধ্বজশোভিত অর্ণবপোত। এই চাকরির জন্য কার্তিকবাবুকে অনুরোধ সে মিথ্যা মহাবিষ্ণুবাবু ও তাঁহার পত্নীর নাম দিয়া, নিজেই করিতে আসিয়াছে। তাঁহারা কেহ বিন্দু-বিসর্গ পর্যন্ত জানেন না। দয়াময়ী, মূর্তিমতী লক্ষ্মীপ্রতিমার মত, ছোটমায়ের ম্লান মুখ মনে হইলে তাহার চোখে জল আসে।

... ...

পাঁচ পুরুষ পূর্বে রচিত সরকারদের দালানবাড়িখানা এখন ইটকাঠের একটা স্তূপ, একদিকে একটা বটগাছ প্রবল বিক্রমে কয়েক বৎসরের মধ্যেই নাগপাশের মত মূলবেষ্টনীর পেষণে একে একে বক্ষপঞ্জরগুলি ভাঙিয়া ভাঙিয়া চলিয়াছে। সেদিকটা এখন অব্যবহার্য, বড় বড় ফাটলের মধ্য দিয়া নিশীথরাত্রে বাতাস কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফেরে, মধ্যে মধ্যে ধুপধাপ করিয়া পলেস্তারা বা ইটের

চাঙর খসিয়া পড়ে ; দুইমাস তিনমাস অন্তর এক একখানা কড়ি অথবা বরগা। একটা অংশ জরাজীর্ণ হইলেও এখনও ব্যবহার করা চলে, সেই অংশে মহাবিষ্ণু-বাবু তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী ও কনিষ্ঠ পুত্র নীরেনকে লইয়া বাস করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর সন্তান-সন্ততি ছিল না, কনিষ্ঠা পত্নী করুণাময়ীর দুই পুত্র ধীরেন ও নীরেন। আশ্চর্য, দুইজনের প্রকৃতি দিন ও রাত্রির রূপের মত বিরোধী এবং বিপরীত। ধীরেন এই জমিদারবংশের বংশানুক্রমিক ধারায় দুর্দান্ত, দাম্ভিক, উগ্র, বিলাসী—জীবনে সে চলিতে চাহিত ঝড়ের মত, তাহার সম্মুখে নত না হইলে সে তাহাকে ভাঙিয়া দিয়া চলিয়া যাইতে চাহিত। লেখাপড়াও বিশেষ করে নাই, স্কুল হইতেই বিদায় লইয়া সে জমিদারি পর্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করিয়াছিল। প্রয়োজনও ছিল। তাহার অনেক পূর্ব হইতেই মহাবিষ্ণুবাবু ঘরে ঢুকিয়া বসিয়া ছিলেন—মধ্যে মধ্যে কবিরাজ আসা-যাওয়া করিত, অপর কাহারও সহিত দেখা করিতেন না—বাহিরেও বড় আসিতেন না। ধীরেনের মাও বিশেষ আপত্তি করিলেন না—এতবড় বাড়ির পৈতৃক মর্যাদাসম্পদ উদ্ধার করিতে যদি ধীরেন পারে - তবে উর্ধ্বতন সাতপুরুষ তাহাকে আশীর্বাদ করিবেন। সেই ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

কিন্তু একদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইয়া গেল। তরুণ ধীরেন্দ্র মহলে গিয়াছিল—সেখানে প্রজাদের সঙ্গে বিরোধ বাধাইয়া বসিল। একদিন প্রজাদের কয়েকজন মাতব্বর আসিয়া তাহাকে চোখ রাঙাইয়া বলিল, আপনি এমন করে চাপরাশী লগ্দী পাঠাবেন না বাবু, আমরা আর খাতির রাখব না।

ধীরেনের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল, সে ক্রুদ্ধ অজগরের মত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিল, হুঁ। তারপর ?

—আমরা খাজনাও দেব না। বৃদ্ধি সুদ এ তো দেবই না।

—তারপর ?

—তারপর আবার কি ? বেশি যদি করেন—আমরা মেজেষ্টারের কাছে দরখাস্ত করব—দরবার করব।

—আর ?

আর কিছু প্রজারা খুঁজিয়া পাইল না, কিন্তু একটি উনিশ কুড়ি বৎসরের ছেলের এই আকাশস্পর্শী আভিজাত্যের নিকট অত্যন্ত খাটো হইয়া গিয়া তাহাদের অন্তর ক্ষোভে ভরিয়া উঠিল। সেই ক্ষোভের আক্রোশেই একজন বলিয়া উঠিল, মশায়, এত ভাল নয়, বুঝলেন ? এই পাপেই আপনার বাবার

কুষ্ঠ হয়েছে! অকস্মাৎ যেন একটা বজ্রপাতে আগ্নেয়গিরির উৎসমুখ খুলিয়া গিয়া অগ্ন্যুদ্গার হইয়া গেল। হাতের কাছেই ছিল বন্দুক—একটা বিপুল শব্দে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল, লোকটা আর্তনাদ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রোতে মাটি ভাসিয়া গেল। ধীরেন্দ্র বন্দুকটা খুলিয়া ফুঁ দিয়া নলের ধোঁয়া বাহির করিয়া দিয়া বন্দুকটা হাতেই থানায় গিয়া আত্মসমর্পণ করিল। কোন কথা সে গোপন করিল না। অনুগ্রহ করিয়া বিচারক চরম শাস্তির পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিলেন। সে আজ ছয় বৎসর পার হইয়া গেল।

এখন এ সংসারের ভরসাস্থল নীরেন। ভরসা করিবার মত সন্তান সে। ধীরেন্দ্রের মামলায় ও ঋণের দায়ে বিষয়সম্পত্তি নিঃশেষিত হইয়া গেল, নীরেনের স্কুলের বেতন জোগানো দায় হইয়া উঠিল। কিন্তু স্কুলের হেডমাস্টার তাহার বেতন কোনদিন চাহিলেন না। ফ্রি-স্টুডেণ্ট-শিপও তাহাকে দেওয়া হয় নাই, তবু তাহার বেতন মাসে মাসে জমা হইয়া যাইত। নীরেনকে ডাকিয়া মাস্টার মশায় বলিয়া দিলেন, দেখ, যখন তোর সুবিধে হবে মাইনে দিস, আমরা বাকিই রেখে যাচ্ছি। বেতন লাগবে না কথাটাও তিনি বলেন নাই। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময় রামসুন্দর একেবারে হিসাব করিয়া টাকা আনিয়া দিল। বিনা প্রশ্নে মাস্টার মহাশয় সে টাকা গ্রহণ করিলেন। নীরেন বৃত্তি পাইল পনের টাকা। মাস্টার মহাশয় নতুন ঝকঝকে বই নীরেনকে পাঠাইয়া দিলেন—To the best boy of my school—with my best wishes.

তারপর নীরেন আই-এ, বি-এও সম্মানের সহিত পাশ করিল। কিন্তু এম-এ পরীক্ষা দিবার সময় জাতীয় আন্দোলনে মাতিয়া পড়া ছাড়িয়া ঘরে আসিয়া বসিল।

তাহার মা বলিলেন, নীরেন, বাবা, আমার মাথা আর খাসনে বাবা!

মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া নীরেন বলিল—তোমার মাথা কি আমি খেতে পারি মা?

মা ভুলিলেন না, সজল চক্ষে বলিলেন, মায়ের চোখের জল ফেলিয়ে কি আনন্দ হয় নীরু?

—আনন্দ? জান মা, আলেকজেণ্ডার বলেছিলেন—আমার মায়ের একবিন্দু চোখের জল—

—মিথ্যে আমায় ভোলাচ্ছিস নীরু, তুই আমায় পরিষ্কার কথা বল্। যা বুঝতে পারি এমন কথা বল্।

—তোমাকে দুঃখ আমি দিতে পারি না মা। আমায় কি করতে হবে বল।

—উপায়ের একটা পথ কর; এম-এ-টা পাশ কর—আইন পড়। বাবুর বড় সাধ ছিল ধীরেনকে উকিল করবেন—আর—

ঝরঝর করিয়া মা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

নীরেন সেই বৎসরেই এম-এ পরীক্ষা দিয়া বসিল। পড়াশুনা তাহার শেষ হইয়াই ছিল, পরীক্ষায় পাশও সে করিল। কিন্তু ফল আশানুরূপ হইল না। রামসুন্দর আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিল -এইবার ভাই আইন পাশ করে ফেল। আমি তোমাকে কেস এনে দেব। একবার ওই কাত্তিকবাবুকে আমি দেখিয়ে দিই তা হ'লে।

... ...

অন্ধকার রাত্রি। বাড়ির সেই ফাটলেভরা জরাজীর্ণ অংশটার ছাদের উপর নীরেন বসিয়া ছিল। মৃদু বাতাসের বেগে বটগাছটার পত্রান্দোলনে খস্ খস্ শব্দ উঠিতেছিল—যেন কাহারা ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছে, কানাকানি করিয়া হাসিতেছে। নীরেন সেই দিকে চাহিয়া কিছু বোধ হয় চিন্তা করিতেছিল। মা তাহার সন্ধান পাইলেন, তিনি ডাকিলেন—নীরেন, উঠে আয়।

নীরেন হাসিয়া বলিল—তুমি বুঝি আমার গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াও? সন্ধানও ত ঠিক পাও।

—উঠে আয় আগে।

নীরেন অবহেলা করিল না, উঠিয়া সন্তর্পণে ভাঙা ছাদ পার হইয়া নিকটে আসিতে মা বলিলেন—তুই কি আমার সর্বনাশ না ক'রে ছাড়বি নে? ওই ভাঙা ছাদ—চারিদিকে ফাটল গর্ত—ওই বটগাছ—ওখানে তোর কি কাজ শুনি?

নীরেন হাসিয়া বলিল—বেশ লাগে মা আমার।

—তুই আর হাসিসনে নীরেন, তোর হাসি দেখলে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। কখনও কি তোর মুহূর্তের জন্যে চিন্তা হয় না, দুঃখ হয় না? এই এত বড় বংশ, এত বড় বাড়ি—কি ছিল মনে কর দেখি—আর ভাব তো কি হয়েছে!

সেই হাসি হাসিয়াই নীরেন বলিল—সেই ত' ভাবি মা। ভাবি কেন, চোখে যেন দেখি—'মা কি হইয়াছেন।' আনন্দমঠ মনে আছে মা? মা কি ছিলেন—আর মা কি হইয়াছেন! অন্ধকার কালো রাত্রির মধ্যে—আমাদের এই ভাঙা বাড়ির মধ্যে—সমস্ত দেশের—

মা বলিয়া উঠিলেন—তোর পায়ে পড়ি নীরেন—চুপ কর। তোর দেশকে ছাড়। মাটিকে ভক্তি না করে মাকে ভক্তি কর একটু!

মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া নীরেন বলিল—তুমি বড্ড সেন্টিমেণ্টাল। আর রাগ করবে না তো, বড্ড হিংসুটে তুমি।

মা দৃঢ়স্বরে এইবার বলিলেন—দাঁড়া এইবার তোর বিয়ে দেব আমি। তোর এই সব পাকামি আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি।

নীরেন হা হা করিয়া হাসিয়া যেন ভাঙিয়া পড়িল। হাসি দেখিয়া মায়ের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, তিনি বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—হাসছিস কেন?

—বিয়ের কথা শুনে আনন্দ হচ্ছে মা।

মা আর কোন কথা বলিলেন না, তিনি সেখান হইতে একেবারে আসিয়া সন্তর্পণে স্বামীর কক্ষের দুয়ার ঠেলিয়া প্রবেশ করিলেন। পিলসুজের উপর প্রদীপের আলো জ্বলিতেছে। ঘরখানি আয়তনে বৃহৎ, ক্ষুদ্র একটি প্রদীপের মৃদু আলোকের ব্যাপ্তি সর্বত্র প্রসারিত হইতে পারে নাই, আলোকিত পরিধিটুকুর চারিপাশে অন্ধকার নিথর হইয়া যেন দীপনির্বাণের প্রতীক্ষায় জাগিয়া রহিয়াছে। তাহার উপর ঘরখানা অস্বাভাবিকরূপ নিস্তব্ধ। আলো-আঁধারির নিস্তব্ধতায় ঘরখানি যেন রহস্যের মোহে আচ্ছন্ন। মহাবিষ্ণুবাবু বিছানার উপর নিস্তব্ধ ছায়ামূর্তির মত বসিয়া আপনার বাঁ হাতখানি ঘুরাইয়া দেখিতেছিলেন।

নীরেনের মা ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি নীরবে তাঁহার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ওই দৃষ্টির মধ্যে তাঁহার ভাষা প্রকাশ পায়। নীরেনের মা তাঁহার নিকট আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, ক্ষিদে পেয়েছে?

আপনার চিবুকে অত্যন্ত চিন্তিতভাবে একবার হাত বুলাইয়া তিনি মৃদুস্বরেই উত্তর দিলেন—হ্যাঁ।

—আচ্ছা আনছি খাবার। কিন্তু আমি একটা কথা তোমাকে বলতে চাই। আর না বললে নয়।

—বল।

—তুমি একবার নীরেনকে ডেকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে বল।

—বলব।

—হ্যাঁ। ডেকে বল, বাবা তোর মুখ চেয়ে আমরা বসে রয়েছি। আইন পাশ ক'রে তুই ওকালতি কর—অভাবের কষ্ট আর আমরা সহ্য করতে পারছি না, পৈতৃক মর্যাদা তুই আবার বজায় কর।

—নীরেন এবার তো এম-এ পাশ করলে, না?

—হ্যাঁ। ও যদি মনে করে তবে না পারে এমন কাজই নেই। কিন্তু দেশই ওকে খেলে। কি যে দেশ দেশ বাতিক হয়েছে!

—দেশ?

—হ্যাঁ, দেশ—জন্মভূমি—বন্দেমাতরম্!

—হুঁ। তারপর গভীর চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন—আচ্ছা, সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্জে মশায় এখন কি করছেন?......ও—না, এখন তো লীডার হলেন গান্ধী। বলিয়া তিনি ঘাড় নাড়িতে আরম্ভ করিলেন—যেন ব্যাপারটা সব হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে—সকল কথাই তাঁহার মনে পড়িয়াছে।

—আমি ডেকে দিচ্ছি নীরেনকে। বলিয়া নীরেনের মা বাহির হইবার জন্য দরজার মুখে ফিরিলেন। মহাবিষ্ণু বলিলেন—শোন।

—কি?

—অভাব কি আজকাল খুব বেশি হয়েছে?

—না, না! কিন্তু নীরেন ওকালতি করলে যে আবার সেই সব হবে। চণ্ডীমণ্ডপ, পূজো, বাড়ি, জমিদারি এ সব ফিরে আসবে।

গাঢ়স্বরে মহাবিষ্ণুবাবু বলিলেন—দেখ, কি করব আমি! লজ্জায় বেরুতে পারি না। কুষ্ঠরোগ নিয়ে কি দশের সামনে বার হওয়া যায়?

—কোথায় তোমার কুষ্ঠরোগ? ওই তোমার এক বাতিক! ডাক্তার কবরেজরা কি বলেছে? দুবার রক্ত পরীক্ষা করানো হ'ল, বলেছে কেউ যে ওই ব্যাধি হয়েছে?

—এই হাতটায়; এটাতে আর কিছু নেই। এইটায় দেখ না, এই রকম লাল হয় কারও হাত? এত টাটিয়ে থাকে? তিনি শীর্ণ জীর্ণ হাতখানি সেই অস্পষ্ট আলোকের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন।

নীরেনের মা একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আর এখন নীরেনকে পাঠাইয়া কোন লাভ নাই—এখন ওই

রোগের কথা ছাড়া আর কোন কথাই মহাবিষ্ণুবাবু বলিবেন না। নীরেন ঘরের মধ্যে বসিয়া ছিল, মাকে দেখিয়া সে প্রশ্ন করিল—বাবার খাওয়া হয়ে গেল মা?

মা বলিলেন—না। তুই কাল সকালে একবার বাবুর সঙ্গে দেখা করবি। আমায় ব'লছিলেন।

—আচ্ছা।

তারপর আবার সে বলিল—কাল কলকাতায় যাব মা। আইনটা পড়ে ফেলাই ভাল; একটা চাকরি-বাকরি দেখে খরচ চালিয়ে নেব কোন রকম করে।

মা খুশি হইয়া উঠিলেন।

নীরেন বলিল, রামসুন্দর দাদার কাছে গিয়েছিলাম আমি। তিনি বললেন, কোন মোড়লের কাছে ষাট টাকা আমাদের পাওনা রয়েছে, কালই তিনি টাকাটা আদায় ক'রে আনবেন। না হ'লে উনিই দেবেন, তারপর আদায় ক'রে নিজে নেবেন।

মা সজল নেত্রে বলিলেন, দেখ বাবা, ঐ রামসুন্দরের অনুগ্রহও আমাদের নিতে হচ্ছে। এ লজ্জার হাত থেকে তুই আমাদের বাঁচা। তোদের পৈতৃক মর্যাদা তুই আবার উদ্ধার কর বাবা!

পরদিনই নীরেন কলিকাতায় রওনা হইয়া গেল।

... ...

মাস ছয়েক পর।

গভীর রাত্রে নীরেনের ডাক শুনিয়া মা চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন।

নীরেন? সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল, না তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন।

—মা!

ওই তো! নীরেনই তো! তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন।

—এমন হঠাৎ যে তুই নীরেন? এখন ট্রেনই বা কোথায়?

হাসিয়া নীরেন বলিল, হরিপুরের একটি ছেলে সঙ্গে ছিল মা। সে একা বাড়ি যেতে পারলে না, তাকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি আসছি। নেমেছি রাত্রি আটটায়।

—কিন্তু কই, বাড়ি আসবার কথা তো লিখিস নি?

—তোমার জন্যে মন কেমন ক'রে উঠল মা। চলে এলাম।

—মুখ হাত ধুয়ে ফেল, ব'স, আমি দুটো গরম ভাত চড়িয়ে দিই।

—ভাত ? একটুখানি চিন্তা করিয়া নীরেন বলিল—আচ্ছা, দাও, অনেকদিন তোমার হাতের রান্না খাইনি। আবার চলে গিয়ে কবে আসব! কালই চলে যাব।

মা তাড়াতাড়ি রান্না চড়াইয়া দিলেন।

—হ্যাঁরে, দুটো ভাজাভুজি ক'রে দিই কেবল—না, তরকারিও একটা ক'রে দেব ? নীরেন!

নীরেন তখন দাওয়ার উপর পড়িয়াই অগাধ ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া গেছে। মা একটু স্নেহের হাসি হাসিলেন, এখনও সেই বালকের মত স্বভাবই রহিয়া গেল, মাটি বিছানা বিচার নাই, মায়ের উচ্ছিষ্ট এখনও কাড়িয়া খায়! ওযে কেমন করিয়া বিদেশে থাকে ?

—দরজা খোল, কে আছে ?

কে ? কাহার কণ্ঠস্বর ? দরজায় এমন ক্রুদ্ধ আস্ফালন ও প্রভুত্বের ভঙ্গিতে কে আঘাত করিতেছে!

দরজা খোল।

নীরেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি চল্লাম মা!

—সে কি! তোর হাতে ও কি!

—পিস্তল!

—পিস্তল! নীরেনের মা ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াই যেন পিস্তলটা চাপিয়া ধরিলেন। ছাড়—ছাড়!

নীরেন পিস্তল ছাড়িয়া দিল। সেটা তৎক্ষণাৎ তিনি উঠানের কুয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া শুধু বলিলেন, নীরেন!

নীরেন বলিল, আমি একজন পুলিশ অফিসারকে গুলি ক'রে মেরেছি মা।

মা এক বিচিত্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নীরেন বলিল, থাকতে পারলাম না মা। অন্য বন্ধুরা আমাকে ভার দিতে চায় নি। আমি নিজেই নিয়েছি, আমি যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম—আশ্চর্য, তোমার মুখও তখন মনে পড়ল না। ওদিকে দরজার খিলটা প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙিয়া খুলিয়া গেল। পুলিশ কর্মচারী ও কনস্টেবলে বাড়ির পাশটা গিস্ গিস্ করিতেছিল।

মায়ের পায়ে একটা প্রণাম করিয়া নীরেন অগ্রসর হইয়া বলিল, আমি ধরা দিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে নিশীথরাত্রির মর্মচ্ছেদ করিয়া একটা তীক্ষ্ণ আর্তস্বর জ্যা বিমুক্ত শরের মতই উর্ধ্বলোকের দিকে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। আর্তনাদ করিয়া নীরেনের মা সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

... ...

রামসুন্দর আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া নীরেনের মামলার তদ্বির তদারকের জন্য কলিকাতা ছুটাছুটি আরম্ভ করিল।

মহাবিষ্ণুবাবুও ব্যাপারটা শুনিয়াছেন। সেই দিনেই তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। খানাতল্লাসী করিতে পুলিশ তাঁহার ঘরেও প্রবেশ করিয়াছিল।

তিনি বলিয়াছিলেন—খুন করেছে নীরেন? অ! তা আমাকে সুদ্ধ ফাঁসি দেবে নাকি?

সেদিন রামসুন্দর ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, আপনাকে একবার যেতে হবে। কোর্টে আপনাকে একবার দাঁড়াতে হবে।

—আমাকে? কেন, আমারও বিচার হবে নাকি?

—না। সরকারী উকিল আমাদের থানার দারোগার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন আসামীর দাদাও খুন করেছে। আমাদের ব্যারিস্টার সেই সুযোগে জেরা করেছেন—আসামীর বাপ পাগল কি না? দারোগা স্বীকার করেছে। কিন্তু নীরেনের জন্মের আগে থেকে পাগলা এইটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে!

মহাবিষ্ণুবাবু বলিলেন, কিন্তু কুষ্ঠরোগ—তা অনেকটা ভাল এখন বটে, কিন্তু তবু তো কুষ্ঠরোগ!... .....

নীরেনের মা বলিলেন, না বাবা রামসুন্দর, ওঁকে আর টানাটানি ক'র না। হয়ত হঠাৎ হার্টফেল হয়ে মারাই যাবেন। বরং গ্রামের কাউকে—

রামসুন্দর বলিল, কার্তিকবাবু যদি সাক্ষী দেন তা হ'লে কিন্তু অনেক কাজ হয়।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরেনের মা বলিলেন, আমাদের কবরেজ মশাইকে দিয়ে হবে না? উনি তো সকলের চেয়ে ভাল জানেন।

—দেখি তাই না হয়, মন্দের ভালও তো হবে। ক্ষুণ্ণ মনেই রামসুন্দর ফিরিল। মহাবিষ্ণুবাবু কি যেন ভাবিতেছিলেন, অকস্মাৎ বলিলেন, আচ্ছা রামসুন্দর!

রামসুন্দর দাঁড়াইল, বলিল, আজ্ঞে!

—আচ্ছা, ওরা আমাকে কেন ফাঁসি দিক না! আমারই তো ছেলে, দোষ তো আমারই।

নীরবে মাথা নত করিয়া রামসুন্দর চলিয়া গেল। চোখে জল মুখে হাসি লইয়া নীরেনের মা বলিলেন, ভেবো না তুমি, রামসুন্দর বলেছে আমাকে—নীরেন খালাস হয়ে যাবে। কবরেজকে দিয়ে এইটে প্রমাণ করাতে পারলেই পাগল বলে খালাস দেবে।

—খালাস দেবে?

—হ্যাঁ দেবে।

—কবরেজকে একবার ডাকাও দেখি।

—ডাকতে হবে না, রামসুন্দর নিজে গেল তাঁর কাছে। তিনি কখনও না বলবেন না।

—না, সেজন্য নয়, ব্যায়রামটা আমার বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে—মানে, এই হাতটা কেবল একবার ভাল করে দেখুন। তুমিই দেখনা, গাঁঠে ঘা হয়েছে না? এইবার বোধ হয় গলবে।

নীরেনের মা দেখিলেন—আঙুলের গিঁঠে গিঁঠে কয়টি ক্ষতচিহ্ন। নখে খুঁটিয়া খুঁটিয়া গিঁঠগুলি ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি কহিলেন, এমন ক'রে নখ দিয়ে ছিঁড়ো না। এ যে সব নখের আঁচড়ের ঘা। ব'স, তোমার নখগুলো কেটে দিই আমি। ছোট একখানি কাঁচি লইয়া তিনি স্বামীর নখ কাটিতে বসিলেন। তাঁহার মরিবার উপায় নাই, তাঁহার কাঁদিবার উপায় নাই, মহাবিষ্ণুবাবু যেন অহরহ তাঁহাকে ডাকেন—দেখ। আমার আঙুলগুলো দেখ তো ভাল ক'রে। না—না, এই হাতে কি খাওয়া যায়! তুমি বরং খাইয়ে দাও।

... ...

কয়েক মাস পর।

আগামী প্রত্যূষে নীরেনের ফাঁসি হইবে। নীরেনের মা বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মৃদুগুঞ্জনে কাঁদিতেছিলেন। মহাবিষ্ণুবাবু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন, তেমনি দৃষ্টি তেমনি ভঙ্গি। ঘরের মধ্যে তেমনি স্বল্প আলোক—আলোকপরিধির চারিপাশে তেমনি নিথর অন্ধকার।

সহসা মহাবিষ্ণুবাবু বলিলেন, রামসুন্দর গেছে কলকাতায়?

—হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যে নাগাদ নীরেনকে নিয়ে ঘরে ফিরবে। বহুকষ্টেই নীরেনের মা উত্তর দিলেন। সংবাদটা মহাবিষ্ণুবাবুর নিকট গোপন রাখা হইয়াছে।

মহাবিষ্ণুবাবু অত্যন্ত বিষণ্নভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। তার ফাঁসি হবে আজ; আমি জানি, শুনেছি আমি। তোমরা কথা কইছিলে—

এতক্ষণে নীরেনের মা হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মহাবিষ্ণুবাবু কিন্তু তেমনি ভঙ্গিতেই বসিয়া রহিলেন। বহুক্ষণ কাঁদিয়া নীরেনের মা বলিলেন, আমার ভাগ্যের দোষ, আমার গর্ভের দোষ, আমার জন্যে তোমার এত কষ্ট!

পূর্বের মত ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া মহাবিষ্ণু বলিলেন—না! তারপর বহুক্ষণ নীরবতার পর বলিলেন, জান না তুমি—কেউ জানে না, শুধু ভগবান জানেন আমার দোষ, আমার রক্তের দোষ! ছায়ামূর্তির মত মৃদু সঞ্চালনে হাত তুলিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ওইখানে তোমার দিদিকে আমি এই দুই হাতে গলা টিপে মেরেছিলাম।

নীরেনের মা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

—আমার নিজের চরিত্র খারাপ ছিল, তাকেও আমার সন্দেহ হ'ত। খুব সুন্দরী ছিল কিনা! আর খুব হাসতো।

নীরেনের মা কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, না—না বলতে হবে না! বলে না!

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার অকস্মাৎ মহাবিষ্ণুবাবু বলিলেন, যখন তার বুকে চেপে বসলাম সে শাপ দিলে, ওই দুই হাতে তোমার কুষ্ঠ হবে। কিন্তু এ হাতটা বাঁচিয়ে দেবে ধীরেন আর ঐটা নীরেন। তোমার দোষ নাই, 'খুনে'র রক্ত তো!

বাহিরে পাখীরা কলরবে প্রত্যূষ ঘোষণা করিয়া উঠিল। নীরেনের মা বুক ফাটাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, নীরেন—নীরেন রে!

চকিত হইয়া মহাবিষ্ণুবাবু বলিলেন, এ্যাঁ!

তারপর বলিলেন, ভোর হয়ে গেল?

জানালাটা খুলিয়া দিয়া ভোরের আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুহূর্তের পর মুহূর্ত লক্ষ লক্ষ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া উদয়াচল হইতে ধারায় ধারায় আলোকের বন্যা ছুটিয়া আসিতেছে, চারিদিক পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। সহসা আপনার হাত দুইটি সেই আলোকের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিয়া বলিলেন, সাদা হয়ে গেছে।

অস্থি-চর্ম-সার রক্তহীন বিবর্ণ হাত—

যাদুকরী

শরতের নির্মল জলভরা বায়ুহিল্লোলিত দীঘিতে কলরব করিয়া যেন একদল বালিহাঁস আসিয়া পড়িল।

আশ্বিন মাস। আকাশ নীল, রৌদ্রে সোনালী আভা, ঘরে ঘরে পুজের আয়োজন-উদ্যোগের সাড়া, দোকানে দোকানে পণ্যসম্ভার, পরিপূর্ণতায় চঞ্চলতায় গ্রামখানি নির্মল জলভরা বায়ুহিল্লোলিত দীঘির সঙ্গেই তুলনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই মধ্যে বালিহাঁসের মতই কলরব করিয়া আসিয়া পড়িল দশ-বারোটি বাজীকরের মেয়ে ও জনচারেক বাজীকর পুরুষ। বাজীকর অথবা যাদুকর।

বাজীকর একটি বিচিত্র জাতি। বাংলা দেশে অন্য কোথাও আছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায় না। বীরভূমের সীথল গ্রামে এবং আশেপাশেই ইহাদের বসতি। বেদে নয় তবু যাযাবরত্বে বেদেদের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। ধর্মে হিন্দু, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন্ জাতি বা সম্প্রদায় জাতিকুল-পঞ্জিকা ঘাঁটিয়াও নির্ণয় করা যায় না। পুরুষেরা ঢোলক লইয়া গান করে, যাদুবিদ্যার বাজী দেখায়। নিরীহ শান্তপ্রকৃতি, গলায় তুলসীর মালা, পরনে মোটা তাঁতের কাপড়, দুই কাঁধে দুইটা ঝোলা ও ঢোলক, মুখে এক অদ্ভুত টানের মিষ্ট ভাষা। ঐ ভাষা হইতেই লোকে চিনিয়া লয় ইহারা বাজীকর। মেয়েরা কিন্তু পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিলাসিনীর জাতি। কেশে বেশে বিন্যাস তাহাদের অহরহ, রাত্রে শুইবার সময়ও একবার কেশবিন্যাস করিয়া লয়, প্রভাতে উঠিয়া প্রথমেই বসে চুল বাঁধিতে। পরনে সৌখীন-পাড় শাড়ি, হাতে এক হাত করিয়া কাচের রেশমী অথবা গিল্‌টির চুড়ি, গলায় গিল্‌টির হার, উপর হাতে তাগা অথবা বাজুবন্ধ, নাকে নাকছাবি, কানে আগে পরিত সারিবন্দী মাকড়ি, এখন পরে গিল্‌টির ঝুমকা, দুল প্রভৃতি আধুনিক ফ্যাশানের কর্ণভূষা। কাঁকালে একটা গোবর-মাটিতে লেপন দেওয়া বিচিত্র-গঠন ঝুড়ি, তাহার মধ্যে থাকে সাপের ঝাঁপি, বাজীর ঝোলা, ভিক্ষাসংগ্রহের পাত্র, সেগুলিকে ঢাকিয়া থাকে ভিক্ষায় সংগৃহীত পুরানো কাপড়। মেয়েদের প্রধান অবলম্বন গান ও নাচ। নিজেদের বাঁধা গান, নিজেদের বিশিষ্ট সুর; নাচও তাই—বাজীকরের মেয়ে ছাড়া সে নাচ নাচিতে কেহ জানে না।

লোকে বলে তামার বদলে রুপো দিলে নির্বিকারচিত্তে নগ্ন অবয়বে নাচে বাজীকরের মেয়ে। দর্শকে চোখ নামায়, কিন্তু বাজীকরের মেয়ের চোখে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে পলক পড়ে না; দুনিয়ার লোকে ছি ছি করে, কিন্তু বাজীকরের সমাজে ইহার নিন্দা নাই, বাজীকরীর বাজীকরের মনের ছন্দ পর্যন্ত মুহূর্তের জন্য অস্বচ্ছন্দ হইয়া উঠে না।

গ্রামে ঢুকিয়া তাহারা ছড়াইয়া পড়িল। দল বাঁধিয়া উহারা ভিক্ষা করে না; দল দূরের কথা—স্বামীস্ত্রীতে একসঙ্গে কখনও গৃহস্থের দুয়ারে গিয়া দাঁড়ায় না।

—ভিক্ষা দাও মা রানী, চাঁদবদনী, স্বামীসোহাগী, রাজার মা!

মুখুজ্জেগিন্নী তরকারির বঁটিতে বসিয়া আনাজ কুটিতেছিলেন, চোখের কোণে দুই ফোঁটা জল টলমল করিতেছিল। সম্মুখে বসিয়া ছিল কন্যা রমা, বিষণ্ণ নতমুখে সে নখ দিয়া মাটি খুঁটিতেছিল অকারণে। গিন্নী বিরক্তিভরে বলিলেন—ওরে, ভিক্ষে দিয়ে বিদেয় কর তো, পূজো এলো আর এই হ'ল বাজী-করের আমদানী।

—নাচন দ্যাখেন মা, গান শোনেন। কই, আমাদের রমা ঠাকরুন কই?

—না। নাচ দেখবার মত মনের সুখ নাই আমার। ওরে!

—বালাই! ষাঠ! শত্রুর মনের সুখ যাক। আপনকার দুঃখ কিসের—

—বকিসনে বলছি। এমন হারামজাদা জাত তো কখনো দেখি নাই। ওরে রমা, ঝি কোথায় গেছে, তুইই দে তো ভিক্ষে।

রমা ভিক্ষা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বাজীকরের মেয়েটি রমার চেয়ে বয়সে বড় হইলেও দেখিতে প্রায় সমবয়সী মনে হয়। তাহার মুখ স্মিতহাস্যে ভরিয়া উঠিল, পরমুহূর্তেই বলিয়া উঠিল—ভোজটা ফাঁকি পড়লাম দিদি ঠাকরুন।

রমা বিরক্তিভরেই বলিল—নে নে ভিক্ষে নে।

—কোন্ মাসে বিয়া হ'ল ঠাকরুন? কোথা হ'ল বিয়া?

গৃহিণী উঠিয়া আসিলেন, রূঢ়ভাবে বলিলেন—ভিক্ষে নিবি তো নে, না নিবি তো বিদেয় হ'।

—ওরে বাপ রে। তাই পারি! আজ শুধু ভিখ নিয়া যেতে পারি! দিদি ঠাকরুনের বিয়ার ভোজ খেতে পেলম নাই, বিদায় পেলম নাই—আজ শুধু ভিখ নিয়া যেতে পারি! আজ নাচ দেখাব—গান শুনাব, শিরোপা নিব। কাঁখালের ঝুড়িটা নামাইয়া কাপড়ের আঁচল কোমরে জড়াইয়া বলিল

—কাপড় নিব, গয়না নিব, রমা দিদির কাছে নিব কাঁচের চুড়ির দাম, তবে ছাড়ব। বলিয়াই সে আরম্ভ করিল—

হায় গো দিদি, কাঁচের চুড়ির ঝম্‌ঝমানি
উর র-র জাগ জাগ জাগিন ঘিনা —
জার ঘিনিনা—
চুড়ির ওপর রোদের ছটা
হায় মরি কি রঙের ঘটা
সোনারুপো বাতিল হ'ল কাঁদছে বসে স্যাকরানী।
বেলাত হতে জাহাজ বোঝাই
হল চুড়ির আমদানি।
উর-র-র জাগ জাগ জাগিন ঘিনা—
জার ঘিনিনা—

সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের চুড়ি সে তালে তালে বাজাইতেছিল—ঝম্ ঝম্! ঝম্ ঝম্! একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পাক খাইয়া খাইয়া বাজীকরীর সর্বাঙ্গ নাচিতেছিল সাপিনীর মত। গিন্নী ও রমা দুজনের বিষণ্ণ মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল—অতি মৃদু ক্ষীণ রেখায়। বাড়ির এবং পাশের বাড়ির মেয়েরাও আসিয়া জুটিয়া গেল। বাজীকরী নাচিয়াই চলিয়াছে—চোখের তারা দুইটি নেশার আমেজে যেন ঢুল ঢুল করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র সুরের গান।

পাড়ার যত এয়োস্তীরি—শাঁখা ফেলে
পরছে চুড়ি—
লালপরী সবুজপরী—মাঝখানে হলুদ পারা—
ওগো চুড়ির বাহার দেখে যা' তোরা—
এবার যদি না দাও চুড়ি, ত্যাজ্য করব
এ ঘরবাড়ি,
নয়তো দোব গলায় দড়ি
তবু চুড়ি পরব গো,
হাতের শাঁখা ঘাটে ভেঙে ফেলব চোখের
নোনা পানি।
উরর-জাগ-জাগ—

গান শেষ করিয়া বাজীকরী থামিল।

চুড়ির জন্ত গলায় দড়ি দিবার সঙ্কল্প শুনিয়া মেয়েরা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছিল, একজন বলিল—মরণ !

বাজীকরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—চুড়ি লইলে মরণ ভাল গো ঠাকরুন। রমা দিদি, চুড়ির পয়সা লিয়ে এস—কাপড় গয়না লিব তোমার বরের কাছে। বর কখন আসবে বল ? চিঠি লিখ তুমি। আমার নাম ক'রে লিখ।

রমা বা গিন্নী কোন কথা বলিল না, একজন প্রতিবেশিনী তরুণী বলিল—তুই যা না হারামজাদী তার কাছে।

—র‍্যাল ভাড়া দাও, ঠিকানা দাও, চিঠি লিখে দাও। আজই যাব। বরকে লিয়ে আসব—নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রমা দিদির দরবারে।

—মরণ ! ও-পাড়ায় যেতে আবার 'র‍্যাল ভাড়া' লাগে নাকি ?

গালে হাত দিয়া মেয়েটা সবিস্ময়ে বলিল—গাঁয়ে গাঁয়ে বিয়া না কি ?

—ঢং করছে ! কিছু জানিস না নাকি ?

—কি কর‍্যা জানব দিদি, আমরা ফিরেছি তো দেশে তিন দিন।

বাজীকরের জাত ভিক্ষা করিয়া দেশে-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাযাবর সম্প্রদায়ের মত গৃহহীন নয় ভূমিহীন নয়—ঘর আছে। প্রাচীনকাল হইতে নিষ্কর জমিও ইহারা ভোগ করে, তবু ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। পূজার পূর্বে দেশে আসে, পূজার পর বাহির হয়, ফেরে ফসল উঠিবার সময়, ফসল তুলিয়া জমিগুলি ভাগচাষে বিলি করিয়া আবার বাহির হয় নীল সংক্রান্তি অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসবের পর। গাজন ইহাদের বিশেষ উৎসব।

মেয়েটি বলিল—ও-পাড়ার বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির দেবুকে জানিস ?

চোখ ছুইটি বড় বড় করিয়া বাজীকরী বলিল—খোকাবাবু ? কলকাতায় কলেজে পড়ে, টকটকে রঙ, শিবঠাকুরের মত ঢুলু ঢুলু চোখ,—লল্ছা'পারা বাবুটি ?

—হ্যাঁ।

—অ-মা গ ! আমি কুথা যাব গ ! মেয়েটা যেন হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।—বুঝল ঠাকরুন, বাবুটিকে দেখতম আর ভাবতম ইয়ার গলায় মালা কে দিবে ? আর রমা দিদিকে দেখ্যা ভাবতম ই লক্ষ্মী ঠাকরুনটি কার গলায় মালা দিবে ?

গম্ভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুখুজ্জেগিন্নী বলিলেন—থাম্ বাবু তুই, আদিখ্যেতা করিস নে। কপালে আমার আগুন লেগেছিল—তাই ওই ঘরে বরে ঝিয়ে দিতে গিয়েছিলাম।

—কেনে মা? মেয়েটা চকিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে সকলের মুখের পানে সে একবার চাহিয়া দেখিল, সকলেরই মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে! রমা দাঁড়াইয়াছে দূরে, নতমুখে। না দেখিয়াও চতুরা বাজীকরী বুঝিয়া লইল—রমার চোখে জল ছলছল করিতেছে।

ক্ষতসন্ধানী মক্ষিকার মত মেয়েটা ব্যগ্রতায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

... ...

মুখুজ্জেরা অবস্থাপন্ন লোক। গ্রামখানি বেশ বড়, গ্রামের চেয়ে ছোট শহর বলিলেই ঠিক হয়—ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্যাণে দিন দিন বড় এবং শহরের শ্রীতেই সমৃদ্ধ হইয়া চলিয়াছে; অবস্থাপন্ন ব্যবসাদারও কয়েকজন আছে, তবু মুখুজ্জেরা অবস্থাপন্ন বলিয়া খ্যাতি আছে। রমা পিতামাতার একমাত্র সন্তান। শ্রীমতী মেয়ে, বাপ-মায়ের আদরের তুলালী। মেয়েকে চোখের আড়াল করিতে পারিবেন না বলিয়াই গ্রামে বিবাহ দিয়াছেন। ঘরজামাইকেও মুখুজ্জে-কর্তা ঘৃণা করেন। ও-পাড়ার বাঁড়ুজ্জেরা এককালে সম্ভ্রান্ত সঙ্গতিপন্ন ঘর ছিল—এখন শুধু সম্ভ্রম আছে, সঙ্গতি নাই। এই বাঁড়ুজ্জেদের দেবনাথ ছেলেটি বড় ভাল। সুরূপ সুন্দর ছেলে, বি. এ. পাশ করিয়া এম. এ. পড়িতেছে। এই ছেলেটির সঙ্গে মুখুজ্জেরা রমার বিবাহ দিয়াছেন। ক্ষেতের কলা মূলা হইতে রান্না-করা তরকারি পর্যন্ত যাহা নিজেদের ভাল লাগিবে—তাহাই মেয়ে-জামাইকে পাঠাইয়া দিবেন, মেয়ে একবেলা থাকিবে শ্বশুরবাড়িতে একবেলা থাকিবে বাপের বাড়িতে—এই ছিল তাঁহাদের কল্পনা।

বিবাহের পর কিন্তু বিরোধ বাধিয়াছে এইখানেই। বনিয়াদী বাঁড়ুজ্জেরা কলা-মূলা রান্না-করা তরকারি উপঢৌকনে অপমান বোধ করিয়াছেন। বধূর একবেলা এখানে—একবেলা ওখানে থাকাও তাঁহারা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। বাদ-প্রতিবাদই চলিতেছিল, অকস্মাৎ একদিন রমাই সেটাকে বিবাদে পরিণত করিয়া তুলিল। রোজ অপরাহ্ণে মুখুজ্জেবাড়ির ঝি আসিয়া রমাকে লইয়া যাইত—দুধ এবং জল খাইবার জন্য। সেদিন কিসের ছুটিতে দেবনাথ আসিয়াছিল বাড়ি। রমার শাশুড়ী আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছেন—দেবু বাড়ি এসেছে, আজ আর বৌমা যাবে না।

পরক্ষণেই দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তিনি বলিলেন—আর রোজ রোজ কচি খুকীর মত দুধ খেতে যাওয়াই বা কেন? গরীব বলে কি দুধও খাওয়াতে পারিনে আমি বেটার বউকে! বলিস তুই, একটা পাড়া অন্তর রোজ আমার বেটার বউ আমি পাঠাব না।

ঝি-টা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—আজকের মত পাঠিয়ে দেন মা, মা আজ খাবার-দাবার করেছেন—

—না-না-না! রূঢ়স্বরে রমার শাশুড়ী জবাব দিয়াছিলেন।

ঝি ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখা গিয়াছিল—বউ বাড়িতে নাই। গ্রামের মেয়ে মা বাপের আদরের দুলালী ততক্ষণে জনবিরল গলিপথে-পথে মায়ের কাছে গিয়া হাজির হইয়াছিল।

আরও কিছুক্ষণ পর মুখুজ্জেবাড়ি হইতে এক প্রবীণা আত্মীয়া আসিয়াছিলেন দেবনাথের নিমন্ত্রণ লইয়া—কই গো দেবুর মা! দেবুর আজ নেমন্তন্ন ওবাড়িতে। শ্বশুর পাঁঠা কেটেছে। শাশুড়ী খাবার করেছে।

নিমন্ত্রণ স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই না করিয়া দেবুর মা জানাইয়াছিলেন কেবল ভদ্রতাসম্মত সম্ভাষণ—এস, বস।

—বসব না ভাই। নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম। বউও তোমার ও-বাড়িতে। খেয়ে-দেয়ে বউ-বেটা তোমার ও বাড়িতেই আজ থাকবে; কাল সকালে আসবে।

বাঁড়ুজ্জেগিন্নীর মুখ আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের মত থমথমে হইয়া উঠিয়াছিল—কথার জবাব তিনি দেন নাই।

—তা হ'লে চললাম ভাই। সন্ধ্যাতেই পাঠিয়ে দিও দেবুকে—

—দেবুকেই কথাটা ব'লে যাও।

—সে কি!

—হ্যাঁ। ব্যাটার শ্বশুরবাড়ীর কথাতেও আমি নাই, বউয়ের কথাতেও আমি নাই।

দেবনাথ রাত্রে যায় নাই। সেও বধূর এই আচরণে ক্ষুব্ধ না হইয়া পারে নাই। শ্বশুর-শাশুড়ীর এই প্রশ্রয়পূর্ণ ব্যবহারও তাহার ভাল লাগে নাই। তাহার উপর ক্ষুব্ধ মাকে উপেক্ষা করিয়া এই নিমন্ত্রণ রক্ষার কোন উপায়ই ছিল না।

ঝগড়ার সূত্রপাত এইখানেই।

দেবনাথের মা বলিলেন—বধূর পিতামাতাকে কন্যাকে লইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া এ বাড়িতে দিয়া যাইতে হইবে।

রমার মা বলিলেন—দেবনাথ নিজে আসিয়া রমার অভিমান ভাঙাইয়া তাহাকে লইয়া যাইবে—তবে তিনি কন্যাকে পাঠাইবেন। উপেক্ষিতা রমা সেদিন নাকি কাঁদিয়াছিল। ধীরে ধীরে সেই বিবাদ কঠিন পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। দেবনাথ স্ত্রীকে চিঠিপত্র পর্যন্ত লেখে না। দেবনাথের মা আস্ফালন করেন—ছেলের তিনি বিবাহ দিবেন—ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক—এই অকাল কয়মাসের অপেক্ষা।

রমার মা ইহাতে ভয় পান না; তিনি কন্যার জন্য দালান-কোঠার প্ল্যান করেন। ইদানীং তিনি খোরপোষ আদায়ের আর্জি পর্যন্ত মুসাবিদা করিতে সুরু করিয়াছেন।

ভরসা কেবল দুই পক্ষের পিতা।

মুখুজ্জে-কর্তা ব্যবসা-বাণিজ্য মহাজনী লইয়া ব্যস্ত। বাঁড়ুজ্জে কর্তা আজীবন মাস্টারি করিয়াছেন—রিটায়ার করিয়াও তিনি আজও পড়াশুনা লইয়া ব্যস্ত। ইতিহাসের মাস্টার, ভাঙামূর্তি, পুরানো পুঁথি সংগ্রহ করিয়া গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান। দুই পক্ষের গিন্নী তারস্বরে চীৎকার করিয়াও অপদার্থ মানুষ দুইটিকে সচেতন করিতে পারেন না বলিয়া মধ্যে মধ্যে কপালে করাঘাত করেন।

বাজীকরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া সারা হইল।

মুখুজ্জেগিন্নীর প্রতিবেশিনীর বাড়িতে বসিয়া কথা হইতেছিল। প্রতিবেশিনী বিরক্ত হইয়া বলিল—মর, এতে আবার হাসি কিসের ?

—হাসি নাই ? ছাগলের লড়াই দেখেছ ঠাকরুন ? বলিয়া আবার খিল খিল করিয়া হাসি !

—হাসি তামাসা পরের কথা রাখ; এখন আমি যা বললাম তার কি বল !

তাহার দিকে চাহিয়া বাজীকরী বলিল—তুমার হাতে যোগবশের ওষুদ খাটবে নাই ঠাকরুন !

মেয়েটি বশীকরণের ঔষধ চায়। সবিস্ময়ে সে বলিল—খাটবে না কেন ?

—রাগ ক'র নাই। তুমি বড় ময়লা থাক ঠাকরুন। আমার ওষুধ দিতে হলে তুমাকে পরিষ্কার হতে হবে কিন্তুক।

—আমি তো রোজ চান করি—

—স্নান করা লয় ঠাকরুন; পরিষ্কারের অনেক করণ আছে। তোমাকে কাপড় পরতে হবে, কেশ বিন্তেস করতে হবে, ঢলকো ক'রে চুল বাঁধবা, কপালে সিঁদুরের টিপ পরবা, গায়ে গন্ধ লিবা। আলতা পরবা। খোঁপাতে ফুল পরবা, সেই ফুল কর্তার হাতে দিবা। দেখ, পার তো এলাচ আন আমি মন্তর দিয়া পড়ে দি।

স্থির দৃষ্টিতে বাজীকরীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া মেয়েটি বলিল—পারব।

—তবে আন, এলাচ আন, ছোট এলাচ, দারচিনি, বড় এলাচ, মন্তর পড়ে দিব, তাই দিয়া মোটা খিলি ক'রে পান সাজবা, নিজে খাবা; খেয়ে কর্তাকে দিবা। কিন্তুক যা বললাম—তা না করলে খাটবে নাই ওষুদ। তখন যেন আমাকে গাল দিয়ো না। আর পাঁচটি পয়সা লাগবে, পাঁচ পাই চাল লাগবে, পাঁচটি সুপারী, সিঁদুর—আর পুরানো কাপড় একখানি। লিয়ে এস।

... ...

বাজীকরী চলিয়াছে বাজারের পথে।

একটা দোকানের সম্মুখে লোকের ভিড় জমিয়াছে, বাজীকর পুরুষ বাজী দেখাইতেছে।

—লাগ—লাগ—লাগ—লাগ ভেলকি লাগ! লাগ বললে লাগবি, ছাড় বললে ছাড়বি। ভাটরাজার দোহাই দিয়ে ডুববি বেটা টুপ টুপিয়ে—! বাহা রে বেটা—বাহা রে!—

একটা বাটির জলে একটা কাঠের হাঁস—ক্রমাগত ডুবিতেছিল আর উঠিতেছিল।

—হাঁ—হাঁ বেটা আর ডুবিস না, সর্দি লাগবে জ্বর হবে!

হাঁসটা ডোবা বন্ধ করিল।

এইবার আমার কাঠের হাঁস—শুন আমার কথা, ক্ষিধায় জলছে পেট, ঘুর‍্যা পড়ছে মাথা। প্যাক প্যাকিয়ে ডাক ছেড়্যা, দে দেখি একটা ডিম পেড়্যা; আগুন জেল্যা পুড়ায়ে খাই।

একটা ঝুড়ির ভিতর কাঠের হাঁসটাকে চাপা দিয়া বাজীকর বোল আওড়াইয়া একটা হাড় ঝুড়িটাতে ঠেকাইয়া দিল।—ভাটরাজার দোহাই দিয়ে, ওঠ বেটা প্যাক পেঁকিয়ে—! দোহাই ভাটরাজার দোহাই! সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়িটা উঠাইতেই দেখা গেল কাঠের হাঁস জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে ঠোঁট দিয়া সে পালক খুঁটিতেছে, পাশে একটা ডিম।

দর্শকের দল আনন্দে বিস্ময়ে হৈ হৈ করিয়া উঠিল। ছোট ছেলের দলে হাততালি আর থামে না! বাজীকরী মৃদু হাসিতে হাসিতে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিল।

—এই বাজকরনী! এই! থানার বারান্দায় বসিয়া ছিল কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী। তিনজন ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়া ছিল। জনকয়েক বসিয়াছিল বারান্দায়। একজন ডাকিল—এই বাজকরনী! এই!

বাজীকরী আসিয়া কাঁখালের ঝুড়িটি নামাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। —পেনাম দারোগাবাবু!

—তোর নাচ দেখা দেখি! এই বাবু তোদের নাচ দেখেন নাই, দেখবেন।

বাজীকরী দেখিল, তাহার চেনা বড়দারোগা ও ছোটদারোগার পাশে নূতন একটি বাবু। চতুরা বাজীকরীর ভুল হইল না, সে মুহূর্তে চিনিল, এও এক দারোগাবাবু। গোঁফের এমন জাঁকালো ভঙ্গি, কপালে এমন গোল দাগ, গায়ে এমন হাতকাটা খাঁকীর জামা দারোগা ছাড়া কাহারও হয় না।

বড়দারোগাকে প্রণাম করিয়া সে বলিল—আপুনি ই-থান থেক্যা চল্যা যাবেন বাবু?

—হঠাৎ আমাকে বিদেয় করবার জন্তে তোর এত গরজ কেন?

—আজ্ঞে, লতুন দারোগাবাবু এলেন—তাথেই বলছি!

—উনি এখানে কাজে এসেছেন।

—কাজে?

—হ্যাঁ, তোকে ধরে নিয়ে যাবেন। পরোয়ানা আছে তোর নামে।

—আমার নামে? মেয়েটি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—হাসছিস যে! তোরা হারামজাদীরা পাকা চোর।

হাসিতে হাসিতে বাজীকরী বলিল—আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু ধর্যা কি করবেন হুজুর, মন চুরির বামাল যে সনাক্ত হয় না।

নূতন দারোগাবাবুটি চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—ওরে বাপ রে!

বাজীকরী দুই হাত তুড়ি দিয়া আরম্ভ করিল—

উয়-র জাগ জাগ জাঘিন ঘিনা জারঘিনি না—
সরু কাপড় নক্সিপেড়ে—মাকড়ী চুড়ি গয়না—
পোট পাটা লাপ কাঁটায় পুঁজিপাটা রয় না—

বিদায় হইয়া বাজীকরী চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বারান্দায় উপবিষ্ট

কনেস্টবল দলের জনদুয়েক উঠিয়া গিয়া থানার বড় বটগাছটার আড়াল হইতেই তাহাকে ডাকিল।

হাসিয়া বাজীকরী বলিল—বল, কি বলছ!

—আমাদের আলাদা করে নাচ দেখাতে হবে।

—দেখাব।

—ল্যাংটা হয়ে নাচতে হবে। এরা এসেছে ভরতপুর থেকে, দেখবে।

মুখের দিকে চাহিয়া বাজীকরী বলিল—একটি টাকা লিব কিন্তুক।

—আমি দেব।

—তুমি ভরতপুরের সিপাই?

—হ্যাঁ।

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বাজীকরী বলিল—কিসের লেগে এলে তুমরা?

—কাজ আছে, পুলিশের কাজ।

ফিক্ করিয়া হাসিয়া মেয়েটা এবার বলিল—কার মাথা খেতে এসেছ আর কি!

কনেস্টবলটিও হাসিল।

বাজীকরী তাহার গা ঘেঁসিয়া চলিতে চলিতে মৃদুস্বরে বলিল—মানুষটা কে বঁধু?

কনেস্টবল তাহার মুখের দিকে চাহিল,—মদিরদৃষ্টিতে বাজীকরী তাহারই দিকে চাহিয়া ছিল, ঠোঁটের রেখায় রেখায় মাখানো লাস্তভরা হাসি।

মেয়েটা সত্যই নাচে সমস্ত আবরণ পরিত্যাগ করিয়া! এতটুকু সঙ্কোচ নাই কুণ্ঠা নাই, যৌবন-লীলায়িত অনাবৃত তনুদেহ, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। সকলের কলুষদৃষ্টি তাহার দিকে নিবদ্ধ থাকিলেও তাহার দৃষ্টি কাহারও দিকে নিবদ্ধ ছিল না। কণ্ঠে মৃদুস্বরে সঙ্গীত—

হায় রে মরি গলায় দড়ি
তুমি হরি লাজ দিবা,
হায় রে মরি গলায় দড়ি
তুমি হরি লাজ দিবা,
তুমার লাজেই আমি মরি
লইলে আমার লাজ কিবা।

কুল ত্যজিলাম মন স’পিলাম
কলঙ্কেরই কাজল নিলাম—
হায় রে মরি বস্ত্র নিয়া
তুমি আমায় লাজ দিবা!
উর-র জাগ জাগ জাগিন ধিনা—

আগন্তুক কনেস্টবলটি একটা টাকাই দিল। খানিকটা পথও তাহাকে আগাইয়া দিল। মেয়েটি বলিল—এইবার এস নাগর, আর নয়।

হাসিয়া সিপাহী বলিল—আচ্ছা!

—তুমি কিন্তুক লোক ভাল নয়।

—কেন?

—বল না কথাটা! মেয়েটি ফিক্ করিয়া হাসিল।

... ...

আশ্বিনের প্রথম নির্মেঘ-নির্মল আকাশে মধ্যাহ্নভাস্কর ভাস্বরতম দীপ্তিতে জ্বলিতেছে। বৈশাখের প্রখরতর বটে কিন্তু এমন উজ্জ্বল নয়। বিগতবর্ষার বর্ষণসিক্ত মাটি হইতে সূর্যের উত্তাপে যেন বাষ্পোত্তাপ উঠিতেছে। ঘামে ভিজিয়া মানুষ সারা হইয়া গেল।

বাজীকরের দল এখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গৃহস্থের বাড়িতে তাহার আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। এইবার সেইখানে গিয়া পাতা পাড়িয়া বসিবে। বাঁড়ুজ্জে-বাড়িতে সেই বাজীকরী আসিয়া চাপিয়া বসিল।

—পেসাদ হ’ল মা ঠাকরন? বাবুদের সেবা হ’ল? পড়ল পাতায় এঁটোকাঁটা?

বাঁড়ুজ্জে-গিন্নী বলিলেন—ব’স্ ব’স্, চেঁচাস নে।

ছেলে দেবনাথ পান মুখে দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, সে বাহির দরজার ওপাশ হইতে মেয়েটাকে ডাকিল—শোন!

কাছে আসিয়া ঠুক করিয়া একটি প্রণাম করিয়া মেয়েটা ফিক্ করিয়া হাসিল, বলিল—আপনকার ভিতরটা পাথরে গড়া!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেবনাথ বলিল—বলেছিস মাকে?

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া মেয়েটি বলিল—মিছা বলেছি তো বেটাবেটীর মাথা খাব বাবু!

—তুই দেখেছিস?

—নিজের চোখে গো! বাপ কাঁদছে, মা কাঁদছে, মেয়ের সেই পণ!

কথাবার্তায় বাধা পড়িল। ভিতর হইতে গিন্নী ডাকিলেন—হ্যালা বাজকরুনী গেলি কোথায়?

দেবনাথ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল—দেখ মা ডাকছেন।

গিন্নী বলিলেন—ওই শোন ওর কাছে।

বাঁড়ুজ্জে কর্তা মেয়েটার দিকে চাহিয়া বলিলেন—বাজীকর তোরা?

—আজ্ঞা হ্যাঁ বাবু; আপনকাদের চরণের ধূলা।

—হুঁ! সাপ আছে? বাজী দেখাতে পারিস? গান গাইতে পারিস? মন্তরতন্তর ওষুদপত্র জানিস?

—আজ্ঞা হ্যাঁ হুজুর।

—ভাটরাজাকে জানিস? ভাটরাজা?

বারবার প্রণাম করিয়া মেয়েটা বলিল—ওরে বাপ রে! দেবতা আমাদের! ভগবান আমাদের! এখনও জমি খাই, দোহাই দিয়ে বাজী দেখাই!

মৃদু হাসিয়া কর্তা বলিলেন—ভাটরাজ নয়। তাঁর নাম হ'ল ভবদেব ভট্ট। আর তোদের গ্রামের নাম কি জানিস? সীথল গাঁ নয়—সিদ্ধল, সিদ্ধল!

গিন্নী রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন—বলি হ্যাঁগা! ঐ সব জিজ্ঞেস করতে তোমায় ডাকলাম বুঝি? যত বাজে—

—বাজে নয়। রাঢ়দেশে সিদ্ধলে ভবদেব ভট্ট মহাপ্রতাপশালী রাজা ছিলেন—তিনি—

—এই দেখ, এইবারে আমি মাথা খুঁড়ে মরব?

কর্তা একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন।

মেয়েটারও বিস্ময়ের সীমা ছিল না; সীথল গ্রামের নাম 'সিদ্ধল', ভাটরাজার নাম ভবদেব ভট্ট! সে বলিল—কর্তাবাবু—আপনি এত কি করা৷ জানলা গো?

গিন্নী বলিলেন—বউমায়ের কথা জিজ্ঞেস কর ওকে। ও নিজে চোখে দেখেছে!

—জিজ্ঞেস আর কি করব! আজই ব্যবস্থা করছি আমি। কর্তা চলিয়া গেলেন পড়ার ঘরে; সিদ্ধলে ভবদেব ভট্টের ইতিহাসটা আজও তাঁহার অসমাপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে। আজ এই বাজীকরীকে দেখিয়া মনে পড়িয়া গিয়াছে।

অপরাহ্নেরও শেষভাগ।

বাজীকরের দল গ্রাম ছাড়িয়া আপন গ্রাম সীথল গ্রামের দিকে চলিয়াছে। গ্রামের প্রান্তে আসিয়া সেই বাজীকরীটা থমকিয়া দাঁড়াইল।

—তুরা চল গো। সবরাজপুরের হোথা দাঁড়াস খানিক। আমি এলাম বল্যে।

দলের কেহ কোন প্রশ্ন করিল না, বলিল—আচ্ছা।

—হ্যাঁ, ও নটবর, তুর বাজীর ঝোলা আর ঢোলকটা দিবি?

নটবর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তু বড় বাড়াবাড়ি করছিস কিন্তুক। মেয়েটা উত্তরে কেবল হাসিল। নটবর মুখে ও' কথা বলিয়াও ঝুলি ও ঢোলক দিতে আপত্তি করিল না। কাঁখালের ঝুড়িতে কাপড় চাপা দিয়া বেশ করিয়া ঢাকিয়া লইয়া মেয়েটা দ্রুতপদে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল। আসিয়া উঠিল ডোমপাড়ায়।

ডোমপল্লী—এ অঞ্চলের বিখ্যাত চোর-ডাকাতের পল্লী। পল্লীর প্রত্যেক মানুষটির রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে অসংখ্য কোটি চৌর্যপ্রবণতার বীজাণু যেন কিলবিল করে।

—গান শোনবা গো? গান! নাচন দেখ। নাচন! মেয়েটা শশী ডোমের বাড়ি আসিয়া ঢুকিল। কাহারও সম্মতির অপেক্ষা করিল না, গান আরম্ভ করিয়া দিল। গান গাহিতে গাহিতে চকিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া দেখিল। সহসা নজরে পড়িল কোঠার জানলায় একখানি মুখ। বাইশ-চব্বিশ বৎসরের জোয়ানের মুখ! মুখখানা তাহার ভাল লাগিল। গান শেষ করিয়া সে শশীকে ডাকিল—শোন।

—কি?

—উপরে মানুষটি কে?

শশী ক্রোধে ভীষণ হইয়া উঠিল।

হাসিয়া মেয়েটি বলিল—রাগ করছ কেনে, ভাল বলছি। তুমার জামাই, হামি জানি।

শশী স্তম্ভিতের মত মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি বলিল—ভরতপুর থেকে দারোগা এসেছে সিপাই এসেছে। কাল সকালে তুমার ঘর খানাতল্লাস হবে, উয়ার নামে পরোয়ানা আছে।

শশী এবার শুকাইয়া গেল।

—তুমার তুয়ারে সারাদিন নোক মোতায়েন আছে। সাঁঝের পরে ঘর ঘেরাও করবে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শশী বলিল, জানি।

—এক কাজ কর। এই ঢোলক দাও, এই ঝুলি দাও উয়ার কাঁধে। মাথায় মুখে গামছাটা বেঁধ্যা দাও ফেটা ক'রে। আমার সাথে সাপ আছে। আমি ধরি মুখটা—উ ধরুক লেজটা, তুমরা চেঁচাও সাপ সাপ বল্যা। আমি উয়াকে নিয়ে চল্যা যাই, পুলিশের নোক বুঝতে লারবে, ভাববে আমরা বাজীকর।

মেয়েটা হাসিতে আরম্ভ করিল, সে যেন আকণ্ঠ মদ খাইয়া নেশায় বিভোর হইয়া পড়িয়াছে।

বাজীকরী চলিয়াছে, সঙ্গে তাহার নকল বাজীকর। দ্রুতপদে পথ অতিক্রম করিয়া গ্রাম পার হইয়া চলিতেছে। দক্ষিণপাড়া ভদ্রলোকের পল্লী, পল্লীপথে একখানা পাল্কী আসিতেছে। সঙ্গে দুইজন লোকের মাথায় বাক্স ও কুটুম্ববাড়ির তত্ত্বতল্লাসের জিনিসপত্র।

পাল্কীটা আসিয়া থামিল বাঁড়ুজ্জে-বাড়িতে। পাল্কী হইতে নামিল বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির বধূ—মুখুজ্জে-বাড়ির মেয়ে রমা। বাঁড়ুজ্জে-গিন্নী আজই দেবনাথকে পাল্কী সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার বধূকে আজই সন্ধ্যার পূর্বে মহেন্দ্রযোগে পাঠাইয়া দিতে হইবে। মুখুজ্জে-কর্তার অমত কোনও কালেই ছিল না। মুখুজ্জে-গিন্নীও আর অমত করেন নাই। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল—দেবনাথ নিজে আসিয়া কন্যার অভিমান ভাঙাইয়া লইয়া যাইবে তবে পাঠাইবেন। দেবনাথ নিজে লইতে আসিয়াছে, কন্যার অভিমান নাই, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সম্মত হইয়া পাঠাইয়া দিলেন। জামাইয়ের হাত ধরিয়া চোখের জলও ফেলিয়াছেন। কাল তিনি বেয়ানের কাছেও আসিবেন। বাপ রে, তিনি জামাইয়ের মা, তাহার উপর তিনি গাহিতে পারেন! মেয়ে পাঠাইয়া তিনি কর্তার কাছে চলিলেন—মেয়ে-জামাইয়ের পূজার ফর্দ লইয়া।

মুখুজ্জে-গিন্নী কর্তার ঘরে ঢুকিয়া লজ্জায় গালে হাত দিলেন। তাঁহার প্রতিবেশীর ঘরের খোলা জানালা দিয়া যাহা তিনি দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার লজ্জার অবধি রহিল না। প্রতিবেশিনী মেয়েটি তো খুকী নয়, সে আজ রঙীন শাড়ি পড়িয়াছে, ব্লাউস পরিয়াছে, কেশবিন্যাসের কি পারিপাট্য, খোঁপায় ফুল। স্বামীর সহিত যাহার দিনরাত ঝগড়া হইত—সে হাসিয়া স্বামীর হাতে পান দিতেছে। স্বামীও হাসিতেছে।

রমা পাল্কী হইতে নামিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া নীরবে অপরাধিনীর মত দাঁড়াইল।

শাশুড়ী সেটুকু অনুভব করিয়া সস্নেহে বধূর মাথায় সিঁদুর দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—ছি মা, কি সর্বনাশ বল দেখি!

রমার চোখ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। গিন্নী বলিলেন—যাও, আপনার ঘর দেখে-শুনে নাও গে। আমি বুড়োমানুষ পারব কেন—তবু যা পেরেছি গুছিয়ে রেখেছি।

গিন্নী কর্তার ঘরের দিকে গেলেন। কর্তা ঘাড় গুঁজিয়া লিখিতেছিলেন।

—দেখ, কথাটা সত্যি।

—হুঁ।

—আফিং যদি না খেতে চাইবে তবে বৌমা কাঁদল কেন? বাজকরুনী ভাগ্যে দেখেছিল! ছুঁড়িটা এইদিন এলে একখানা কাপড় দেব।

কর্তা মুখ তুলিয়া বিজ্ঞের মত খানিকটা হাসিয়া বলিলেন, ওদের খবর মিথ্যা হয় না গিন্নী! ওরা কারা, জান? আবার খানিকটা হাসিয়া বলিলেন, ওরা নিজেরা অবশ্য জানে না; বাংলা দেশেই বা ক'জনে জানে! শোন:

"রাঢ়ের সিদ্ধলরাজ ভবদেব ভট্ট—গুপ্তচরের এক অতি নিপুণ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নটী ও রূপোপজীবিনীদের সন্তানসন্ততি লইয়া গঠিত হইয়াছিল এই সম্প্রদায়। নারী এবং পুরুষ উভয় শ্রেণীই গুপ্তচরের কাজ করিত। ইহাদিগকে ভোজবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র, অবধৌতিক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত, নারীরা নৃত্যগীতে নিপুণ ছিল। এই সম্প্রদায় যাযাবরের মত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশে দেশান্তরে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিত। তৎকালীন অন্যান্য রাজারাও এই দৃষ্টান্তে—"

গিন্নী চলিয়া যাইতেছিলেন, কর্তা বলিলেন, শেষটা শোন—

গিন্নী পিচ্ কাটিয়া বলিলেন, ওসব শুনবার আমার এখন সময় নেই। যত সব উদ্ভট কথা।

… … …

গ্রামের প্রান্তে নকল বাজীকরকে বিদায় দিয়া বাজীকরী বলিল—চললাম নাগর! এইবার চল্যা যাও সোজা!

দ্রুতপদে বাজীকরী সবরাজপুরের দিকে চলিল।

এত বড় ডোম জোয়ানটি বারবার কথা বলিতে চাহিয়াও পারিল না। বহুকষ্টে অবশেষে তাহার কথা ফুটিল—সে ডাকিল—শোন!

কেহ উত্তর দিল না। রাত্রির অন্ধকারে-অভ্যস্ত চোখে ডোম ছেলেটি দৃষ্টি হানিয়া তাকাইল—কিন্তু দেখিতে পাইল না। বাজীকরী যেন মিলাইয়া গিয়াছে।

হুটু মোক্তারের সওয়াল

ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞের সমারোহের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের সূচনা হইয়াছিল, ত্রেতায় লঙ্কাকাণ্ডের সূচনাও রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের সমারোহের মধ্যে। পুষ্পদলের মর্ম্মস্থলনিবাসী কীটের মত এক-একটা সমারোহের আনন্দ-কোলাহলের অন্তরালে লুকাইয়া থাকে অশান্তির সূচনা। কঙ্কণা গ্রামেও একটি অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়া গেল। কঙ্কণা গ্রামের ধনী অধিবাসীদের দানে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারই উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের সমারোহ উপলক্ষ্যে হুটু মোক্তারের সহিত কঙ্কণার বাবুদের বিবাদ ঘটিয়া উঠিল।

বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম কঙ্কণা, কঙ্কণার ধনের প্রসিদ্ধি এ দেশে বহুবিস্তৃত এবং বহুপ্রসিদ্ধ। দূর হইতে কঙ্কণার দিকে তাকাইলে কঙ্কণাকে পল্লীগ্রাম বলিয়া মনে হয় না, কোন বিশিষ্ট শহরের অভিজাত পল্লী বলিয়া মনে হয়। বহুকাল হইতে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, কঙ্কণায় নাকি মা-লক্ষ্মী বাঁধা আছেন। কোন্ অতীতকালে মা-লক্ষ্মী ওই পথ দিয়া যাইতেছিলেন; সহসা তাঁহার হাতের কঙ্কণ খসিয়া পথের ধূলার মধ্যে পড়িয়া যায়, সেই কঙ্কণের মমতায় আজও তিনি কঙ্কণা গ্রামের মধ্যে ঘুরিতেছেন। কঙ্কণ হইতেই গ্রামের নাম কঙ্কণা।

প্রবাদ চিরকাল প্রবাদই, কিন্তু প্রবাদ রটিবার একটা হেতু সর্বত্রই থাকে, এ ক্ষেত্রেও হেতু একটা আছে। কঙ্কণা গ্রামের মুখুজ্জেরা বাংলা দেশের মধ্যে খ্যাতিমান ধনী। বাংলার বহু স্থানেই তাঁহাদের টাকা ছড়ানো আছে। বহু জমিদার-পরিবারই মুখুজ্জেদের ঋণদায়ে আবদ্ধ। তাহার উপর মুখুজ্জেরা নিজেরাও জমিদার।

মুখুজ্জে-পরিবার এখন জনে বহুবিস্তৃত, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের ধনের পরিমাণ কমে নাই। সন্ততিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুদও সমানে বাড়িয়া চলিয়াছে।

লোকে অবশ্য বলে, মুখুজ্জেদের সিন্দুকে টাকার বাচ্চা হয়, কিন্তু সেটাও প্রবাদ। কঙ্কণায় বাবুদের সুদের কারবার লক্ষ লক্ষ টাকার।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এমন একখানি ধনীর গ্রাম, তবুও গ্রামের মধ্যে না আছে স্কুল, না আছে ডাক্তারখানা, এমন কি হাট-বাজার পর্যন্ত নাই। থাকিবার মধ্যে আছে খান-দুই মিষ্টির দোকান, কিন্তু মুড়ি-মুড়কি মণ্ডা বাতাসা ছাড়া আর কোন কিছু দোকানে পাওয়া যায় না। অন্য কোন মিষ্টান্ন রাখিতে বাবুদের নিষেধ আছে, দোকানীরাও রাখে না।

বাবুরা বলেন, মিষ্টি থাকলেই ছেলেরা খাবে, আর মিষ্টি খেলেই ছেলেদের পেটে কৃমি হবে।

দোকানী বলে, আজ্ঞে, সবই ধার, রেখে কি করব বলুন? খাজনায় আর কত কাটানো যাবে? তা ছাড়া, আমার দোকানে বাকি বাড়লে বাবুদের খাতায় খাজনার সুদ বাড়বে।

হাটের কথায় কঙ্কণার বাবুরা বলেন, হাট তো হ'ল লক্ষ্মী নিয়ে বেসাতি; মা-লক্ষ্মী চঞ্চলা হবেন যে! স্কুলের কথায় তাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, বলেন, সর্বনাশ! মায়ের সতীন ঘরে আনব! ছেলেরা বাইরে লেখাপড়া শিখে আসুক, কিন্তু কঙ্কণায় সরস্বতীর আসন বসানো হবে না।

ডাক্তারখানার বিরুদ্ধেও এমনই-ধারা যুক্তিতর্ক নিশ্চয় প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে যুক্তিতর্ক জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট টিকিল না। সাহেবের আদেশে বাবুদের চাঁদায় কঙ্কণায় এক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

সেই দাতব্য চিকিৎসালয় উদ্বোধনের দিন। সে এক মহাসমারোহের অনুষ্ঠান। ডাক্তারখানার নূতন বাড়িখানির সম্মুখেই চাঁদোয়া খাটাইয়া দেবদারু পাতা ও রঙিন কাগজের মালায় মণ্ডপ সাজানো হইয়াছে। থানার জমাদারবাবু হইতে জেলার জজ-ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সকলেই আসিয়াছেন। সদরের ও মহকুমার উকিল-মোক্তারও অনেকে উপস্থিত আছেন। ভালকুটি-গ্রামের মুচীদের ব্যাণ্ড-বাজনা পর্যন্ত ভাড়া করা হইয়াছে। আবাহন, বরণ, পুষ্পবর্ষণ, মাল্যদান, স্তবগান শেষ হইতে হইতেই করতালিধ্বনিতে আসর বেশ জমিয়া উঠিল। সভামণ্ডপের একটা দিক অধিকার করিয়া সারি সারি চেয়ারে চোগা চাপকান পাগড়ি আংটি চেন ঘড়িতে সুশোভিত হইয়া মুখুজ্জে-কর্তারা বসিয়া আছেন। কয়জন তরুণবয়স্কের পরিধানে হ্যাট কোট টাই,

চোখে চশমা। কর্তারা প্রত্যেক অনুষ্ঠানের শেষে ঘাড় নাড়িয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন।

অতঃপর আসিল বক্তৃতা-পর্ব। এইবার আসরটা যেন ঝিমাইয়া পড়িল। দেখা গেল, সকলেই হাততালি দিবার লোক—বক্তৃতা দিবার লোক কেহ নাই। অবশেষে জেলার ফৌজদারী আদালতের একজন উকিল উঠিয়া এই কমলাশ্রিত বংশটিকে কল্পতরুর সহিত তুলনা করিয়া বেশ খানিকটা বলিয়া আসরের মানরক্ষা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে করতালি-ধ্বনিতে আসর যেন ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

তারপর সভা আবার নিস্তব্ধ। সভাপতি জেলার জজ সাহেব চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, বলুন, কেউ যদি কিছু বলবেন।

কেহ সাড়া দিল না।

আবার সভাপতি বলিলেন, বলুন, বলুন, যদি কেউ বলতে চান।

রামপুর মহকুমার বৃদ্ধ মুন্সেফবাবু এবার ঝুটুবাবুকে অনুরোধ করিলেন, ঝুটুবাবু, আপনি কিছু বলুন।

ঝুটুবাবু—ঝুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়—রামপুর মহকুমার মোক্তার। সমবয়সী না হইলেও ঝুটুবাবুর সহিত মুন্সেফবাবুর ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা। ঝুটুবাবু হাতজোড় করিয়া বলিলেন, মাফ করবেন আমাকে।

সভাপতি কিন্তু মাফ করিলেন না, তিনি অনুরোধ করিয়া বলিলেন, না না, বলুন না কিছু আপনি।

ঝুটুবাবু এবার মোটা দুস্থতী চাদরখানা খুলিয়া চেয়ারের হাতলের উপর রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর আরম্ভ করিলেন, সভাপতি মহাশয়, এবং মহাশয়গণ, আপনারা সকলেই বোধ হয় জানেন যে, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার মুখে প্রথমে দেয় মধু। লোকে বলে, আমার মা নাকি আমার মুখে নিমফুলের মধু দিয়েছিলেন। আমার কথাগুলো বড় তেতো। সেইজন্যেই আমি কোনো কিছু বলতে নারাজ ছিলাম। তবে ভরসা আছে, ব্যঞ্জনের মধ্যে উচ্ছেরও একটা স্থান আছে এবং দেহে রসাধিক্য হ'লে তিক্তভক্ষণই বিধেয়, সেইজন্যেই বসন্তে নিম্বভক্ষণের ব্যবস্থা। কঙ্কণা গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হ'ল আমাদের ধনী মুখুজ্জে-বাবুদের দানে, খুব সুখের কথা, আনন্দের কথা—ভাল অবশ্য বলতেই হবে। কিন্তু আমার বার বার মনে হচ্ছে, এ হ'ল গরু মেরে জুতো দান, আর জুতো-জোড়াটা ওই মরা গরুর চামড়াতেই

তৈরী। এ অঞ্চলের সেচের পুকুরের সেচ বন্ধ করেছেন এই বাবুরা, ফলে অজন্মাহেতু অনাহারে চাষী আজ দুর্বল, রোগের সহজ শিকার হয়েছে। সুদের সুদ ভস্য সুদ তাদের কাছ থেকে আদায় ক'রে তাদের পথে বসিয়ে—

সমস্ত সভাটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সভায় উপস্থিত মুখুজ্জে-বাবুরা বসিয়া বসিয়া ঘামিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের হাসি তখন কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহারা পাষাণমূর্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদের দিকে চাহিয়া সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলীও কেমন অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন।

হুটুবাবু তখন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি বলিতেছিলেন, আমার পূর্বের বক্তা মহাশয় এঁদের কল্পতরুর সঙ্গে তুলনা করলেন। আমার মনে হয়, তিনি এঁদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ রসিকতা করেছেন, কারণ বাস্তব সংসারে কল্পতরু অলীক বস্তু—আকাশ-কুসুমের পুষ্পাঞ্জলির মতই হাস্যকর। আমার মনে হয়, এঁদের তুলনা হয় একমাত্র খেজুরগাছের সঙ্গে—মেসোপটেমিয়ার খেজুরগাছ নয়, আমাদের খাঁটি দেশী আঁটিসার খেজুরগাছের সঙ্গে। তলায় ব'সে ছায়া কেউ কখনও পায় না, ফল—তাও আঁটিসার, আর আলিঙ্গন করলে তো কথাই নেই, একেবারে শর-শয্যা। এঁদের সুদের হার চক্রবৃদ্ধিহারে, এঁদের প্রজার জন্যে বরাদ্দ দোকানে বরাত—আধ পয়সার মুড়ি, আধ পয়সার বাতাসা। আর কেউ যদি কাকুতি-মিনতি ক'রে সুদ মাফের জন্যে জড়িয়ে ধরে, তবে কথার কাঁটায় তার শরশয্যাই হয়। তবে ভরসার মধ্যে আমাদের হেঁসো—খেজুরগাছের গলা কাটবার জন্যে খাঁটি ইস্পাতে তৈরি অস্ত্র—এই এঁরা।

হুটুবাবু এবার সরকারী কর্মচারীবৃন্দের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, এটা বলা হইতেছে তাঁহাদিগকে।

—খেজুরগাছের কাছে রস আদায় করতে হ'লে হেঁসো না হ'লে হয় না। হেঁসো চালালে গলগল ক'রে মিষ্টরসে খেজুরগাছ কলসী পূর্ণ ক'রে দেয়। আজ তেমনই এক কলসী রস আমাদের বিলাতী পান-দেওয়া কাঞ্চননগরী হেঁসো এই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের কল্যাণে এ চাকলার লোকে পেয়েছে, তাতে তাদের বুকফাটা তৃষ্ণার খানিকটা নিবারণ হবে। এজন্যে হেঁসো এবং খেজুরগাছ দু তরফকেই ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

হুটুবাবু বসিলেন। কিন্তু করতালিধ্বনি বিশেষ উঠিল না, মাত্র কয়টা অবোধ ছেলে সোৎসাহে হাততালি দিয়া উঠিল। এতক্ষণে সভাস্থ সকলে

হাতের উপর বার-কয়েক হাত নাড়িলেন, কিন্তু শব্দ তাহাতে উঠিল না। তারপর সভা-প্রাঙ্গণ নিস্তব্ধ, সকলেই কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেছিলেন। সমস্ত সভাটা বায়ুপ্রবাহহীন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষারাত্রির মত ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে। মুখুজ্জে-বাবুরা মাথা হেঁট করিয়া রুদ্ধ রোষে অজগরের মত ফুলিতেছিলেন।

কোন মতে সভা শেষ হইয়া গেল, অভ্যাগতরা সকলে বিদায় হইয়া গেলেন, তারপর মুখুজ্জেরা মাথা তুলিলেন। মাথা তুলিলেন বিষধর অজগরের মতই, হুটু মোক্তারকে ধ্বংস করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহারা আপন আপন অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

সংবাদটা কিন্তু হুটুবাবুর নিকট অজ্ঞাত রহিল না, যথাসময়ে রামপুরে বসিয়াই তিনি কঙ্কণার সংবাদ পাইলেন। বৃদ্ধ মুন্সেফবাবুই তাঁহাকে সংবাদটা দিলেন, কথাটা তাঁহারই কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সংবাদ শুনিয়া হুটুবাবু হাসিয়া হাতজোড় করিয়া কাহাকে প্রণাম জানাইলেন।

মুন্সেফবাবু বলিলেন, বাবুদের প্রণাম জানাচ্ছেন নাকি?

—না, মহর্ষি দুর্বাসাকে প্রণাম জানালাম।

—তা হ'লে বলুন, নিজেকেই নিজে প্রণাম করলেন, লোকে তো আপনাকেই বলে—কলিযুগের দুর্বাসা।

হুটুবাবু বলিলেন, না, তা হ'লে কোন্ দিন লক্ষ্মীর দম্ভ চূর্ণ করবার জন্যে সাগরতলে তাঁকে আবার একবার নির্বাসনে পাঠাতাম।

হুটু মোক্তার ওই এক ধারার মানুষ। তিনি যে সেদিন বলিয়াছিলেন, আমার মা আমার মুখে নিমের মধু দিয়াছিলেন, সে কথাটা তাঁহার অতিরঞ্জন নয়, কথাটা না হউক তাঁহার ইঙ্গিতটা নির্জলা সত্য। বাল্যকাল হইতেই ওই তাঁহার স্বভাব।

প্রথম জীবনে বি. এ. পাস করিয়া হুটুবাবু স্কুল-মাস্টারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে মনে কামনা ছিল, শিক্ষকতার একটি আদর্শ তিনি স্থাপন করিয়া যাইবেন। কিন্তু ওই স্বভাবের জন্যই তাঁহার সে কামনা পূর্ণ হয় নাই, শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া মোক্তারি ব্যবসায় অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছেন।

ঘটনাটা ঘটিয়াছিল এইরূপ।—সেবার পূজার সময় তাঁহার গ্রামের ধনী

এবং জমিদার চাটুজ্জেদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া তাঁহার স্ত্রী কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আর আমি কোথাও নেমন্তন্ন খেতে যাব না।

হুটুবাবু কি একখানা বই পড়িতেছিলেন, তিনিও মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন ?

এ 'কেন'র উত্তর তাঁহার স্ত্রী সহজে দিতে পারিল না, বলিতে গিয়া বার বার সে কাঁদিয়া ফেলিল। বিরক্ত হইয়া হুটুবাবু বই বন্ধ করিয়া ভাল করিয়া উঠিয়া বসিলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া বহুকষ্টে অবশেষে জানিলেন, তাঁহার স্ত্রী দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রামের বর্ধিষ্ণু ঘরের সালঙ্কারা বধূদের পংক্তিতে খাইতে বসিয়াছিল, ফলে পরিবেষণের প্রতিটি দফাতেই সে অপমানিত হইয়াছে। যে ভাবে গৃহকর্ত্রী ও দাসীর প্রতি প্রত্যক্ষেই দুই ধারার ব্যবহার হইয়া থাকে, সেই ভাবেই সে দাসীর মত ব্যবহারই পাইয়াছে।

হুটুবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; তারপর আপন মনেই বলিলেন, দুর্বাসা মিথ্যে তোমায় অভিসম্পাত দেয় নি! সে ঠিক করেছিল।

তাঁহার স্ত্রী কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। হুটুবাবুর দৃষ্টি তাহার মুখের উপর নিবদ্ধ হইতেই সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

হুটুবাবু বলিলেন, আচ্ছা, দুটো বছর সময় আমাকে দাও। এর প্রতিকার আমি করব।

তাহার পরই তিনি মোক্তারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিলেন। এক বৎসরেই তিনি মোক্তারি পাস করিয়া রামপুর মহকুমায় প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ করিয়া দিলেন। তৃতীয় বৎসরের পূজায় সধবা-ভোজনের সময় একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। মাছ পরিবেষণ চলিতেছিল, পরিবেষক হুটুবাবুর স্ত্রীর পাতার নিকট আসিতেই সে প্রকাণ্ড একটা টাকার তোড়া কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়া সশব্দে নামাইয়া দিয়া বলিল, এই এঁদের সমান গহনাই আমার হবে, এই তার টাকা। এখন ওঁদের সমান মাছ আমাকে না দাও, একখানার চেয়ে কম আমাকে দিও না।

পরিবেষকের হাত হইতে মাছের বালতিটা খসিয়া পড়িয়া গেল। তারপর গ্রাম জুড়িয়া দেশ জুড়িয়া সে এক তুমুল আন্দোলন। লোকে হুটুবাবুকেই দোষ দিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, তাঁহার উর্ধ্বতন পুরুষগণকেও দোষ দিয়া বলিয়াছিল,

বিছুটির ঝাড় গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে হুল। জ্বালা-ধরানো ওদের স্বভাব।

হুটুবাবুর পিতামহ ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত লোক, কিন্তু পাণ্ডিত্যের খ্যাতির তুলনায় অপ্রিয় সত্যভাষণের অখ্যাতি ছিল বেশি। সে আমলের কোন এক রাজবাড়িতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে শাস্ত্র-বিচারের আসরে যুবরাজ তাঁহার নাসিকাগ্র প্রবেশ করাইয়া ফোড়ন দিতে দিতে গীতার একটা শ্লোক আওড়াইয়া উঠিয়াছিলেন, মশায়, স্বয়ং ভগবান ব'লে গেছেন, যদা যদা হি ধর্মস্য—

হুটুবাবুর পিতামহ বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন, জিহ্বার জড়তা দূর হয় নি আপনার, আরও মার্জনা দরকার, জদা জদা নয়, যদা যদা।

হুটুবাবুর পিতার নাম ছিল—কুণো কালীপ্রসাদ। তিনি বিদ্যায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন না বা অন্য কোন বিশেষত্বও তাঁহার ছিল না; সমাজে তাঁহার কোন প্রতিষ্ঠাও হয় নাই, সেজন্য দাবিও কোন দিন তিনি করেন নাই। কিন্তু সমস্ত জীবনটা তিনি ঘরের কোণে বসিয়াই কাটাইয়া গিয়াছেন। শত্রুতা তিনি কাহারও সহিত কোন দিন করেন নাই, কিন্তু তবু লোকে বলিত, কি অহঙ্কার লোকটার!

যাক, ওসব পুরাতন কথা।

হুটুবাবু কঙ্কণার জমিদারদের শপথের কথা শুনিয়া বিচলিত হইলেন না। এদিকে কঙ্কণার বাবুরা তাঁহাদের চিরাচরিত প্রথায় প্রতিশোধ-গ্রহণের পন্থা অবলম্বন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চর বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া সংবাদ দিল, হুটুবাবুর ঋণ কোথাও নাই। বাবুরা সংবাদ লইতেছিলেন, কোথায় কাহার কাছে হুটু-মোক্তারের হ্যাণ্ডনোট বা তমসুক আছে। থাকিলে সেগুলি কিনিয়া ঋণজালে আবদ্ধ হুটুকে আয়ত্ত করিয়া তাঁহাকে বধ করিতেন।

মুখুজ্জেদের বড়কর্তা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাঁহার কর্মচারীকে প্রশ্ন করিলেন, লাট কমলপুরের জমিদারদের এখন অবস্থা কেমন?

কমলপুরেই হুটুবাবুর বাড়ি, তাঁহার জমিজমা, পুকুর, বাগান যাহা কিছু সম্পত্তি সমস্তই কমলপুরের এলাকার মধ্যে।

সরকার উত্তর দিল, অবস্থা অবিশ্যি তেমন ভাল নয়, তবে ওই চ'লে যায় কোন রকমে সব। দু-এক ঘরের অবস্থা একেবারেই ভাল নয়।

কর্তা বলিলেন, তবে কিনে ফেল তাদের অংশ। টাকা বেশি লাগে লাগুক। হ্যাঁ, তবে আমাদের সকল শরিককে একবার জিজ্ঞাসা কর।

মাস চারেক পর।

সন্ধ্যার সময় হুটুবাবু সন্ধ্যা-উপাসনা করিতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হুটুবাবু কিন্তু দেখিয়াও দেখিলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া স্ত্রী বলিল, ওগো, কমলপুর থেকে আমাদের মহাভারত মোড়ল এসেছে।

হুটুবাবু চোখ বুজিয়া ধ্যানে বসিলেন।

স্ত্রী বলিল, তাকে নাকি কঙ্কণার বাবুরা মারধর করেছে, তার পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে নিয়েছে, গরুগুলো খোঁয়াড়ে দিয়েছে।

হুটুবাবু মুদ্রিত নেত্রেই নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার স্ত্রী এবার বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল। নিয়মমত সন্ধ্যা-উপাসনা শেষ করিয়া হুটুবাবু উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, কই, দুধ গরম হয়েছে?

স্ত্রী আসিয়া দুধের বাটি নামাইয়া দিল, হুটুবাবু বলিলেন, দেখ, ভগবানকে যখন মানুষ ডাকে, তখন তাকে চঞ্চল করতে নেই।

স্ত্রী বলিল, বেচারার যে হাপুস-নয়নে কান্না, আমি আর থাকতে পারলাম না বাবু। মুখের খাবার বেচারার চোখের জলে নোন্তা হয়ে গেল।

মুখ ধুইয়া পান মুখে দিয়া হুটুবাবু বাহিরের ঘরে আসিতেই মহাভারত তাঁহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল। হুটুবাবু তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, ওঠ ওঠ। কি হয়েছে আগে বল, তারপর কাঁদবে।

মহাভারতের কান্না আরও বাড়িয়া গেল।

হুটুবাবু এবার অত্যন্ত কঠিন স্বরে বলিলেন, বলি, উঠবে, না কি?

কণ্ঠস্বরের রূঢ়তায় ও কথার ভঙ্গিমায় মহাভারত এবার সসঙ্কোচে উঠিয়া বসিয়া করুণভাবে চোখের জল মুছিতে আরম্ভ করিল।

হুটুবাবু প্রশ্ন করিলেন, কি হয়েছে বল।

—আজ্ঞে, কঙ্কণার বাবুরা আমার পুকুরের সমস্ত মাছ—এই হালি-পোনা তিন ছটাক, এক পো ক'রে—

—তিন ছটাক, এক পো এখন বাদ দাও। তোমার পুকুরের সমস্ত মাছ কি হ'ল তাই বল।

—আজ্ঞে, জোর ক'রে বাবুরা ধরিয়ে নিলেন।

—তারপর ?

এ প্রশ্নে মহাভারত অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ঘুটুবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, আর কি করেছেন ?

—আজ্ঞে, আমার গরু-বাছুর সব জোর ক'রে ধ'রে খোঁয়াড়ে দিয়েছেন।

—আর ?

এবার মহাভারত আবার ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, চাপরাসী দিয়ে ধ'রে বেঁধে আমাকে—

আর সে বলিতে পারিল না।

ঘুটুবাবু বলিলেন, হুঁ। কিন্তু কারণ কি ? কিসের জন্যে তোমার ওপর বাবুরা এমন করলেন ?

কোনরূপে আত্মসংবরণ করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে মহাভারত বলিল, আজ্ঞে, আমাকে ডেকে বাবুরা বললেন, ঘুটু মোক্তারের জমিজমা সব তুমিই ভাগে কর শুনেছি। তা তোমাকে ওসব জমি ছেড়ে দিতে হবে। ঘুটু মোক্তারের জমি এ চাকলায় কেউ চষতে পাবে না।

ঘুটুবাবু বলিলেন, হুঁ, তারপর ?

—আজ্ঞে, আমি তাইতে জোড়হাত ক'রে বললাম,—হুজুর, তা আমি পারব না। তিনি বেরামভন—ভাল লোক—আমরা তিন পুরুষ ওনাদের জমি করছি—পুরনো মুনিষ। তাতেই আজ্ঞে—

কান্নার আবেগে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, সে নীরবে রুদ্ধবাক হইয়া মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ঘুটুবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হুঁ, তোমাকে মামলা করতে হবে মহাভারত। খরচপত্র সমস্ত আমার, আসা-যাওয়া আদালত-খরচা সব আমি দেব, তুমি মামলা কর। দেখ, ভেবে দেখ। কাল সকালে আমাকে জবাব দিও। আর সে যদি না পার, তুমি আমার জমি ছেড়ে দাও। তাতে আমি একটুও দুঃখ করব না। ক্ষতি যা হয়েছে, তা আমি তোমার পূরণ ক'রে দেব।

তারপর তিনি লণ্ঠনের আলোটা বাড়াইয়া দিয়া খান-কয়েক বই টানিয়া লইয়া বসিলেন। গভীর মনোযোগের সহিত আইনগুলি দেখিয়া বই বন্ধ করিয়া যখন উঠিলেন, তখন মহকুমা শহরটিও প্রায় নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে, অদূরবর্তী

জংশন স্টেশন-ইয়ার্ডে মালগাড়ির শান্টিঙের শব্দ গম্ভীর এবং উচ্চতর হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারত তখনও পর্যন্ত নির্বাক হইয়া সুটুবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সুটুবাবু বলিলেন, তুমি তখন থেকে ব'সে আছ মহাভারত? জল তো খেয়েছ, কই তামাক-টামাক তো খাও নি?

মহাভারতের চোখ তখনও ছলছল করিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল, আজ্ঞে, এই যাই।

সুটুবাবু বলিলেন, তোমার ক্ষতি যা হয়েছে, সে আমি পূরণ ক'রে দেব, কিন্তু অপমানের ক্ষতিপূরণ তো করতে পারব না। সেজন্যে তোমাকে মামলা করতে হবে, রাজার দোরে দাঁড়াতে হবে।

মহাভারত এবার আবার কাঁদিয়া ফেলিল, সুটুবাবুর কণ্ঠস্বরের স্নেহস্পর্শে তাহার শোক যেন উথলিয়া উঠিল, বলিল, আজ্ঞে বাবু, ছোট কচি মাছ, এই বছরের হালি-পোনা, এক পো, তিন ছটাকের বেশি নয়।

সুটুবাবু এবার বিরক্ত হইলেন না, ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, হাসিলেন না, বলিলেন, যাও, তামাক-টামাক খেয়ে ভাত খেয়ে নাও গিয়ে।

মহাভারত চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

ভিতরে গিয়া সুটুবাবু স্ত্রীকে বলিলেন, আজ থেকে আর আমার বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো হবে না।

সবিস্ময়ে স্ত্রী বলিয়া উঠিল, সে কি! ও কি সব্বনেশে কথা!

সুটুবাবু বলিলেন, না, হবে না।

স্ত্রী প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

মোকদ্দমা দায়ের হইয়া গেল।

সুটুবাবুর পরিচালনাগুণে, তাঁহার তীক্ষ্ণধার প্রশ্নে প্রশ্নে সমগ্র ঘটনাটার উপরের সাজানো আবরণ খানখান হইয়া খসিয়া পড়িয়া সত্যের নগ্নমূর্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাহার উপর তাঁহার সূক্ষ্ম এবং দৃঢ় যুক্তিতর্কের প্রভাবে কঙ্কণার বাবুদের গোমস্তা ও চাপরাসীকে বিচারক দোষী স্থির না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাদের প্রতি কঠিন দণ্ডবিধান করিলেন। দেশময় একটা সাড়া পড়িয়া গেল। কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না, কঙ্কণার বাবুরা জজ-আদালতে আপীল করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ মুন্সেফবাবু আসিয়া বলিলেন, হুটুবাবু, যথেষ্ট হয়েছে, এইবার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন।

সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হুটুবাবু বলিলেন, বলছেন কি আপনি!

—ভালই বলছি। বিরোধের তো এইখানেই শেষ নয়, ধরুন জজ-আদালতেও যদি এই সাজাই বাহাল থাকে, তবে ওঁরা হাইকোর্টে যাবেন। তারপর ধরুন, নতুন বিরোধও বাধতে পারে। ওঁদের তো পয়সার অভাব নেই। লোকে বলে, কঙ্কণায় লক্ষ্মী বাঁধা আছেন।

হুটুবাবু বলিলেন, বিরোধ তো আমার ওই লক্ষ্মীর সঙ্গে। ওই দেবতাটির অভ্যাস হ'ল লোকের মাথার ওপর পা দিয়ে চলা। তাঁর পা দুটি আমি মাটির ধূলোয় নামিয়ে দেব।

মুন্সেফবাবু বলিলেন, ছি ছি, কি যে বলেন আপনি হুটুবাবু!

হুটুবাবু উত্তর দিলেন, ঠিকই বলি আমি মুন্সেফবাবু, কিন্তু আপনার ভাল লাগছে না।

তারপর হাসিয়া আবার বলিলেন, না লাগবারই কথা। লক্ষ্মীর পা যে আপনার মাথায় চেপেছে; পায়ের পথ তো সঙ্কীর্ণ, রথ চলবার মত রাজপথ তৈরি হয়ে গিয়েছে। টাকটি আপনার বেশ প্রশস্ত।

মুন্সেফবাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, কথাটা বলেছেন বড় ভাল। উঃ, বড্ড বলেছেন মশাই!

তারপর কিন্তু আর ও প্রসঙ্গে তিনি কোন কথা বলিলেন না। হাস্য-পরিহাসের মধ্যে সন্ধ্যাটা কাটিয়া গেল।

কিন্তু লক্ষ্মীর পরাজয় এত সহজে হয় না, জজ-আদালতের আপীলে মামলাটা ডিসমিস হইয়া গেল। হুটুবাবু মুখ রাঙা করিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সত্যের অপমানে পরাজয়ে ক্ষোভ ও লজ্জার তাঁহার আর সীমা ছিল না। কিন্তু বিস্মিত তিনি হন নাই। জজ-আদালতের উকিলের সওয়াল শুনিয়াই তিনি এ পরিণতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সদর হইতে রামপুরে ফিরিয়া বাসায় আসিয়া সন্ধ্যায় নিয়মিত সন্ধ্যা-উপাসনায় বসিয়াছেন, এমন সময় বাড়ির বাহিরে বোধ করি খান-দশেক ঢাক একসঙ্গে তুমুল শব্দে বাজিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই তাঁহার স্ত্রী বিস্ময়বিহ্বলের মত আসিয়া বলিল, ওগো, কঙ্কণার বাবুরা দোরের সামনে ঢাক বাজাতে হুকুম দিয়েছে! ধেইধেই ক'রে নাচছে গো সব! হুটুবাবু কিছুমাত্র চাঞ্চল্য

প্রকাশ করিলেন না, যেমন ধ্যানে বসিয়া ছিলেন, তেমনই ভাবে বসিয়া রহিলেন।

মাসখানেক পর কঙ্কণার বাবুদের বাড়িতে আবার একটা সমারোহ হইয়া গেল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন করিলে পাণ্ডবেরা সমারোহ করেন নাই, কিন্তু হুটু মোক্তার পরাজয়ের লজ্জায় মোক্তারি পর্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় পলাইয়া গেলে কঙ্কণার বাবুরা বেশ একটি সমারোহ করিলেন। সেই সমারোহের মধ্যে তাঁহারা ঘোষণা করিলেন, বেটাকে ঢাক বাজিয়ে মোক্তারি ছাড়ালাম, এইবার টিন বাজিয়ে গাঁ থেকে তাড়াতে হবে।

বড়কর্তা বলিলেন, তার আগে ওই বেটা মহাভারতকে শেষ কর, আঠারো পর্বের এক পর্বও যেন বেটার না থাকে।

বৎসর তিনেকের মধ্যেই কঙ্কণার বাবুদের সে প্রতিজ্ঞাও প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল। মহাভারত সর্বস্বান্ত হইয়া মনে মনে নিষ্কৃতির একটা সহজ উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য গোঁয়ার মহাভারত, কিছুতেই বাবুদের পায়ে গড়াইয়া পড়িল না। হুটু মোক্তার সেই দেশ ছাড়িয়াছেন, আজও ফেরেন নাই। স্ত্রী আছে তাহার পিত্রালয়ে।

সেদিন জমিদারের হিতৈষী গ্রাম্য মণ্ডল আসিয়া মহাভারতকে বলিল, ওরে, বাবুদের পায়ে গিয়ে গড়িয়ে পড়্। জলে বাস ক'রে কি কুমিরের সঙ্গে বাদ করা চলে?

ছন্নমতি মহাভারত উত্তর দিল, কুমিরে বাদ করলেও খায়, না করলেও খায়। তার চেয়ে বাদ ক'রে মরাই ভাল।

মণ্ডল বিরক্ত হইয়া বলিল, অলক্ষ্মী ঘাড়ে ভর করলে মানুষের এমনই মতিই হয় কিনা!

মহাভারত বলিল, অলক্ষ্মীই আমার ভাল দাদা, উনি কাউকে ছেড়ে যান না।

মণ্ডল অবাক হইয়া গেল, অবশেষে বলিল, তোর দোষ কি বল্? নইলে ব্রাহ্মণ জমিদার—

মহাভারত অকস্মাৎ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া হাত-পা নাড়িয়া ভঙ্গী করিয়া বলিল, চণ্ডাল কসাই, চণ্ডাল কসাই!

দুই দিন পরই মহাভারতের ঘরের জীর্ণ চালে আগুন জলিয়া উঠিল।

নারী ও বালকের আর্ত চীৎকারে লোকজন আসিয়া দেখিল, মহাভারতের ঘর জলিতেছে, কিন্তু মহাভারতের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, সে একজন দীর্ঘকায় কালো জোয়ানের বুকে নির্মমভাবে চাপিয়া বসিয়া আছে। বহু কষ্টে লোকটাকেই সর্বাগ্রে মহাভারতের কবলমুক্ত করা হইল। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল, জল!

মহাভারত লাফ দিয়া গিয়া জলন্ত চালের একগোছা খড় টানিয়া আনিয়া বলিল, খা।

ওই লোকটাই মহাভারতের ঘরে আগুন দিয়াছে, লোকটা কঙ্কণার বাবুদের চাপরাসী। মহাভারত তাহাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করিল। পরদিন সে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে দগ্ধ গৃহের অঙ্গার লইয়া তামাক সাজিয়া পরম তৃপ্তি সহকারে তামাক টানিতেছিল, এমন সময় কে তাহাকে ডাকিল, মহাভারত!

মহাভারত বাহিরে আসিয়া দেখিল, জমিদারের গোমস্তা দাঁড়াইয়া আছে। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, মিটমাট আমি করব না হে। কি করতে এসেছ তুমি?

গোমস্তা হাসিয়া বলিল, আরে শোন, শোন।

কোন কিছু না শুনিয়াই তাহার মুখের কাছে দুই হাতের বুড়া আঙুল ঘন ঘন নাড়িয়া মহাভারত বলিল, খট খট লবডঙ্কা, খট খট লবডঙ্কা, আর আমার করবি কি?

গোমস্তা মুখ লাল করিরা ফিরিয়া গেল, যাইবার সময় কিন্তু বলিয়া গেল, জানিস বেটা চাষা, পৃথিবীটা কার বশ?

দিন দুয়েক পরেই রামপুর হইতে ঘুটুবাবুর পুরাতন মুহুরীটি আসিয়া মহাভারতকে লইয়া চলিয়া গেল।

সেই দিনই দ্বিপ্রহরে রামপুরের ফৌজদারী আদালতে মহাভারতকে সঙ্গে লইয়া ঘুটুবাবু উকিলের গাউন পরিয়া আদালতে প্রথম প্রবেশ করিলেন। তিনি উকিল হইয়া ফিরিয়াছেন। তিনি এতদিন কলিকাতায় আইন পড়িতেছিলেন।

এবার কঙ্কণার বাবুরা বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ঘুটুবাবুর তদ্বিরে তদারকে স্বয়ং এস. ডি. ও. ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত কঙ্কণার বাবুদের নায়েব-গোমস্তাকে পর্যন্ত আসামী-শ্রেণীভুক্ত করিয়া মামলাটা দায়রা আদালতে বিচারার্থ পাঠাইয়া দিলেন। ঘুটুবাবু নিজেও সদরে

গিয়া বসিলেন, শুধু বসিলেন নয়, সরকারী উকিলের সহযোগে নিজেই মামলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই নানা জনে বহু বিনীত অনুরোধ এবং বহু প্রকার লোভনীয় প্রস্তাব লইয়া হুটুবাবুকে আসিয়া ধরিয়া বলিল, মিটিয়ে ফেলুন, তাতে আপনারই মর্যাদা বাড়বে।

হুটুবাবু বলিলেন, বড়লোকের সঙ্গে গরিবের ঝগড়া কি আপোসে মেটে? কোন কালে মেটে নি, মিটবেও না।

শেষ পর্যন্ত বলিলেন, বাবুরা যদি ঢাক কাঁধে ক'রে আদালতের সামনে বাজাতে পারে, কি মহাভারতের ঘরের চালে উঠে নিজেরা চাল ছাওয়াতে পারে, তবে না হয় দেখি।

প্রস্তাবকারীরা মুখ কালো করিয়া উঠিয়া গেল, বিচার চলিতে লাগিল। সাক্ষী-সাবুদ শেষ হইয়া গেলে সরকারী উকিলের সম্মতিক্রমে হুটুবাবু প্রথমে সওয়াল আরম্ভ করিলেন। সে যেন অকস্মাৎ আগ্নেয়গিরির মুখ খুলিয়া গেল। গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ প্রদীপ্ত ভাষায় সমগ্র ঘটনা যেন চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল, প্রবলের অত্যাচারে দুর্বলের হাহাকার যেন রূপ পরিগ্রহ করিল। বিবাদের মূলসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই অগ্নিদাহ পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনা সাক্ষী-দের উক্তির সহিত মিলাইয়া দেখাইয়া অবশেষে বলিলেন, আজ সমস্ত পৃথিবীময় ধনের মত্ততায় মত্ত ধনীর অত্যাচারে পৃথিবী জর্জরিত হয়ে উঠেছে। এই বিচারাধীন ঘটনাটি তার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় যে, ধনীর অপরাধে ধনীর অনুগ্রহপুষ্ট দুর্বলের ওপর দণ্ডবিধান করা ছাড়া আজ ধর্মাধিকরণের গত্যন্তর নাই। কিন্তু সে বিচার একজন করবেন—যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বত্রবিরাজমান, সর্বনিয়ন্তা—তিনি এর বিচার অবশ্যই করবেন। সে বিচারের রায়ের সামান্য একটু অংশ আমরা জানি, ঈশ্বরের পুত্র মহামানব যীশুখ্রীষ্ট জানিয়ে দিয়ে গেছেন; তিনি বলেছেন, "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the Kingdom of God." (ধনীর স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অপেক্ষা সূচীমুখে উটের প্রবেশও সহজ।)

তাঁহার সওয়ালের পর সরকারী উকিল আর কিছু বলিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। বিচারে অপরাধীদের কঠিন দণ্ড হইয়া গেল। বিচারশেষে হুটুবাবু বাহিরে আসিতেই তাঁহার মুহুরী বলিল, তিনটে মামলার কাগজ নিয়ে মক্কেল ব'সে আছে।

হুটুবাবুর মাথায় তখনও ওই মকদ্দমার কথাই ঘুরিতেছিল, তিনি ললাট কুঞ্চিত করিয়া মুহুরীর দিকে চাহিলেন।

সে বলিল, একটা দায়রা, আর ছটো এস. ডি ও.-র কোর্টের মামলা, ফী বলেছি চার টাকা ক'রে।

পিছন হইতে একজন পুরাতন মোক্তার-বন্ধু আসিয়া অভিনন্দন জানাইয়া বলিল, চমৎকার আর্‌গুমেণ্ট হয়েছে! এবার কিন্তু ছেঁড়া জুতো-জামা পাণ্টাও ভাই। আমার হাতে একটা কেস আছে, তোমাকেই ওকালত-নামা দেব। মক্কেল কিন্তু গরিব।

হুটুবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, পাঠিয়ে দিও। পয়সার জন্যে কিছু এসে যাবে না।

বিচিত্র পৃথিবী, কিন্তু সে বৈচিত্র্য অপেক্ষাও পৃথিবীর বুকের ঘটনাপ্রবাহের ধারা বিচিত্রতর এবং বিস্ময়কর। সেই বিচিত্র ধারার গতিতেই কঙ্কণার বাবুদের সহিত হুটুবাবুর বিরোধ অকস্মাৎ একটা অসম্ভব পরিণতিতে আসিয়া শেষ হইয়া গেল।

পনরো বৎসর পর। সেদিন হঠাৎ কঙ্কণার বাবুদের জুড়িটা আসিয়া হুটুবাবুর বাড়িতে প্রবেশ করিয়া গাড়িবারান্দায় দাঁড়াইল। ভিতর হইতে নামিলেন কঙ্কণার বৃদ্ধ বড়কর্তা, তাঁহার পুত্র এবং সেজো তরফের কর্তা। হুটুবাবুর দারোয়ান কায়দা-মাফিক সেলাম করিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে দুইজন খানসামা আসিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া ঝাড়ন দিয়া আসন-গুলি ঝাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ কর্তা ঘরের চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, তাই তো হে, হুটু যে আমাদের ইন্দ্রপুরী বানিয়ে ফেলেছে, অ্যাঁ! বাঃ বাঃ বাঃ, বলিহারি, বলিহারি!

কর্তার পুত্র একজন খানসামাকে বলিলেন, একবার উকিলবাবুকে খবর দাও দেখি, বল কঙ্কণার বড়কর্তা সেজোকর্তা এসেছেন।

হুটুবাবু বিস্মিত হইলেন, এবং অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া নিচে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, আসুন, আসুন, আসুন। মহাভাগ্য আমার আজ!

বড়কর্তা বলিলেন, সে তো না বলতেই এসেছি হে, এখন বসতে দেবে কি না বল, না তাড়িয়ে দেবে?

হুটুবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, দেখুন দেখি, তাই কি আমি পারি, না কোন মানুষে পারে?

বড়কর্তা মুচকি হাসিয়া বলিলেন, আজ তোমার সঙ্গে সওয়াল করব, দাঁড়াও। দেশের মধ্যে তো তুমি এখন সবচেয়ে বড় উকিল, এ-জেলা ও-জেলা থেকেও তোমাকে নিয়ে যায়। দেখি কে হারে!

হুটুবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, বেশ, এখন বসুন।

বড়কর্তা বলিলেন, ধর, তোমার বাড়ি ভিখারী এসেছে, তাকে বসতে ব'লে আর কি আপ্যায়িত করবে, যদি ভিক্ষেই তাকে না দাও!

হুটুবাবু জোড়হাত করিয়া বলিলেন, আমার কাছে আপনারা ভিক্ষে চাইবেন, এ যে বড় অসম্ভব কথা, আশঙ্কার কথা! এ যে বলির দ্বারে বামনের ভিক্ষে চাওয়া! বেশ, আগে বসুন।

বড়কর্তা বার বার ঘাড় নাড়িয়া বলিলে, উঁহু। আগে তুমি বল যে দেবে, তবে বসি, নইলে যাই।

হুটুবাবু বলিলেন, বেশ, বলুন, সাধ্যের মধ্যে যদি হয়, তবে দেব আমি।

বড়কর্তা বলিলেন, তোমার ছেলেটিকে আমায় ভিক্ষে দিতে হবে, আমার নাতনীটিকে তোমায় আশ্রয় দিতে হবে।

তাঁহার পুত্র আসিয়া হুটুবাবুর হাত দুইটি চাপিয়া ধরিল, হুটুবাবু বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সেজোকর্তা বলিলেন, তোমার ছেলে খুব ভাল, বি. এ-তে এম. এ.-তে ফার্স্ট হয়েছে; তুমিও এখন মস্ত ধনী, বড় বড় জায়গা থেকে তোমার ছেলের সম্বন্ধ আসছে, সবই ঠিক। কিন্তু কঙ্কণার মুখুজ্জেদের বাড়ির মেয়ে ধনে কুলে মানে অযোগ্য হবে না। রূপের কথা বলব না, সে তুমি নিজে দেখবে।

হুটুবাবু বড়কর্তার এবং সেজোকর্তার পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন, আপনাদের নাতনী আমার বাড়ি আসবে, সত্যিই সে আমার সৌভাগ্য।

সমারোহের মধ্যেই যে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল, সমারোহের মধ্যেই তাহার অবসান হইয়া গেল।

বিবাহ শেষ হইয়া গেল।

অনুষ্ঠান শেষ হইলেও উৎসবের শেষ তখনও হয় নাই। সমাগত আত্মীয়-স্বজনদের সকলে এখনও বিদায় লয় নাই। কয়েকটি হাভাতে অতিলোভী আত্মীয় বিদায় লইবে বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদের ছেলেগুলার জ্বালায় ছবি, ফুলদানিগুলি ভাঙিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

হুটুবাবু প্রাতঃকালে একখানা ইজি-চেয়ারে শুইয়া তামাক টানিতে টানিতে

ওই কথাই ভাবিতেছিলেন। নিয়মের ব্যতিক্রমে, অপরিমিত পরিশ্রমে শরীর তাঁহার অসুস্থ, বেশ একটু জ্বরও যেন হইয়াছে। চাকরটা আসিয়া সংবাদ দিল, তাঁহার ফাউন্টেন পেনটা পাওয়া যাইতেছে না। হুটুবাবুর রক্ত যেন মাথায় চড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহিণীকে ডাকিতে বলিলেন। গৃহিণী আসিতেই তিনি বলিলেন, রতনপুরের কালীর মাকে, পারুলের শ্যামা-ঠাকরুনকে আজই বাড়ি যেতে ব'লে দাও।

সবিস্ময়ে গৃহিণী বলিল, তাই কি হয়? নিজে থেকে না গেলে কি যেতে বলা যায়? আপনার লোক।

হুটুবাবু বলিলেন, আপনার জনের হাত থেকে আমি নিস্তার পেতে চাই বাপু, দোহাই তোমার, বিদেয় কর ওদের। বরং কিছু দিয়ে-থুয়ে দাও, চ'লে যাক ওরা, নইলে ঘরদোর পর্যন্ত ভেঙে চুরমার ক'রে দেবে।

গৃহিণী একটু বিব্রতভাবেই অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। হুটুবাবু ক্লান্তভাবেই চেয়ারে শুইয়া, বোধ করি, পরিত্রাণেরই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মুহুরী আসিয়া রায়ের নথি সম্মুখে টেবিলটার উপর নামাইয়া দিয়া বলিল, রায়ের নকলটা কাল চেয়েছিলেন। কিন্তু বাজে খরচ কিছু বেশি হয়ে গেল।

হুটুবাবু সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। একটা দায়রা মকদ্দমার রায়ের নকল। মকদ্দমাটায় হুটুবাবুর অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজয় ঘটিয়াছে। তাঁহার কয়েকটি সূক্ষ্ম যুক্তি বিচারক অন্যায়ভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি রায়খানা তুলিয়া লইলেন। মুহুরীটি চলিয়া গেল। রায়খানা পড়িতে পড়িতে হুটুবাবুর মুখ-চোখ রাঙা হইয়া উঠিল। বিচারকের মন্তব্য এবং বিচার-পদ্ধতির বক্র গতি দেখিয়া তাঁহার ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। দারুণ উত্তেজনাবশে রায়খানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি আরম্ভ করিলেন। উপরে ঘরটাতেই দুমদাম হুটপাট শব্দে ওই আত্মীয়দের ছেলেগুলি যেন মগের উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। হুটুবাবু অত্যন্ত বিরক্তিভরে উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ভগবান, রক্ষে কর! চাকরটা ঘরের মধ্যে আসিয়া কতকগুলা চিঠি টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। চিঠিগুলা দেখিতে দেখিতে একখানা অতি পরিচিত হাতের লেখা খাম দেখিয়া সাগ্রহে খুলিয়া ফেলিলেন। হাঁ, পুরাতন বন্ধু সেই বৃদ্ধ মুন্সেফবাবুরই চিঠি। এই বিবাহে আসিতে অক্ষমতার জন্য ক্ষমা চাহিয়া তিনি লিখিয়াছেন:

"যাবার বাত্তিক অসম্ভবরূপে প্রবল হ'লেও বাতের সঙ্গে যুঝে উঠতে পারলাম না, পরাজয় মানতে হ'ল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই আপনার ছেলে ও বউমাকে আশীর্বাদ করছি। ডাকযোগে আশীর্বাদীও কিছু পাঠালাম, গ্রহণ করবেন।"

পরিশেষে লিখিয়াছেন :

"আজ একটা কথা বলব, রাগ করবেন না। একদিন আপনি বলেছিলেন, মা-লক্ষ্মীর অভ্যেস হ'ল লোকের মাথার ওপর দিয়ে পথ ক'রে চলা। তাঁর চরণ দুখানি আপনি পথের ধূলোয় নামাব বলেছিলেন। কিন্তু টেনে টেনে নিজের মাথাতেই চাপালেন যে! লজ্জা পাবেন না, চরণ দুখানি এমনই লোভনীয়ই বটে, মাথায় না ধ'রে পারা যায় না। মাথায় কি দেবীর রজত-রথের উপযোগী রাজপথ তৈরি হয়েছে, বলি—টাক পড়েছে, টাক?

চিঠিখানার কথাগুলি যেন তীরের মত তাঁহার মস্তিষ্কে গিয়া বিঁধিল। উত্তেজিত অসুস্থ মনের মধ্যে অকস্মাৎ একটি অদ্ভুত মুহূর্ত আসিয়া গেল। সমগ্র জীবনটা এই মুহূর্তের মধ্যে ছায়াছবির মত তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল। এই ঘর এই ঐশ্বর্য সমস্ত যেন কুৎসিত ব্যঙ্গে হি-হি করিয়া হাসিতেছে। আবার মনে হইল, ঘরের দেওয়ালে ঝুলানো ছবিগুলির মধ্যে সমস্তগুলিতেই মুন্সেফবাবুর ব্যঙ্গহাস্যবক্র মুখ ভাসিয়া উঠিয়াছে। রতনপুরের কালীর মা, পারুলের শ্যামা-ঠাকরুন উপরতলায় বিজয়োল্লাসে কী তাণ্ডব-নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে!

তিনি থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে একখানা আসনে বসিয়া পড়িলেন। মহাভারত আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, আজ্ঞে, পারুলের শ্যামা-ঠাকরুন বাড়ি যাচ্ছেন, আমিও যাই ওই সঙ্গে।

হুটুবাবু কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, তাঁহার শ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার দরজাটা খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু কই, দরজা কই?

সন্ধ্যামণি

হিন্দু আমলের অক্ষয়পুণ্য-মহিমান্বিত একটি স্নানঘাট। গঙ্গা এখানে দক্ষিণ-বাহিনী। রাঢ়ের বিখ্যাত বাদশাহী শড়কটা বরাবর পূর্বমুখে আসিয়া এই ঘাটেই শেষ হইয়াছে।

শড়কটির দুই পাশে ঘাটের ঠিক উপরেই ছোট্ট একটি বাজার। বাজার মানে খান কুড়ি-বাইশ দোকান—খান কয় মিষ্টির, দু'খানা মুদীর, ছ'সাতখানা কুমোরের—মণিহারী, পানবিড়ি ত' আছেই। ঘাটের একেবারে উপরে জন-দুই গঙ্গাফল, অর্থাৎ কলা ও ডাব বিক্রয় করে।

বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পুণ্যকামী তীর্থযাত্রীর সমাগমে ছোট বাজারটিতে তিলধারণেরও স্থান থাকে না। চীৎকারে, গুঞ্জনে সারা বাজারটা গম গম্ করে, যেন একটা মেলা। অস্তায়মান সূর্যের সঙ্গে যাত্রীরা যে যাহার পথে চলিয়া যায়। অন্ধকার জনহীন বাজার খাঁ-খাঁ করে। তখন দু'দশ জন আগন্তুক যাহারা আছে—তাহারা শ্রান্ত শব-বাহকের দল। শব সংকার করিয়া ভাগ্যহীনেরা ভাড়াটে ঘরের বারান্দায় আসিয়া দেহ এলাইয়া দেয়। ক্লান্তিতে, শোকে কেহ বা ঘুমায়, কেহ বা নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শোয়, ফোঁটাকয় জলও কাহারও চোখ হইতে হয়তো গড়াইয়া পড়ে। আকস্মিক দুই চারিটা কথা মাঝে মাঝে উঠিয়া পড়ে, মৃত কিংবা মৃত্যুকে লইয়া। ঠিক যেন জলবুদ্বুদের মত, দুই-চারিটা পর পর উঠে, মিলাইয়া যায়, আবার নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতা থম্ থম করে।

মোটকথা বাজারের কোলাহল তাহারা বাড়ায় না।

তখন যা-কিছু সাড়া, যা-কিছু চাঞ্চল্য, সে শুধু দোকান কয়টির। দোকানীরা আপন আপন দোকানে বসিয়া সমস্ত দিনের লাভ-লোকসান কষে, মুখে হাসি-গল্প চলে, হাতে কাজ করিয়া যায়।

শেষ কার্তিকের একটি শীতকাতর সন্ধ্যা।

বিড়ির দোকানদার ছকু বিড়ি পাকাইতেছে। কোথাকার মেলাফেরৎ কালীচরণ আপন দোকান সাজাইতে ব্যস্ত। পাশে কুমোর বুড়ো কি একটা গড়িতেছিল, হাতে ময়দার মত মাটির নেচী। নেচী হইয়া উঠিল ডমরু। নিপুণ

আঙুলের চাপে দেখিতে দেখিতে সেই ডম্বরুটির প্রান্তে গড়িয়া তুলিল দুটি কান, মধ্যে লম্বা চেপ্টা মুখ, পিছনে বাঁকানো লেজ, নিচের দিকে চারিটি পা। সমস্ত মিলিয়া হইয়া উঠিল একটি ঘোড়া। পাশের লম্বা পিঁড়িখানার উপ একটির পর একটি করিয়া পক্ষিরাজের বাহিনী সাজাইয়া তোলা হইতেছিল।

কুমোর বুড়োর দোকানের সম্মুখেই রাস্তার ওপর বামুনদের মেয়ে কুসুমের ঘর। আপন চালাঘরের বারান্দায় হ্যারিকেনের আলোয় মাদুর বুনিতে বুনিতে কুসুম গল্প করিতেছিল কুমোর বুড়োর সঙ্গে। মেয়েটি অল্পবয়সী, বেশ শ্রীমতী, কিন্তু ভাগ্য বড় মন্দ। তিনকুলে কেহ নাই, বাউণ্ডুলে স্বামী। মাদুর বোনাই বেচারীর জীবিকা। রোজই এমন গল্প চলে—সুখদুঃখের কথা, হাসির কথাও দুই চারিটা হয়। এক একদিন কুমোর বুড়ো উপকথা বলে, কুসুম কাজ করিতে করিতে হুঁ-হাঁ করিয়া যায়। কুমোর বুড়ো থামিলে বলে—তারপর ?

পাল বলে—তারপর বুড়ো কর্তার ব'কে ব'কে গলা শুকোয়, তার তামাক খেতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু নাতনীর তা' সহ্য হয় না।

নাতনী কৌতুকে হাসিয়া উঠে।

ও-পাশে মুদীর দোকানে একটা 'দাবা' টাকা লইয়া সেদিন বাজনা পরীক্ষা চলিতেছিল। খরিদ্দারের ভিড়ে কে কখন ঠকাইয়া গিয়াছে। পাশের দোকানীরা কেহ বলিতেছিল চলিবে, কেহ বলিতেছিল, না। মুদী বারবার টাকাটা সজোরে আছড়াইয়া আওয়াজ বাড়াইতে চাহিতেছিল, কিন্তু সেটা ঠন্ করিয়া সাড়া আর দেয় না।

পাশের দোকানী বিড়িওয়ালা ছকুর বাবা দ্বিজদাস কহিল—ঠ্যাঙালে চীৎকার বেরোয়, সুর বের হয় না ভাই ; ও তুমি গঙ্গার নামে খরচ লিখে হাত ধুয়ে ব'সো।

দ্বিজদাসের কথাটা মুদীর ভাল লাগিল না। সে আপন মনেই গালি দিল বঞ্চককে—কোন্ শালা গঙ্গাতীরে এমন বঞ্চনা ক'রে গেল বল দেখি পুণ্যি করতে এসে ?—

রসান দিয়া দ্বিজদাস কহিল—ফল হাতে হাতে পেয়েছে সে, টাকার বোল আনাই তার লাভ।

ওদিকে কান দিতে গেলে দুঃখের বোঝা ভারী হয়। মুদী শাপ-শাপান্ত করিয়া আত্মপ্রবোধ দিল,—যা—যা গঙ্গাতীরে বঞ্চনা যেমন করলি, তেমনি নরকে যাবি, নরক হবে তোর। আমার না হয় ষোল আনাই গেল।

আবার ক্ষণপরে কহিল—তা' বারো আনায় চলে যাবে, রানীমার্কা বটে, কি বল দাস ?

দাস নীরবে হাসিল, সেদিন তারও ঠিক এমনি হইয়াছিল।

সম্মুখে মেঘলা আকাশের বুক হইতে মাটির কোল পর্যন্ত অখণ্ড নিবিড় অন্ধকার। নিম্নে আপনার গর্ভে মৃদুস্বরা গঙ্গা রূপার পাতের মত চক্‌চক্ করিতেছে। ঘাটের উপরেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটার কোনও কোটরে বসিয়া একটা পেঁচা চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। তার তীক্ষ্ণ কর্কশ রবে সর্বাঙ্গ শির্‌শির্ করে।

গঙ্গার মৃদুধ্বনি ছাপাইয়া কখনও কখনও দাঁড় ছপ্ ছপ্ করিয়া নৌকা চলে কাটোয়ার বাজারের দিকে। নৌকার সঙ্গে চলে তার বুকের ক্ষীণ আলোক, গঙ্গার বুকে চলে তার তরঙ্গকম্পিত প্রতিবিম্ব। দূর শ্মশানঘাটে রোল শোনা যায়,—বল হরি, হরি বো—ল !

মুদী কহিল—আর এক নম্বর এল, দাস।

দাস গম্ভীরমুখে কহিল—খাতাটা কই রে ছকু ?

ছকু খাতাখানা বাপের হাতে দিল। খাতা লইয়া দাস শ্মশানের দিকে চলিয়া গেল।

শ্মশান-ঘাট এবার দ্বিজদাস ডাকিয়া লইয়াছে। জমিদারকে বার্ষিক জমা দিতে হইবে এগারশো টাকা—সে নিজে আদায় করে প্রতি শবে শ্মশান-জমা দু'টাকা এক আনা।

মুদী কহিল—তোদের কপাল ভাল রে ছকু। এবার আসছে খুব।

কথাটা ছকুর তত ভাল লাগিল না, সে উত্তর দিল না, বিড়ির তাড়াগুলা লইয়া অকারণে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

ওপাশে কুমোর বুড়ো ঘোড়ার লেজ বাঁকাইয়া দিতে দিতে বলিতেছিল—আজকাল সবই উল্টো হয়েছে গো, আজকাল হয়েছে কি জান—

নাই ধন যার হরষ বদন সুখে নিদ্দে যাচ্ছে।
আছে ধন যার বিরস বদন ভাবনায় শির কাটুছে।

গল্প হইতেছিল ডাকাতির।

টানার সুতার ফাঁকে ফাঁকে মাকুয়ের পাতি সুকৌশলে পরাইতে পরাইতে কুসুম হাসিয়া কহিল—তা হ'লে পালকর্তা, বল রাত্রে ঘুমোও না।

পাল-কর্তা কোন উত্তর দিবার আগেই ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলটা গায়ে

জড়াইয়া হঠাৎ কেনারাম চাটুজ্জে পিছনের অন্ধকার হইতে দোকানের আলোর সম্মুখে যেন উদয় হইয়াই কহিল—কি রে, কার ঘুম হয় না রে বাপু ?

পাল কহিল—নাতজামাই যে! এসো, এসো। কবে এলে ?

কুসুম অবগুণ্ঠনটা বাড়াইয়া দিল। কেনারামই কুসুমের স্বামী।

গ্রামে গ্রামেই বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু কেনারাম কাহারও কড়ি ধারে না, বন্ধনহীন মুক্ত পুরুষ সে। মাও নাই, বাপও নাই। বন্ধনের মধ্যে ওই কুসুম, সে বাঁধনও কেনারাম ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। আগে তবু ঘরে থাকিত, তখন সত্যকার একটি বন্ধন ছিল—তিন-চার বছরের কন্যা সন্ধ্যামণি। মাস তিনেক হইল মেয়েটির মৃত্যুর পর সে সব ছাড়িয়াছে। এ-পাড়ায় বড় একটা আসেও না, কুসুমকে একটা কথাও বলে না। কোথায় যায়—দশদিন বিশদিন কোথায় থাকে, আবার একদিন আসে।

পাল-কর্তার সাদর অভ্যর্থনায় চাটুজ্জে কান দিল না—কার ঘুম হয় না সে লইয়াও মাথা ঘামাইল না। ওদিকে কালীর দোকানে তখন তাহার নজর পড়িয়াছে, কালীকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল—আরে কালী যে! তুই কবে ফিরলি মেলা থেকে, এঁ্যা ?

দু'পা আগাইয়া কালীর দোকানে চাপিয়া বসিয়া আবার কালীকে প্রশ্ন করিল—তারপর মেলা কেমন দেখলি বল্ দেখি ? কই, বিড়ি দে রে বাপু।

সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সে বিড়ি দেশলাই টানিয়া লইল।

কালী সংক্ষেপে কহিল—বেশ মেলা, খুব ভিড়, বেচা-কেনাও বেশ!

ঠাকুর তখন সন্থ বিড়িটা ধরাইয়াছে, মুখে তার একরাশ ধোঁয়া। কেরোসিনের টবের আলমারীতে খালি সিগারেটের বাক্স সাজাইতে সাজাইতে কালী কহিল—এবার ওখানে মেলাতে বেশ্তে বসতে দিলে না, দাদাঠাকুর! তুলে দিলে সব।

চাটুজ্জের মুখের ধোঁয়াটা অকস্মাৎ হস্ করিয়া বাহির হইয়া গেল, সে কহিল —সে কি রে—কে তুলে দিলে ?

—গবরমেণ্টার হ'তে সাহেব এসেছিল যে। দারোগা পুলিশ চব্বিশ ঘণ্টা মোতায়েন সব। তারাই দিলে। উঃ—দারোগাটা কি সাংঘাতিক মোটা, মাইরি! ঠিক যেন গঙ্গার শুশুক, বুঝলি ছকু ?

কেনারাম নীরবে কি যেন ভাবিতেছিল, হঠাৎ কহিল—বসতে দিলে না ?—কি হ'ল তাদের, কালী ?

ওপাশে পালের গলা শোনা গেল,—উঠলে যে ভাই নাতনী, এত সকালেই ?

কুসুমের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

ঠিক এই সময়টিতে সমস্ত বাজারটা হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। এমন হয়, বহু লোক, বহু কোলাহলের মধ্যেও এমন এক একটি আকস্মিক নিস্তব্ধ মুহূর্ত আসিয়া যায়।

চাটুজ্জেই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিল—তারা খুব গরিব, নয় রে কালী ?

নতমুখে কালী কহিল—খু—ব।

ও পাশ হইতে ছকু ডাকিল—যাত্রা করতে হবে চাটুজ্জেমশায়—আমরা যাত্রার দল খুলছি।

চাটুজ্জে সাড়া দিল না।

ছকু আবার ডাকিল—শুন্‌চেন দাদাঠাকুর ?

বিরক্ত হইয়া চাটুজ্জে গঙ্গার ঘাটে অন্ধকারে গিয়া দাঁড়াইল।

কালী হাসিয়া কহিল—মেয়েগুলোর ভাবনা ভাবতে বসেছে।

একটা ইঙ্গিত করিয়া ছকু কহিল—এদিকে নিজের পরিবারের ভাবনা কে ভাবে তার ঠিক নাই!

মৃদুস্বরে কালী কহিল—কেন, পাল-কত্তা!

দু'জনেই হাসিয়া উঠিল।

চাটুজ্জে কিন্তু আবার তখনই ফিরিল। গালে হাত দিয়া বসিয়া মহা দুশ্চিন্তার সহিত সে কহিল—মেয়েগুলোর শেষ পর্যন্ত কি হ'ল কালী ?

—আর দাদা, সেইখানে সব না খেয়ে শুকিয়ে বেচারীরা—

বাধা দিয়া ছকু কহিল—না দাদাঠাকুর, ও ফাজিলটার কথা শোনেন কেন। তাদের সব ভাড়া দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে।

চাটুজ্জে মহাখুশি। কহিল—না, সে বেশ হয়েছে, এ খুব ভাল বন্দোবস্ত হয়েছে। সায়েবের মাথা রে বাপ্‌! তারপর একগাল হাসিয়া বলিল—তুই কি যেন বলছিলি ছকু ?

—আমরা যাত্রার দল খুলছি। হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান-মিলন পালা হবে, তোমাকে কিন্তু হরিশ্চন্দ্র সাজতে হবে।

অমনি গায়ের কাপড়টা কোমরে জড়াইয়া লইয়া চাটুজ্জে কহিল—হরিশ্চন্দ্র

তো আমি সেজেই আছি রে, দেখবি!—'শৈব্যা শৈব্যা, রোহিতাশ্ব রোহিতাশ্ব!' কিন্তু খালি গায়ে যে শীত করছে রে!

—হ্যাঁ, বামুনের আবার শীত, বলে যার মুখের ফুঁয়ে আগুন! কিন্তু ও বক্তৃতায় তো হবে না দাদাঠাকুর, বই থেকে বক্তৃতা করতে হবে। এই দেখ বই কিনেছি।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাটুজ্জে ছকুর মুখের দিকে একবার চাহিল। তারপর অল্প একটু হাসির সহিত কহিল—সত্যি বলছিস্ ছকু?

—করে তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছি, বল তো?

—দে, তবে বই দে তোর। কি বক্তৃতা করতে হবে দেখি।

ছকু তাহাকে বইখানা আগাইয়া দিল। চাটুজ্জে বই লইয়া সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা জুড়িয়া দিল—"রানী, রানী, তুমি যে কখনও কোমল শয্যা ভিন্ন শয়ন করনি, ও-হো-হো। বাপ রোহিতাশ্ব রে, সোনার পুতুল আমার—(রোহিতাশ্বের গলা জড়াইয়া ধরিলেন)।"

ও পাশে কালী ভ্যাঙচাইয়া উঠিল—বাপ যুধিষ্ঠির রে, (হনুমান কলা খাইতে লাগিলেন)।

এ পরিহাস চাটুজ্জে বুঝিল। বইখানা ছকুর দোকানে ফেলিয়া দিয়া সরোষে সে কহিল,—দেখ কেলে, তোর না হয় পয়সাই হয়েছে; তাই ব'লে লঘু-গুরু মানামানি নাই তোর?

কালী দমিল না, সে অঙ্গভঙ্গী করিয়া কহিল—ওয়ান্ মর্ণ আই মেট্ এ লেম্ ম্যান্ ইন্ এ লেন্ কোলোজ টু মাই ফার্‌ম।

ইংরেজীর কথা উঠিলেই চাটুজ্জে সদম্ভে এই লাইন ক'টি ঝর্ ঝর্ করিয়া আবৃত্তি করিয়া থাকে।

চাটুজ্জে আগুন হইয়া কহিল—আমি যদি বামুন হই তবে তোর— কি হবে জানিস্?

—কি হবে শুনি?

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া চাটুজ্জে কহিল—জানিনা, যা। আর সেখানে সে দাঁড়াইল না, হন্ হন্ করিয়া গঙ্গার ঘাটে নামিয়া গেল। কালীর পরিহাসটা তাহার বুকে বড় বাজিয়াছিল। যাইতে যাইতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপন মনেই সে যেন কহিল—যা তুই বল্লি বল্লি, আমি শাপ দেব না তোকে। ফেটে ম'রে যাবি শেষে!

পাল-কর্তার মজলিশে তখন উপকথা জমিয়া উঠিয়াছে। কুসুম কখন আসিয়া সেখানে দাঁড়াইয়াছে কেহ লক্ষ্য করে নাই। উপকথা বলিতে বলিতে অকস্মাৎ তাহাকে দেখিয়া পাল কহিল—এস, এস, নাতনী এস! রাত বেশি হয়নি ব'স। তুমি নইলে আসর জমছে না।

ভারী গলায় কুসুম উত্তর দিল—না কত্তা, দেহ বেশ ভাল নাই আমার।

তারপর অনাবশ্যক ভাবে কৈফিয়ৎ দিয়াই যেন সে কহিল—আলোটা আবার নিবে গেল, তেল নিয়ে আসি।

নির্বাপিত হ্যারিকেনটা লইয়া সে ঘাটের নিকটবর্তী মুদীর দোকানটায় গিয়া উঠিল।

চাপা গলায় ছকু কালীকে কহিল—শরীর ভাল নাই! চাটুজ্জে আজ এ পাড়ায় এসেছে কিনা!

কালী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। দোকানে হ্যারিকেনটা নামাইয়া দিয়া কুসুম কহিল—এক পয়সার তেল পুরে দাও তো।

মাপের হাতলওয়ালা বাটিতে ভরিয়া তেল পুরিতে পুরিতে দোকানী কহিল—তেল যে রয়েছে গো।

কুসুম গঙ্গার ঘাটের দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল, দাঁড়াইয়াই রহিল; কোন উত্তর দিল না।

আলোর মুখটা লাগাইয়া দিয়া মুদী আবার কহিল—আলো জেলে দেব, মা-ঠাকুরুন?

সচকিত কুসুম কহিল—এ্যাঁ?

—আলো জেলে দেব?

—না থাক্, বাড়িতে জেলে নেব আমি। হ্যারিকেনটা লইয়া সে চলিয়া গেল।

পাল-কর্তার মজলিশে তখন পক্ষিরাজ ঘোড়া আকাশ-পথে উড়িয়াছে।

চাটুজ্জে ঘাট হইতে ফিরিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

ছকু তাহাকে ডাকিয়া কহিল—উঠে বসুন চাটুজ্জে মশায়। রাগ করলেন?

চাটুজ্জে কহিল,—নাঃ, আর ব'সবো না। ও পাড়ায় যাচ্ছি।

পাল তখন কহিতেছিল—পক্ষিরাজের পিঠে রাজপুত্তুর চড়লেন, আর পক্ষিরাজ শোঁ শোঁ ক'রে আকাশে উড়ল—

চাটুজ্জের আর যাওয়া হইল না। তৎক্ষণাৎ পালের দোকানে ঢুকিয়া প্রতিবাদ করিয়া কহিল—বুড়ো বয়সে গঙ্গাতীরে ব'সে এত মিথ্যে কথা কেন বল, বল দেখি? শোঁ—শোঁ—ক'রে আকাশে উড়ল! ঘোড়া আবার আকাশে ওড়ে।

ঘোড়ার কান গড়িতে গড়িতে পাল হাসিয়া কহিল—এস—এস ভাই, নাত-জামাই এস। দে-রে দে, বসতে দে মোড়াটা। নাও তামাক খাও।

চাটুজ্জে মোড়ায় বসিল। ব্রাহ্মণের হুঁকায় কলিকা বসাইয়া চাটুজ্জের হাতে দিয়া পাল কহিল—তবে আর উপকথা কা'কে বলেছে ভাই!

হুঁকা টানিতে টানিতে চাটুজ্জে কহিল—তাই বলে যত সব মিছে কথা বলতে হবে নাকি?

দড়ি-বাঁধা চশমার ফাঁক দিয়া চাটুজ্জের মুখের দিকে চাহিয়া বুড়া কহিল—যত সব নাতী-নাতনীতে এসে ধরে, কি করি বল?

—তবে তুমি বল, যত পার—পেট ভরে মিছে কথা বল। হুঃ—ঘোড়া নাকি আবার আকাশে ওড়ে!

উপকথা আগাইয়া চলিল—প্রবালদ্বীপের চিলে-কোঠা দেখা যাইতেছে; রাজকন্যার এলানো চুল বাতাসে উড়িতেছে। পদ্মফুল-ভিজানো জলে স্নান-করা তাঁর চুলে উজাড় করা পদ্মবনের গন্ধ; সেই গন্ধে মৌমাছিরা দলে দলে চারি পাশে গুন্ গুন্ করিয়া বেড়ায়। উজান বাতাসে সে গন্ধ রাজপুত্রের বুকে আসিয়া পশিল। গন্ধে মাতাল রাজপুত্র বলেন, 'আরও জোরে পক্ষিরাজ, আরও জোরে।'

হঠাৎ বাধা পড়িল ময়রা বুড়ীর হাসিতে—ও মাগো, এ-কে-গো! ই—হিঃ—হিঃ—হিঃ, কাতু-কুতু কে দেয় গো!

কাতুকুতু যে দিতেছিল তাহারও সাড়া পাওয়া গেল—কেঁউ কেঁউ কুঁ-কুঁ।

একটা কুকুরছানা! কোথা হইতে আসিয়া সেটা বুড়ীর পিঠ চাটিতে শুরু করিয়া দিয়াছে!

বুড়ী চটিয়া আগুন, কহিল—আ-মর্, মর্ মুখপোড়া কুকুর! আমি বলি কে সুড় সুড়ি দিচ্ছে। ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার।

উপকথা ছাড়িয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া পাল কহিল—তাড়াও হে তাড়াও! দোকানে ঢুকলে সর্বনাশ হবে, ভেঙে ফেলবে। লাঠিগাছটা কই, লাঠি-গাছটা?

বুড়ী খোঁজে ঝাঁটা, পাল খোঁজে লাঠি। চাটুজ্জে তাড়াতাড়ি হুঁকাটা নামাইয়া কুকুর-ছানাটিকে কোলে তুলিয়া লইল। তারপর আলোয় আনিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সেটাকে দেখিয়া কহিল—আরে তুই কোত্থেকে এলি? এ যে শ্মশান-ভৈরবীর বাচ্চা ন্যাদাটা! শ্মশান ছেড়ে এখানে কি করতে এলি মরতে? চল্ হতভাগা তোকে মায়ের কাছে দিয়ে আসি! যত সব অখাস্ত কাণ্ড, হুঁ! চাটুজ্জে উঠিয়া পড়িল।

পাল কহিল—শোন, শোন, যেয়ো না। ডাকছে, তোমায় ডাকছে ও—।

সম্মুখে কুসুমের আলোকিত মুক্ত দ্বার, দুয়ারের কাছে মেয়েয় কুসুম দাঁড়াইয়া, চাটুজ্জে সেদিকে ফিরিয়াও চাহিল না। কুকুরছানাটা কোলে করিয়া পথের অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

পাল কহিল—শরীর খারাপ, বেশি রাত ক'রো না; তুমি দোর দিয়ে শোও নাতনী।

কুসুম ততক্ষণে আলো হাতে বাহিরে আসিয়াছে। আবার সে বারান্দায় মাদুর বুনিতে বসিবার উদ্যোগ করিতেছে।

পাল কহিল—শরীর খারাপ বলছিলে না নাতনী?

নতমুখে কুসুম কহিল—এটা কালই দিতে হবে কত্তা। গরিবের শরীর খারাপ হ'লে চলবে কেন বল? বল, তোমার উপকথা বল, কাজ করি আর শুনি।

কে একজন কহিল—কি যে করে গেল বামুন মা!

পালেদের ছি-চরণ কহিল—আহা সোনার প্রতিমা!

একজন কহিল—চাটুজ্জে ত' ভালই ছিল। মেয়েটি মরেই—

প্রসঙ্গ পাল্টাইয়া পাল উচ্চকণ্ঠে কহিল—চুপ্, চুপ্, সব চুপ কর্। উপকথা শোন্, হ্যাঁ তারপর হ'ল কি, পক্ষিরাজ এসে পড়ল আর কি, পা তার ছায় ছোঁয় ছোঁয়—

কিন্তু একটা কলরোলের মধ্যে পালের কথাটা ঢাকা পড়িয়া গেল। দূরে শ্মশান-ঘাটে আবার রোল উঠিল—"বল হরি—হরি বোল্।"

গঙ্গার তীরভূমির ঘন বন-সন্নিবেশের পশ্চিম পাড় ঘেঁসিয়া একটি স্বল্প-পরিসর পথ। পথটি গঙ্গার সহিত সমান্তরাল রেখায় বরাবর চলিয়া গিয়াছে। স্নান-ঘাটের উত্তরে কিছু দূরে একফালি পায়ে-চলার পথ গঙ্গার গর্ভমুখে

নামিয়াছে। ইহার দু'ধারে বুক-ভরা উঁচু আগাছার জঙ্গল। মাথার উপরে বড় বড় গাছের শাখা-প্রশাখা আকাশ ছাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্থানটার একটা তীব্র বিকট গন্ধে বুকের ভিতরটা কেমন মোচড় খাইয়া উঠে।

দগ্ধ নরদেহের গন্ধ। এইটিই শ্মশান-ঘাট।

চাটুজ্জে উপর হইতে এই পথে নামিল।

খানিকটা আসিয়াই গঙ্গার কোলে এক টুক্‌রা সমতল জায়গা পাওয়া যায়। একদিকে রাশীকৃত বাঁশ জড়ো হইয়া আছে; পাশেই তালপাতার চাটাই ও কতকগুলা খাটিয়ার বোঝা। এখানে-ওখানে দুই চারিটা নর কপাল পড়িয়া আছে, হাড়ের টুক্‌রায় মাটির বুক আচ্ছন্ন।

একটু অগ্রসর হইয়া চাটুজ্জে একখানি জীর্ণ টিনের চালায় আসিয়া উঠিল। চালাটার উত্তর দিকে রাজ্যের ছেঁড়া বিছানা গাদা হইয়া আছে। মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ধুনি। ধুনিটার কোল ঘেঁসিয়া একটা খাটিয়ায় বিছানা পাতা, চালাটার কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো লম্বা তারে বাঁধা একটা হ্যারিকেন মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। পশ্চিমে বাঁশে-চাটাইয়ে তৈয়ারী একখানা ছোট ঘর।

নিচে গঙ্গার ঢালু বালুচরের উপর কয়টা শিখাহীন জ্বলন্ত অঙ্গারস্তূপ নিশীথ-অন্ধকারের বুকে ধবক্ ধবক্ করিয়া জ্বলিতেছে। মানুষের দেহ নিঃশেষে আহার করিয়াও আগুনের যেন তৃপ্তি হয় নাই—এখনও সে হা হা করিতেছে। একটা নূতন চিতায় আগুন দেওয়া হইয়াছে। অগ্নিশিখা সবে আশেপাশে উঁকি মারিতেছে। সেই শিখার প্রভায় দেখা যাইতেছিল, রাশি রাশি ধূম্র পাক্ খাইয়া-খাইয়া উপরে উঠিতেছে, নিচে নামিতেছে। চিতার বুকে অনাবৃত একটি শিশুদেহ, বুকে তাহার একখানি কাঠ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শবটির মুখ পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল—দশ-এগারো বছরের কচি মেয়ে! ছোট ছোট চুলগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে—কতক তাহার পুড়িয়াছে—কতক এখনও পোড়ে নাই। শবের পায়ের দিকে একটি মানুষ একটা বাঁশের উপর ভর দিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল! পুরা জোয়ান, নিকষকালো বর্ণ, মাথায় দীর্ঘ বাবরী-চুল অগ্নিতপ্ত বায়ুতাড়নায় মৃদু মৃদু দুলিতেছে।

সে শ্মশান-প্রহরী চণ্ডাল।

চালার উপরে দাঁড়াইয়া চাটুজ্জে ডাকিল—পৈরু!

মুখ ফিরাইয়া সাগ্রহে পৈরু বলিল—পর্‌নাম্—ঠাকুর মহারাজ, আসেন্ আসেন্। কবে আস্‌লেন দেশে?

—এই বিকেল বেলা রে। তারপর, ভাল আছিস্ তো?

—আপনার কিরপা মহারাজ।

—ছেলে-পুলে তোর?

—সবহি ভাল দেওতা!

কাপড়ে ঢাকা কুকুর-ছানাটাকে বাহির করিয়া চাটুজ্জে কহিল—আরে তোর সেই ন্যাদা বাচ্চাটা যে বাজারে গিয়ে পড়েছিল। শেয়ালে নিত আর একটু হলেই—! গলা চড়াইয়া চাটুজ্জে হাঁকিল—ভৈরবী, ভৈরবী! কালু! কালু —মহাদেও!

সঙ্গে সঙ্গে পাশের সেই চালা-ঘরটা হইতে একপাল কুকুর আসিয়া চাটুজ্জেকে ঘিরিয়া লেজ নাড়িতে শুরু করিল। একটা আবার চিৎ হইয়া শুইয়া থাবা দিয়া চাটুজ্জের পায়ে আঁচড়াইতে লাগিল।

কোল হইতে চাটুজ্জে ন্যাদাকে নামাইয়া দিল, সেটা লেজ নাড়িতে লাগিল। খুঁজিয়া বাছিয়া চাটুজ্জে ভৈরবীর কান মলিয়া দিয়া কহিল—মা হয়ে ছেলের খোঁজ নাই হারামজাদী!

ভৈরবী কাতরে মৃদু আর্তনাদ করিল, যেন অপরাধের মার্জনা চাহিতেছে!

চাটুজ্জে হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিয়া কহিল—যা, যা, সব শুগে যা—খুব আদর হয়েছে। যা—সব যা।

কুকুরের দল তবুও যায় না।

পৈরু হাসিল—হঠাৎ কুকুরে দল চীৎকার করিয়া জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া গেল। পলায়নপর জন্তুর পদধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শৃগালের কর্কশ কণ্ঠের ধ্বনি শোনা গেল —"খ্যাক্ খ্যাক্।" টিনের চালায় খাটিয়াটার বিছানার ভিতর কে যেন নড়িয়া- উঠিল। কম্বলের আচ্ছাদন ভেদ করিয়া একটি শিশু মুখ বাড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল—বাবা—এ—বাবা।

পৈরু উত্তর দিল—যাই, যাই হো মায়া,—ঘুম যাও, শো যাও—শো—যাও হো বেটিয়া।

শিশুটি বিছানায় মুখ লুকাইল।

চাটুজ্জে কহিল—তোর সেই খুকীটা,—না রে পৈরু?

—হাঁ মহারাজ, কিছুতে ছাড়লো না হামাকে আজ।

চিতাটা দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিয়াছে। পৈরু হাত মুখ ধুইয়া উপরে আসিয়া কন্যাটিকে সযত্নে কম্বল ঢাকিয়া দিল। তারপর মাথার চুলগুলি তাহার

হাতে করিয়া সাজাইয়া দিতে দিতে কহিল—বেটা হামার বহুৎ ভালা দেওতা, হামাকে বড়া পিয়ার করে।

চাটুজ্জে চিতার দিকে চাহিয়া ছিল, কথা কহিল না। বিড়ি বাহির করিয়া পৈরু কহিল, বিড়ি পিবেন্ মহারাজ!

চিতার আগুনের পানে চাহিয়া চাহিয়া চাটুজ্জে কহিল—দে। ধুনির আগুনে বিড়ি ধরাইয়া চাটুজ্জে চিতার পানেই চাহিয়া রহিল।

পৈরু কহিল—থোড়া বস্‌বেন মহারাজ?

—হুঁ।

—তব, বসেন্ আপনি, হামি খাইয়ে লিই।

পৈরু একটা ঝাঁটা লইয়া ওই কুকুরের ঘরের মেঝেয় গিয়া ঢুকিল। চারিটা পাশ ময়লায় ভর্তি। তারই একটা প্রান্ত ঝাঁটা বুলাইয়া পৈরু জল ছিটাইয়া দিল। এবং ঐখানেই সে গাম্‌লা-ঢাকা খাবার লইয়া গিয়া বসিয়া পড়িল।

এদিকে জলন্ত চিতাটা ক্রমশ ম্লান হইয়া আসিতেছিল।

চাটুজ্জে কহিল—চিতাটা যে নিবে এল পৈরু, আঙ্‌রা ঝাড়তে হবে।

খাইতে খাইতে পৈরু কহিল—যাই হামি মহারাজ!

—খাবার দেরি কত তোর?

—দের থোড়া আছে। থাক্, আমি যাই।

—থাক্, তুই খা, আমিই দিচ্ছি ঝেড়ে।

চাটুজ্জে কাপড় সাঁটিতে সাঁটিতে চড়ায় নামিয়া পড়িল।

পৈরু তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিল—না না দেওতা, বাড়ি যাবে তুমি। শীতকা রাত, আস্নান করতে হবে—।

অর্ধদগ্ধ শবটকে নাড়াচাড়া দিতে দিতে চাটুজ্জে কহিল—তোর ওই ধুনির পাশেই শোব না হয় আজ।

একান্ত দুঃখের সহিত পৈরু কহিল—নেহি দেওতা, ই চণ্ডালকে কাম। হামার পাপ হোবে দেওতা—

—দূর বেটা! শিব নিজে একাজ করে জানিস্? তোরা হচ্ছিস্ নন্দীর বাচ্চা।

পৈরু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছিল। বাহিরের পথের উপর হইতে-কে তাহাকে ডাকিল—পৈরু!

তাড়াতাড়ি পৈরু বাহির হইয়া আসিল এবং আহ্বানকারীকে দেখিয়া একান্ত অপরাধীর মতই কহিল—মাইজী!

রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া কুসুম।

কুসুম কহিল—একবার ডেকে দাও পৈরু।

পৈরু উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—মহারাজ, মহারাজ, এ ঠাকুরজী!

মহারাজ তখন চিতাগ্নিটাকে প্রজ্বালিত করিতে করিতে বক্তৃতা শুরু করিয়া দিয়াছে—শৈব্যা, শৈব্যা!

জোর গলায় পৈরু আবার ডাকিল—ঠাকুর-জী!

চিতাগ্নি হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহারই লেলিহান শিখার দিকে চাহিয়া পরমানন্দে চাটুজ্জে পৈরুকে ডাকিয়া কহিল—দেখে যা বেটা, দেখে যা, চিতা যার নাম, এ নইলে মানাবে কেন? জানিস্ পৈরু, এমনিধারা চিতা সারা দিনরাত যদি জ্বালিয়ে রাখতে পারিস্—তবে ঠিক রাত্রে শ্মশান-কালীকে আসতে হবে। এ একটা যজ্ঞ রে!

পৈরু আবার ডাকিতে যাইতেছিল, কিন্তু কুসুম বাধা দিয়া কহিল—থাক্ পৈরু, আমি খাবারটা দিয়ে যাই, তুমি খাইয়ো, ব'লো না যেন আমি দিয়ে গেছি।

চালার একটা প্রান্ত কুসুম এক হাতে পরিষ্কার করিয়া লইল। তার পর অঞ্চলতলে ঢাকা খাবার, জলের ঘটি রাখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। পিছন হইতে পৈরু কহিল—সাথমে যাই হামি মাইজী।

কুসুম একটু হাসিল, কহিল—না বাবা, তুমি যাও, খাবারটা হয়তো কিছুতে খেয়ে দেবে। আমি একাই যেতে পারব।

নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে কুসুম ডুবিয়া গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পৈরু ফিরিল।

চিতাটা নাড়িতে নাড়িতে চাটুজ্জে কহিল—কি?

—হাত মুখ ধুয়ে আসেন্। বেশ জ্বলেছে উ।

—তোর হ'ল?

—হাঁ, আপনি শিগ্রি আসেন। ফেলেন, বাঁশ ফেলেন।

পৈরুর কণ্ঠস্বরে একটা দৃঢ়তা ছিল, চাটুজ্জে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না, উঠিয়া আসিল।

অঙ্গুলিনির্দেশে খাবার দেখাইয়া দিয়া পৈরু কহিল—ভোজন করেন।—হামি আনাইলাম গো ওহি চাষাদের ছোকরাকে দিয়ে।

পৈরুর মুখপানে চাটুজ্জে তাকাইয়া কহিল—কুসুম দিয়ে গেল, নয় পৈরু?

—হাঁ, এৎনা রাতমে মাইজী আসবে হিঁয়া!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চাটুজ্জে খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে সে কহিল—সত্যি বড় ক্ষিদে পেয়েছিল পৈরু, এই জন্যেই তোকে এত ভালবাসি।

পৈরু উত্তর দিল না, সে ভাবিতেছিল মাইজীর কথা। শ্মশানের চণ্ডাল সে, দুঃখের উচ্ছাস সে অনেক দেখিয়াছে, বুক-ফাটা কান্না সে অনেক শুনিয়াছে, কিন্তু দুঃখের এমন নীরব প্রকাশ সে আর দেখে নাই।

চাটুজ্জে আপন মনেই কহিতেছিল—আমাকে আর কেউ ভালবাসে পৈরু, তুই ছাড়া?

পৈরুর মনে হইল, মাইজী যেদিন চিতায় চড়িবে সে দিন হয়তো বুকের জমা-করা কান্নায় চিতার আগুন জলিবে না, নিবিয়া যাইবে। চাটুজ্জে আবার কহিল—কুসুমও আমায় ভালবাসে পৈরু। কিন্তু—

কথাটা তাহার অসমাপ্তই রহিয়া গেল।

পৈরু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কি বলছিলেন মহারাজ-জী?

চাটুজ্জে উত্তর দিল না।

পৈরু ডাকিল—দেওতা!

চাটুজ্জে মুখ তুলিয়া চাহিল। চিতার দীপ্ত আলোকে পৈরু দেখিল চাটুজ্জের চোখ বাহিয়া জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। অপ্রস্তুতের মত চাটুজ্জে কহিল—মেয়েটাকে মনে পড়ে গেল পৈরু। কুসুমের কথা হ'লেই তাকে আমার মনে পড়ে যায়। জানিস পৈরু, কুসুমের মুখের দিকে চাইলে আমার কান্না পায়। মা-মণির, আমার সন্ধ্যামণির মুখ যেন ওর মুখের মধ্যে জল্ জল্ ক'রে ভাসে।

পৈরুর চোখ দিয়াও এবার জলে ধারা গড়াইয়া পড়িল।

চাটুজ্জে আবার কহিল—কিন্তু জানিস্ পৈরু, খুকুমণির জন্যে ওর একটুও দুঃখ হয়নি; ও তার জন্যে কাঁদে না।

বাধা দিয়া পৈরু কহিল—মৎ বোল্‌না, ই বাত্ মৎ বোল্‌না, ঠাকুর-জী! মাইজীর আঁখের পানিতে দরিয়া বেড়ে গেল দেওতা। তুম্‌হার আঁখ নেহি; তুমি দেখলে না।

সচকিত ভাবে চাটুজ্জে পৈরুর মুখপানে চাহিয়া কহিল—সত্যি পৈরু?

দৃঢ়কণ্ঠে পৈরু কহিল—সাম্‌না মে গঙ্গাজী যেমন সাচ্, মহারাজ, ই বাত হামার তেমনি। ঝুট হোয় তো শিরমে হামার বাজ গিরবে দেওতা।

কতক্ষণ পর চাটুজ্জে ধীরে ধীরে কহিল—লোকে কত কি বলে ওই বুড়ো পালকে নিয়ে, কিন্তু সে মিথ্যে, আমি জানি। কিন্তু কুসুম কাঁদে খুকুমণির জন্যে ?—সারাদিনই যে মাদুর বোনে ও, দিনরাতই যে ওর পয়সা-পয়সা!

পৈরু এ কথার কোন জবাব দিল না।

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রোল উঠিল—বল হরি—হরি বো—ল। নূতন কে মহাপথ-যাত্রী আসিল।

সে রোলের প্রতিধ্বনি বনে বনে, গঙ্গার বাঁকে বাঁকে ধ্বনিয়া দূর দূরান্তে মিলাইয়া গেল। চকিত শৃগালের দল কলরব করিয়া উঠিল। গাছের মাথায় শকুনিরা পাখা ঝট্‌পট্ করিয়া নড়িয়া বসিল।

টিনের চালায় মানুষ দুটি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। হাত-মুখ ধুইয়া চাটুজ্জে বিড়ি ধরায়, পৈরু শবের লকুড়ি সংগ্রহ করিতে নিচে নামিয়া যায়।

নূতন কাঠ বহিয়া আনিয়া পৈরু আবার চিতা সাজাইল।

শববাহকের দল চিতায় শব তুলিয়া দিতে গেল।

পৈরু ডাকিল—ঠাকুর-জী!

কেহ উত্তর দিল না, চাটুজ্জে কখন চলিয়া গিয়াছে।

শবের কাপড় বিছানা ভাঁজ করিয়া সযত্নে তুলিয়া রাখিয়া পৈরু শবের পদপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। অভ্যাসমত বাঁশে ভর দিয়া পৈরু গঙ্গার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

"পৈরু!"—চাটুজ্জে ফিরিয়া আসিল।

—মহারাজ!

—এ কেমন মড়া রে ?

—ই যানেওলা হ্যায় মহারাজ,—সাদা মাথা।

চিতাটা জ্বলিয়া উঠিতেই পৈরু উপরে আসিয়া বসিল।

চাটুজ্জে চুপি চুপি কহিল—পৈরু!

—মহারাজ!

—কুসুম কাঁদছে। আমি শুনে এলাম চুপি চুপি গিয়ে।

চিতার আগুনে পৈরুর মুখখানি বেশ দেখা যাইতেছিল; সে মুখ তাহার হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে কহিল—গঙ্গাজী সাচ হ্যায় দেওতা; ঝুটা তো নেহি। ধুলির পাশে একখানা কম্বল বিছাইয়া চাটুজ্জে শুইয়া পড়িল। চিতাটার নির্বাণ অপেক্ষায় শ্মশানের বুকে চণ্ডাল জাগিয়া বসিয়া রহিল।

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে স্নান-ঘাটের রূপ একেবারে পাল্টাইয়া গেছে। ঘাটে বাজারে লোক আর ধরে না। স্তব-গানের রোলে পাখীর কলরবও ঢাকা পড়িয়াছে। গঙ্গার বুকে নৌকার মেলা; মহাজনী নৌকাগুলা উজানে গুনের টানে চলিয়াছে; জেলে-ডিঙিগুলা মোচার খোলার মত হেলিয়া দুলিয়া একটি নির্দিষ্ট সীমা-রেখা পর্যন্ত গিয়া আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ওপারের খেয়াঘাটে যাত্রীর দল, মাল-বোঝাই গাড়ির সারি, গরু-মহিষের পাল আবার ভিড় করিয়াছে। পথের পাশে কানা-খোঁড়ার সারি বসিয়া গিয়াছে।

—অন্ধজনে দয়া কর রানী-মা!

—খোঁড়াকে একটা পয়সা দিয়ে যান না।

একদল বাউল দুটি ছেলেকে রাধাকৃষ্ণ সাজাইয়া ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে। বাঁধা-ঘাটের পাশে পল্লীবাসিনীরা স্নান করিতেছে। কুসুমকেও তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। ও-পাড়ার বিশ্বাস-গিন্নি, কুসুমের সই-মা, কুসুমকে দেখিয়া কহিলেন,—তাই ত মা কুসুম, কাল বাড়ি এসে সব শুনলাম; এখানে তো ছিলাম না। কি করবি বল্ মা—গাছের সব ফুল ক'টি কি থাকে? মনে কর্ ও তোর নয়।

কুসুমের চোখ দিয়া দর্ দর্ ধারে জল গড়াইয়া পড়িল। চোখের জল মুছিয়া সে কহিল—ও কথা ব'লো না সই-মা, সে আমার—সে আমার ছাড়া আর কারও নয়। সে আমার আবার ফিরে আসবে, দেখো তুমি, সেই মুখ সেই চোখ সেই কথা, সেই সব।

—তাই হোক্ মা তাই হোক, আশীর্বাদ করি তাই হোক্। সে তোর খেলতে গিয়েছে, আবার ফিরে তোর কোলে আসুক।

স্নান-ঘাটের মাথায় বসিয়া চাটুজ্জে ওপারের দিকে চাহিয়া ছিল। গত বছরের ওপারের সেই ভাঙনটা নামিয়া আসায় সেখানে নতুন চর জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারই মধ্যে লাঙলের কল্যাণে শ্যামল ফসলে ভরিয়া গিয়াছে। কোন একটা ফসলে ফুলও দেখা দিয়াছে।

চাটুজ্জে উঠিয়া বাড়ির দিকে চলিল।

দ্বিজদাসের দোকানে তখন অনেক ভিড়, সেখানে রাত্রের পাওনা-গণ্ডার হিসাব চলিয়াছে। মুদীর দোকানে কলাই না কিসের একটা ওজন হইতেছে —'রামে-রাম—রামে-রাম—রামে-দুই—দুই রাম।'

পাল-কর্তার দোকানে রঙ-বেরঙের পুতুলের সারি।

চাটুজ্জে কুসুমের দাওয়ায় গিয়া উঠিল। কিন্তু থম্‌কিয়া সে দাঁড়াইল। দাওয়ার নিচে সন্ধ্যামণির একটা কচি-গাছ, সেটা ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

কুসুম বোধ হয় দূর হইতেই তাহাকে দেখিয়াছিল, ঘর হইতে ডাকিল—এসো!

চাটুজ্জে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া ছিল।

কুসুম আবার ডাকিল—এসো।

সঙ্কোচভরে চাটুজ্জে কহিল—তেল দাও তো, আগে স্নান ক'রে আসি। রাত্রে শ্মশানে—।

হাসিয়া কুসুম কহিল—তা হোক্।

চাটুজ্জে বলিল—সন্ধ্যামণি ফুল ফুটেছে—খুকু গাছ পুঁতেছিল।

দোকানে দোকানে তখন হাঁক উঠিয়াছে—

—তুফানী বিড়ি, মিঠা পান—

—গঙ্গাফল নিয়ে যান মা।

—পুতুল মা, পুতুল।

কুসুম সজল চক্ষে প্রত্যাশার হাসি হাসিয়া বলিল—সে আবার আসবে।

সনাতন

শিবনাথ প্রশ্ন করিল, রোগটা কি?

ননীবাবু প্রবীণ চিকিৎসক, চিকিৎসাবিদ্যা বংশগত বিদ্যা, তিন পুরুষ ধরিয়া এ বংশের প্রত্যেকেই চিকিৎসক হিসাবে শুধু জীবিকাই নয়, খ্যাতি এবং প্রতিপত্তিও যথেষ্ট পরিমাণে অর্জন করিয়া আসিয়াছে। এই বিদ্যার সঙ্গে ইহাদের একটা যেন জন্মগত পরিচয় আছে। বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত নাড়ী দেখিতে জানে, আকস্মিক আপদে-বিপদে দুই-চারিটা টোটকার ব্যবস্থা পর্যন্ত তাহারা দিয়া থাকে। ননী ডাক্তার কবিরাজি এবং ডাক্তারি দুই-ই জানেন, ধীর গম্ভীর লোক, এ অঞ্চলে লোকে বলে—ধন্বন্তরি। অবশ্য ননী ডাক্তারের হাতে সকল রোগীই যে বাঁচে তাহা নয়, তবে ননীবাবু ভুল করেন না; ক্ষেত্রবিশেষে সসম্ভ্রমে মৃত্যুকে অভিবাদন করিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়ন।

ননীবাবু হাসিয়া বলিলেন, রোগটা কালরোগ, আর কি

কালরোগ !

হ্যাঁ। বয়স যে অনেক। পঁচাশির কম নয় কাল—মানে বয়সই এখন ব্যাধি। ননীবাবু আবার একটু হাসিলেন।

শিবনাথদের বাড়ির চার পুরুষের চাকর।

শিবনাথের প্রপিতামহের আমলে এ বাড়িতে বহাল হইয়াছিল। দশ বছর বয়সের হাড়ীর ছেলে, মোটাসোটা চেহারা, থ্যাবড়া নাক, কুতকুতে চোখ, মাথায় একমাথা কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বলিষ্ঠ গঠন; গরুর রাখালি করিবার জন্য বহাল হইয়াছিল। নাম সনাতন, কিন্তু মোটাসোটা চেহারার জন্য কর্তা নাম দিয়াছিলেন, কুমড়ো।

ছোট ছোট চোখে অনেকক্ষণ কর্তার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল, বাবু মশায়! কত্তাবাবু!

কি রে ?

কর্তার পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা কুমড়োর মনে কেমন যেন ভয়ের সঞ্চার করিতেছিল; অদ্ভুত, বিস্ময়কর, দুর্বোধ্য ! কুমড়ো বিহ্বল করুণ ভাবে সভয়ে প্রশ্ন করিয়াছিল, আমাকে মারবা না কত্তাবাবু ?

বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াও সস্নেহে হাসিয়া কর্তা বলিয়াছিলেন, না, মারব কেন।

ঘরের ভেতর ভ'রে রাখবা না ?

না, না। বরং ভাল ক'রে কাজ করলে বকশিশ দেব।

বকশিশ দেবা ? কি দেবা ?

কি নিবি ?—কর্তা হাসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

চাপরাসীর লাল শালুর পাগড়িটা দেখাইয়া কুমড়ো বলিয়াছিল, অমুনি লাল টুপি একটো আমাকে দিও।

ঠিক সেই সময়েই বাড়ির ঝি আসিয়া কর্তাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে ঘোমটা টানিয়া মৃদুস্বরে জানাইয়াছিল, বাজার যাইবার জন্য লোকের প্রয়োজন, লবঙ্গের অভাব পড়িয়াছে, পান সাজা বন্ধ হইয়া রহিয়াছে।

চাকরটা কার্যান্তরে গিয়াছিল, চাপরাসীরও কার্যভার লইয়া-বাহিরে যাওয়ার কথা, কর্তা কুমড়োকেই পাঠাইয়াছিলেন—লবঙ্গ নিয়ে আয় চার পয়সার, বুঝলি ?

কিছুক্ষণ পর প্রকাণ্ড একটা ঠোঙা হাতে কুমড়ো বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিয়া ঠোঙাটা নামাইয়া দিয়াছিল, এই ল্যান গো।

ঠোঙায় একঠোঙা নুন!

বাড়িতে হাসির ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। গিন্নী সেবার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, খেতে ঝাল-ঝাল লাগে, লবঙ্গ, লবণ নয়, বুঝলি? লঙ্গ, লঙ্গ।

দ্বিতীয় বারে আরও একটা বড় ঠোঙা হাতে কুমড়ো ফিরিয়া আসিয়াছিল, এবার ঠোঙায় এক ঠোঙা লঙ্কা।

সেবার আর হাসির ধ্বনি বাড়ির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, কাছারি-বাড়ি পর্যন্ত পৌছিয়াছিল; কুমড়ো বিব্রত এবং বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল, বললা যি, ঝাল!

কর্তার খড়ম বাজিয়া উঠিয়াছিল, তিনি এত উচ্চ হাসির জন্য বিরক্ত হইয়াই আসিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত শুনিয়া উচ্চ হাসিতে তিনি গোটা পাড়াখানা সচকিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

দীর্ঘ পঁচাত্তর বৎসর পরেও সনাতনের সে কথা এ বাড়িতে সকলেই জানে; পরিবারের ইতিহাসের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। আরও একটা কথা—সেই প্রথম দিনেরই কথা—বাঁচিয়া আছে। বাড়ির গরু বাছুর গোয়ালে বন্ধ করিয়া, সনাতন বাড়ি যাইতে বাহির হইয়া পথে দাঁড়াইয়া সরবে কাঁদিয়াছিল, ও—মা গো! ওগো—মা গো!

কর্তা নিজে বাহির হইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কে মেরেছ?

হাতের মুঠায় চোখ মুছিতে মুছিতে কুমড়ো বলিয়াছিল, 'আনার' হয়ে যেল যি!

কি?

আঁদার।

আঁধার?

হ্যাঁ। আমি কি ক'রে বাড়ি যাব? 'মোলকিনী' পুকুরের পাড়ে ভূত আছে যি! ভাগাড়ে গো-দানা আছে গো!

কর্তা হাসিয়া চাপরাসী সঙ্গে দিয়া কুমড়োকে বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সনাতনের সঙ্গে সে কথা আজও বাঁচিয়া আছে। সে তাহার দীর্ঘ জীবনে অসংখ্য ভূতের আশ্রয়স্থল আবিষ্কার করিয়াছে।

শুধু ভূত নয়, দেবস্থান এবং দেবতাকেও তাহার ভয় ছিল বিষম, সে ভয়

আজও তাহার যায় নাই। আর একটা নূতন ভয় তাহার মধ্যে সংক্রামিত হইল চাকরির কয়েক দিন পরেই।

বড়বাবু অর্থাৎ কর্তাবাবুর বড় ছেলে শিবনাথের পিতামহ কাছারিতে বসিয়া একজন প্রজার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন; মাতব্বর প্রজাটি কথা বলিতে বলিতে অকস্মাৎ কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া ফেলিল। কুমড়ো কয়েক আঁটি খড় লইয়া সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইল। ব্যাপরটা না বুঝিলেও ব্যাপারটার অন্তর্নিহিত উত্তেজনা গুপ্ত বহ্নির উত্তাপের মত তাহাকে স্পর্শ করিল। বড়বাবুর থমথমে মুখ, মোড়ল মহাশয়ের সোজা বসিবার ভঙ্গি এবং সতেজ কণ্ঠস্বর তাহাকেও উত্তেজিত এবং কৌতূহলী করিয়া তুলিল। সকল কথা মনে নাই, কিন্তু ঘটনাটার শেষ দুইটা কথা সনাতনের বার্ধক্যজনিত বধির কানে আজও বাজে—পারবে না?

সমান তেজে প্রজাটি উত্তর দিল, না।

সঙ্গে সঙ্গে বড়বাবুর এক লাথিতে এত বড় মানুষটা উল্টাইয়া দাওয়া হইতে একেবারে নিচে আসিয়া পড়িল।

কুমড়োর সর্বাঙ্গ ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে পলাইয়া আসিল। বড়বাবুর প্রতি দুরন্ত একটা ভয় তাহার বুকে চিরদিনের মত বাসা বাঁধিয়া বসিল। দীর্ঘদিন চাকরির মধ্যে সে ভয় তাহার আর যায় নাই।

এই কয়টি ভয় বাদ দিয়া কিন্তু সনাতনের দুর্দান্ত সাহস। বাবুদের 'উদাসীর ডাঙা'য় বিস্তীর্ণ জঙ্গলাবৃত প্রান্তরে গো-চারণের মাঠ—সেখানে গোখরো, কেউটে, চন্দ্রবোড়া সাপ যথেষ্ট। গো-চারণের ছোট পাচনি লাঠি ও ঢেলার সাহায্যে কত সাপ যে সে মারিয়াছে, তাহার হিসাব নাই। শুধু মারাই নয়, সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে সে নিজেই সাপকে বন্দী করার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে। নেকড়েজাতীয় হিংস্র হেঁড়োলের বাসস্থান আবিষ্কার করিয়া হেঁড়োলের বাচ্চাও সে ধরিয়া আনিয়াছে। একবার বড় একটা নেকড়ে একটা বাছুর আক্রমণ করিয়াছিল; তখন অবশ্য কুমড়ো আর কুমড়ো নয়, সে তখন আঠারো-উনিশ বছরের কাঁচা জোয়ান; দৈর্ঘ্যে প্রায় সাধারণ মানুষের হাতের সওয়া চার হাত অর্থাৎ ছয় ফুটেরও বেশি। পাচনটা লইয়াই সে নেকড়েটার উপর লাফাইয়া পড়িয়াছিল। নেকড়েটার টুঁটির উপর যখন সে পা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন তাহার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। সে ক্ষতচিহ্ন তাহার লোলচর্ম দেহে আজও অক্ষয় হইয়া আছে।

জানোয়ারটাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া আসিল। চামড়াটা ছাড়াইয়া লইবার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু মনিব-বাড়ির চাপরাসীটা সেটাকে লইয়া গিয়া হাজির করিল কাছারিতে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাক পড়িল।

কর্তাবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন, বলিলেন, বেটা অসুর! সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন নায়েবকে, বেটাকে একটা পাগড়ি কিনে দাও তো। আমার মনে আছে, প্রথম দিনই বেটা আমার কাছে লাল পাগড়ি চেয়েছিল।

বড়বাবু গম্ভীরভাবে হুকুম দিলেন, আগে ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাক, যে রকম কেটে গেছে, আর নেকড়ে-টেকড়ের দাঁতে বিষ আছে শুনেছি।

সনাতন প্রতিবাদ করিতে পারিল না, কিন্তু একটু একটু করিয়া সরিয়া আসিয়া আড়াল পড়িতেই একেবারে সোজা দৌড় মারিল। বাপ রে! ডাক্তার ছুরি চালাইয়া দিবে, আষ্টেপৃষ্ঠে ন্যাকড়ার ফালি দিয়া বাঁধিয়া দিবে, বাপ রে! পলাইয়া আসিয়া সে একেবারে গোয়ালঘরের মাচায় উঠিয়া বসিয়া রহিল। চাপরাসীটা বার দুয়েক ডাকিয়া ফিরিয়া গেল। পাখির কলরবে সন্ধ্যা আসন্ন বুঝিয়া মাচা হইতে চুপি চুপি নামিয়া গরুগুলাকে পুরিয়া দিয়া বাড়ি পালাইল। কিন্তু কিছুদূর আসিয়াই তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া আসিয়াছে, সম্মুখে মোলকিনী পুকুরের পাড়ের বটগাছটায় ভূত আছে। ঝাঁকড়া বটগাছটার পাশেই বাঁশের ঝাড়, ভূত বাঁশ হইয়া রাস্তার উপর পড়িয়া থাকে, কেহ সেটাকে পার হইতে গেলেই তড়াক করিয়া বাঁশটা সোজা উপরে উঠিয়া যায়; বাঁশের সঙ্গে মানুষটাও ওই উপরে উঠিয়া ঘাড় গুঁজিয়া মাটিতে পড়িয়া মরে। শতেক ছলনা ভূতের। ভাদ্র মাসে পাকা তাল হইয়া গাছ হইতে একেবারে নির্ঘাত ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। কখনও বা হঠাৎ একেবারে তালগাছের মত আকাশে মাথা ঠেকাইয়া পথের উপর দাঁড়ায়। এই তালগাছের মত মূর্তিকেই সনাতনের বেশি ভয়। কিন্তু উপায়ই বা কি? এ পথে তো তাহাদের জ্ঞাতি-জ্ঞাতি ছাড়া বড় কেহ যায় না। আবর্জনা-পরিপূর্ণ এই অংশটা পার হইয়া তবে তাহাদের পল্লী। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও সনাতন কাহারও সঙ্গ পাইল না। তাহাদের অন্য সকলে এতক্ষণে বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছে। ধর্মরাজতলার বটগাছটির নিচে ঢোল লইয়া গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বৈশাখে বোলান গান, জ্যৈষ্ঠের পাঁচালি, আষাঢ়ে পঞ্চমী হইতে নাগপঞ্চমী পর্যন্ত মনসার ভাসান, ভাদ্রে ভাদু, আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্যন্ত পাঁচমিশালী, চৈত্রে ঘেঁটু। সনাতন নিজে গান গাহিতে পারে না।

কর্কশ মোটা কণ্ঠস্বর, কিন্তু উৎসাহ তাহার প্রবল। কোনরূপে সে বুক বাঁধিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। ঠিক করিল, বটগাছতলাটার আগে হইতেই সে চোখ বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবে।

মোলকিনীর পাড়ে আসিয়া সে চোখ বন্ধ করিল। কিন্তু চোখ সে আপনার অজ্ঞাতসারেই বার বার খুলিয়া ফেলিতেছিল।

ও কে? বুকের ভিতরটায় যেন ঢেঁকি দিয়া কেহ হৃৎপিণ্ডটাকে কুটিতেছে! সাদা-কাপড়-পরা ছোট আকারের ও কে ওখানে ঘুরিতেছে! সে অদ্ভুত একটা বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, কে? মূর্তিটা এতক্ষণ তাহাকে বোধ হয় দেখে নাই, তাহার অদ্ভুত বিকৃত স্বরের সাড়ায় এবার সে ঘুরিয়া খানিক আগাইয়া আসিয়া খিলখিল শব্দে হাসিয়া উঠিল। সনাতনের চেতনায় লোপ পাইতেছিল, প্রাণপণে সে চেতনাকে জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা করিল।

মূর্তিটা আরও খানিকটা আগাইয়া আসিয়া নাকী সুরে বলিল, আমি ভূঁত। সঙ্গে সঙ্গে আবার সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এবার সনাতনের সর্বাঙ্গে একটা অতি উত্তেজনাময় উষ্ণ চেতনার প্রবাহ ভয়ের হিমশীতল অন্ধকারের মধ্যে অগ্নিগর্ভ বিদ্যুৎ-চমকের মত খেলিয়া গেল।

নন্দ! ভূত নয়, নন্দরাণী—তাহাদেরই সেই ডাকাবুকো মেয়েটা—কষ্টিপাথরের মত কালো, শ্যাওলার মত নরম—সেই মেয়েটা। ভয় সনাতনের কোথায় চলিয়া গেল, সে বুঝিল না, বুঝিতেও চাহিল না; বিপুল উত্তেজনাময় উল্লাসে সেও হো-হো করিয়া হাসিয়া নন্দর দিকে ছুটিল। মুহূর্তে মেয়েটাও ছুটিল। সুদীর্ঘ সনাতন, আর নন্দ ছোটখাটো মেয়েটি, সে কতক্ষণ তাহার আগে আগে ছুটিবে! সনাতন লম্বা হাত বাড়াইল। কিন্তু অদ্ভুত কৌশল মেয়েটার—চট করিয়া পাশ কাটাইয়া এমন মোড় ফিরিল যে, সনাতন শূন্য হাত বাড়াইয়া গতির আবেগে চলিয়া গেল—নন্দ অন্য দিকে সরিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল। এমনই একবার নয়, বার বার। ভাদ্রমাসের অন্ধকার সে হাসিতে যেন শিহরিয়া উঠিতেছিল। অবশেষে নন্দকে সে যখন ধরিল, তখন নন্দ এলাইয়া পড়িয়াছে। সনাতনও হাঁপাইতেছিল। তবুও সে শিশুর মত নন্দর ছোট দেহখানি দুই হাতে তাহার মাথার উপরে তুলিয়া বলিল, দি, ফেলে দি আছিড়ে?

সুকৌশলে ঈষৎ ঝুঁকিয়া নন্দ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কই, দে দেখি!

ভাদ্র-সন্ধ্যায় নন্দ তাদের খোঁজে আসিয়াছিল।

এই নন্দকেই সে বিবাহ করিল। সেও একটা কাণ্ড। নন্দর বাপ পণের দাবি করিল অনেক—এক কুড়ি পাঁচ টাকা।

পরের দিন নন্দকে আর পাওয়া গেল না। সে এক হৈ-চৈ ব্যাপার; সনাতন কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে মনিব-বাড়িতে কাজ করিতেছিল! ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্বে থানা-পুলিসকে লোকে এড়াইয়া চলিত, আইন-কানুনও জানিত না। নন্দর বাপ-মা বড়বাবুর কাছে আসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বড়বাবু কড়া লোক, সূক্ষ্ম বিচারক; কর্তাবাবুর সবতাতেই হাসি।

আজ্ঞে হুজুর, ওই—ওই শালারই কাজ।

বড়বাবু হুকুম দিলেন, ডাক তো বেটাকে। কিন্তু সনাতন তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। চাপরাসীটা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ্ঞে, কোথাও পেলাম না।

সবিস্ময়ে বড়বাবু বলিলেন, আরে, এই তো ছিল!

একান্ত নিরুপায় ভঙ্গিতে চাপরাসীটা বলিল, আজ্ঞে, তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলাম।

ঠিক এই সময়ে কর্তাবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত শুনিয়া তিনি হাসিলেন, বলিলেন, সে বেটা অসুর গেল কোথায়?

এই ছিল, কিন্তু আর পাওয়া যাচ্ছে না।

কর্তাবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাড়ির বাগানের গাছগুলার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তারপর চলিয়া গেলেন গোয়াল-বাড়ির দিকে। সেখানে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, গোয়াল-ঘরে ঢুকিয়া ডাকিলেন, এই ব্যাটা অসুর!

গোয়ালের মাচার উপরে খসখস শব্দ হইতেছিল, শব্দটা থামিয়া গেল।

এবার ঈষৎ কঠোর স্বরে ডাকিলেন, সনাতনে!

মাচার উপর হইতে ঝুপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া সনাতন দাঁড়াইল।

কর্তা আবার একবার উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এই হারামজাদী হাড়িনী, নাম মাচা থেকে!

বিড়ালীর মত কড়িকাঠ আঁকড়াইয়া ঝুলিতে ঝুলিতে এবার নন্দ লাফাইয়া নামিল।

কর্তা বলিলেন, আয়।

নিঃশব্দে পোষা জানোয়ারের মত কর্তাবাবুর পিছনে পিছনে কাছারিতে আসিতেই নন্দর বাপ-মা দারুণ ক্রোধে উচ্চ চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। বড়বাবুর চোখ দুইটাও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। ভয়ে সনাতন যেন অসাড় পঙ্গু হইয়া গেল। কর্তাবাবু গম্ভীর স্বরে নন্দর বাপ-মাকে বলিলেন, চেঁচাস নি। তারপর নায়েবকে বলিলেন, পঁচিশটা টাকা আমাকে দাও তো।

বড়বাবু প্রশ্ন করিলেন, আজ্ঞে?

পঁচিশটা টাকা। কর্তাবাবু নায়েবের দিকে চাহিলেন। নায়েব বিনা বাক্যব্যয়ে পঁচিশটা টাকা বাহির করিয়া দিল। কর্তাবাবু নন্দর বাপকে ডাকিয়া বলিলেন, নে, গুনে নে। আজ রাত্রেই বিয়ে দিতে হবে, বুঝলি?

বিবাহের পর সনাতন গোল বাধাইল। যে সনাতন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মনিব-বাড়িতে পড়িয়া থাকিত, সেই সনাতন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়ি পলাইতে আরম্ভ করিল। সনাতন এই আছে, এই নাই। শুধু তাই নয়, সেদিন চাপরাসীরা সনাতনকে ডাকিতে গিয়াছিল, সনাতন তাহাকে বেশ ঘা-কতক লাগাইয়া দিল। ইহার পর তিন চার জন চাপরাসী গিয়া সনাতনকে বাঁধিয়া লইয়া আসিল। বড়বাবু তাহাকে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন। কিন্তু কর্তাবাবু কি সুনজরেই তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তিনি সে দণ্ড মাপ করিয়া বলিলেন, দে, নাকে খত দে বেটা শুয়ার!

মাটির উপরে নাক ঘষিয়া সনাতন চামড়া পর্যন্ত তুলিয়া ফেলিল। রক্তাক্ত নাকটা দেখিয়া এবার বড়বাবুও হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, খবরদার, এমন কাজ আর যেন করবি না।

সনাতন কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, আমি ছেলাম না বাড়িতে, প্যায়দা কেনে উঠোনে দাঁড়িয়ে হাসছিল মহাশয়?

বড়বাবু এবার কঠিন দৃষ্টিতে চাপরাসীটার দিকে চাহিলেন। কর্তাবাবু বিচিত্র মানুষ, তিনি এক কথায় ব্যাপারটাকে চাপা দিয়া বলিলেন, তোর বউকেও আজ থেকে কাজ করতে হবে এখানে, বুঝলি? সকালবেলা থেকে খোকাকে নিয়ে থাকবে। আর দুপুরবেলায় তুই গরু নিয়ে যাবি মাঠে, ঝুড়ি নিয়ে বউ যাবে তোর সঙ্গে, গোবর কুড়িয়ে মাঠে জড়ো করবে। বুঝলি? দুবেলা খেতে পাবে, বছরে পুজোর সময় একখানা কাপড়।

সনাতন উল্লাসে যে কি করিবে খুঁজিয়া পাইল না। গোয়ালবাড়িতে

আসিয়া বড় মহিষটার গলা ধরিয়া দশটা চুমা খাইল, খানিকটা নাচিল, ভেড়ার পালের মেড়াটার সঙ্গে চুঁ খেলিয়া উপর-হাতের পেশীতে কালসিটে পড়াইয়া ফেলিল। আঃ কর্তাবাবুকে কাঁধে করিয়া সে যদি নাচিতে পাইত! অথবা বাবুর পায়ের তলাটা যদি জিব দিয়া চাটিতে পাইত! সে ছুটিয়া গিয়া নন্দকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিল।

অতর্কিত আকর্ষণে নন্দ বিব্রত এবং বিরক্ত হইয়া গালিগালাজ আরম্ভ করিল, কিন্তু সনাতন সে গ্রাহ্যই করিল না।

ইহার পর নন্দ সকাল হইতে বড়বাবুর খোকাকে—শিবনাথের বাপকে লইয়া বসিয়া থাকিত, খেলা দিত। সনাতন কাজ করিত, মধ্যে মধ্যে খোকাকে কাঁধে লইয়া নাচিত, কখনও কখনও খোকার পিঠে মৃদু মৃদু কিল চড় মারিত, কান মলিয়া দিত, বলিত, দু-চার ঘা মেরে রাখি নন্দ, বড় হ'লে তখন তো চোখ লাল করবে, দেবে কষে জুতোর বাড়ি।

দুপুরে নির্জন উদাসীর প্রান্তরে সনাতন বটগাছতলায় বসিয়া থাকিত; নন্দ তাহার পাচনি লাঠিটা লইয়া গরু-মহিষগুলাকে আগলাইয়া ফিরিত। লাঠি হাতে নন্দকে এমন সুন্দর মানাইত! খাটো মোটা কাপড় পরা, মাথায় খাটো নন্দর হাতে সনাতনের লাঠিগাছটা নন্দর মাথার উপরেও খানিকটা উঠিয়া থাকিত। নন্দ নির্ভয়ে প্রকাণ্ড কালো মহিষ দুইটাকে দুমদাম করিয়া পিটিত। কখনও কখনও সে সুকৌশলে উঠিয়া বসিত মহিষের পিঠে, মহিষটা চলিত, নন্দ এমন দুলিত সেই চলার সঙ্গে সঙ্গে যে, সনাতনও ছুটিয়া গিয়া চড়িয়া বসিত অন্য মহিষটার পিঠে।

মহিষের পিঠের উপর হইতেই নন্দ প্রথম দিনই চীৎকার করিয়া উঠিল, সাপ! আলান!

প্রকাণ্ড বড় এক আলান—অর্থাৎ আল কেউটে চলিয়া যাইতেছিল, নন্দর চীৎকারে সেটা অল্প মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। সনাতন দেখিয়া নির্বিকার চিত্তে হাসিয়া বলিল, ওর নাম কালকুটি, কিছু বলে না বুড়ী। বুঝলি, ওকে যেন মারতে-টারতে যাস না। তারপর সে হাতে তালি দিয়া বলিল, যা যা বুড়ী, চলে যা।

সাপটা আর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সনাতন এখানকার কীট-পতঙ্গটিকেও চেনে। ওই প্রকাণ্ড বড় কেউটেটার রীতিনীতি, গতিবিধি সব তাহার সুবিদিত, এমন কি কালকুটির গর্তটাও সে

চেনে। কালকুটির বহু শাবককে সে হত্যা করিয়াছে। সেগুলার স্বভাব মায়ের মত নয়। সনাতন জানে, বয়স হইলে উহারাও এমনই ধীর স্থির হইবে, কিন্তু বয়স হইতে হইতে যে কত জীবজন্তু মানুষ মারিবে তাহার কি ঠিক আছে? আষাঢ় মাসের প্রথম হইতেই সে সন্তর্পণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে গর্তটার আশেপাশে। সহসা একদিন দেখা যায়, কালো সর্পশিশুতে চারিপাশ ভরিয়া গিয়াছে। সাপের ডিম, গরম-খোলায়-দেওয়া ধান হইতে খইয়ের মত ফোটে যে! ডিম ফাটিয়া ছটকাইয়া বাহির হয় সাপের বাচ্চা। নহিলে উহাদের মা ওই কালকুটিই যে খাইয়া ফেলিবে উহাদের। গর্তের ভিতরে উদ্যত গ্রাসে বসিয়া থাকে কালকুটি, উপরে থাকে সনাতন লাঠি লইয়া। তবুও যাহারা বাঁচিয়া যায়, তাহারা বড় হইয়াও প্রাণ দেয় সনাতনের হাতে।

নন্দ সেদিন কালকুটিকে চিনিল, ক্রমে ক্রমে আরও অনেককে চিনিল, কত নূতনকে আবিষ্কার করিল; প্রজাপতির ডিম সনাতন চিনিত না, সে জানিত সেগুলা মরা কাচপোকা, নন্দ সনাতনকে চিনাইয়া দিল। দুইজনে মিলিয়া গোবর কুড়াইয়া বানাইয়া তুলিল প্রায় একটি পাহাড়।

কর্তাবাবু খুশি হইয়া গোটা একটা টাকা বকশিশ দিলেন। সনাতন সেদিন নন্দকে আদর করিল, তু আমার আনার ঘরের আলো।

নন্দ অবাক হইয়া গেল।

সনাতন সেই দিনই কথাটা শিখিয়াছে বড়বাবুর কাছে। পূজার কাপড়ের প্রকাণ্ড গাঁটরি মাথায় সনাতন বড়বাবুর সঙ্গে বাড়ির ভিতর গিয়াছিল। বড়গিন্নী অন্ধকার বড় ঘরের দরজা খুলিয়া বলিয়াছিলেন, দাঁড়াও, আলো জেলে দিই।

বড়বাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, দরকার নেই, তুমি আমার আঁধার ঘরের আলো!

কথাটা সনাতনের বড় ভাল লাগিয়াছে।

... ...

বছর দশেক পরে সেই নন্দ একদিন সনাতনকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, সন্তান প্রসব করিতে গিয়া মারা পড়িল। সনাতনের সে অবস্থা বর্ণনার অতীত; কর্কশ উচ্চকণ্ঠের কুণ্ঠাহীন আর্ত চীৎকারে সমস্ত গ্রামখানাকে নিশীথরাত্রে সচকিত করিয়া তুলিয়াছিল।

কর্তাবাবু তখন মারা গিয়াছেন, বড়বাবু তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়াছিলেন,

সেই লোকের সঙ্গে শিবনাথের বাবাও গিয়াছিলেন। সনাতনকে তিনি বড় ভালবাসেন, সে তাঁহাকে মানুষ করিয়াছে। শবদেহের পাশে একটি কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছিল, উঠানে সে আলো বিশেষ আসিয়া পড়ে নাই, অন্ধকার উঠানে অসুরের মত প্রশস্ত প্রকাণ্ড বুকে বাঘের থাবার মত হাত চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া যাইতেছে সনাতন।

সৎকার করিয়া পরদিন সে যখন মনিব-বাড়িতে আসিল, তখন চোখ দুইটা তাহার কুঁচের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সকলে ভাবিল, সনাতন পাগল হইয়া যাইবে।

সেইদিন গভীর রাত্রে সে যখন ছুটিয়া আসিয়া কাছারির দাওয়ার চাপরাসীটার পাশে আসিয়া হাঁপাইতে আরম্ভ করিল, তখন পাগল হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া চাপরাসীটা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সনাতন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, নন্দ, প্যায়দা, নন্দ বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াইছে!

মাস-খানেক পরেই একদিন সকালে চাপরাসীটা বলিল, সনাতন আসে নাই।

বড়বাবু বলিলেন ডেকে নিয়ে আয়।

চাপরাসীটা বলিল, আজ্ঞে রাত্রে উঠে সে কোথা চলে গিয়েছে। এইখানে আমার কাছেই তো শোয় এখন, ভোররাত্রে উঠে গেল, তারপর আর আসে নাই।

কড়া মেজাজের মানুষ বড়বাবুও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।—নন্দর শোকে সনাতন দেশত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু পরের দিনই সনাতন ফিরিয়া আসিল।

চাপরাসীটা প্রশ্ন করিল, কোথায় গিয়েছিলি?

সনাতন জবাব দিল, গেয়েছিলাম যেখানে মন হয়েছিল।

আবার দিন দুই পরে দেখা গেল, সনাতন নাই। সেদিন সন্ধ্যা হইতেই সে নিখোঁজ। যে সনাতন নন্দর প্রেতাত্মার ভয়ে সন্ধ্যাতেই ভয়কাতর শিশুর মত অসহায় হইয়া পড়ে, সে রাত্রির অন্ধকারেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

চার দিন পরে সে ফিরিল। বড়বাবু এবার রুষ্টভাবেই বলিলেন, এমন করবি তো কাজে জবাব দে। সন্ন্যাসী হতে চাস তো সন্ন্যাসীই হয়ে যা। আর নয় তো আবার বিয়ে-থা ক'রে ঘরসংসার কর, কাজকর্ম কর।

সনাতন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বড়বাবু বলিলেন, কি বলছিস ?

নখ দিয়া দেওয়াল খুঁটিতে খুঁটিতে সনাতন বলিল, আজ্ঞে—

বুঝলি আমার কথা ?

ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া সনাতন আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। একেবারে সটান অন্দরে আসিয়া বড়গিন্নীর সম্মুখে জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

দু কুড়ি টাকা আপনি ভান। নইলে বড়বাবুকে বলে ভান।

বড়গিন্নী সবিস্ময়ে বলিলেন, দু কুড়ি টাকা নিয়ে কি করবি তুই ? তীর্থ যাবি নাকি ?

সনাতন মাথা চুলকাইয়া বলিল, বড়বাবু বলছেন বিয়ে করতে।

বিয়ে করতে!—সস্নেহে হাসিয়া বড়গিন্নী বলিলেন, ভালই বলেছেন রে! মরণকে ঠেকিয়ে তো সংসার করা যায় না বাবা, তার জন্যে বিবাগী হ'লে কি চলে ?

পরম আগ্রহে সম্মতি জানাইয়া সনাতন বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

খুশি হইয়াই গিন্নী বলিলেন, বেশ, কনে ঠিক কর, টাকার জন্যে বলব আমি বড়বাবুকে।

আজ্ঞে, কনে আমি ঠিক করেছি, টাকা হলেই হয়।

বাড়ির মেয়েরা বিস্ময়ে চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া কলরব করিয়া উঠিল, ও মাগো!

কোথায় রে, কোথায় ? কবে ঠিক করলি রে এর মধ্যে ?

কেমন কনে রে ? কত বড় ? দেখতে কেমন ?

সনাতন বসিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে পুলকিত লজ্জার সহিত সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিল।

মেয়েটির বাড়ি ক্রোশ খানেকের মধ্যেই—যুগলপুরে। অনেক দিন হইতেই সনাতন চেনে। হাটে সে নিয়মিত আসে। সনাতন বলিল, কনে আজ্ঞে ভারী সোন্দর। আর বয়েস—তা খানিক হবে বইকি।

সনাতন বর্ণনায় অতিরঞ্জন করে নাই। মেয়েটি সত্যই সুন্দর দেখিতে। বর্ণে সে গৌরী, মুখশ্রীতে লাবণ্যময়ী, কেবল চোখ দুইটি খয়রা রঙের, গঠনে সে দীর্ঘাঙ্গী, বয়সে বাইশ চব্বিশ। সনাতন বৈরাগ্যের বশে মধ্যে মধ্যে নিখোঁজ হয় নাই, মেয়েটির প্রেমের আকর্ষণেই সেখানে ছুটিয়া গিয়া পড়িতেছিল।

মেয়েটি সধবা। অনেক কাণ্ডের পর তাহার স্বামী দুই কুড়ি টাকার বিনিময়ে তাহাকে ছাড়পত্র দিতে রাজী হইয়াছে। সেদিন রাত্রে তাহাদের দুইজনকে একত্র পাকড়াও করিয়া সনাতনকে তাহারা দুরন্ত প্রহার দিয়াছিল। সনাতন সে গ্রাহ্য করে নাই, মার খাইয়াও স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে ছেড়ে দিস তো দে, লইলে আমি নিয়ে পালাব। শুধো কেনে ওকে—উ-ও থাকবে না তোর কাছে।

মেয়েটার লজ্জার আবরণ নিঃশেষে খসিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর মার খাইয়া সে উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সেও বলিয়াছিল, আজই যাব আমি উয়োর সঙ্গে।

শেষ পর্যন্ত কুড়ি টাকায় সনাতন রফা করিয়া আসিয়াছে।

... ...

আবার সনাতন ঘর বাঁধিল, সংসার পাতিল। নিজের ঘর ছাড়িয়া সে নূতন ঘর তৈরি করিল বাবুদের গোয়াল-বাড়ির পাশেই। পুরানো বাড়িতে নন্দ ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন দিন রাত্রে কড়িকাঠে বসিয়া সে যদি তালগাছের মত মোটা পা বাহির করিয়া ঘুমন্ত অবস্থায় বুকে চাপাইয়া দেয়, তবে—? ঝাঁকড়া চুল ভর্তি মাথাটা বারবার নাড়িয়া সনাতন আতঙ্কে অস্থির হইয়া উঠে। তাই সে নূতন করিয়া ঘর গড়িল—সে ঘরে নন্দর এতটুকু জিনিসও সে রাখিল না, আপনার সামগ্রীর লোভে নন্দ যে নিশ্চয় এখানে আসিয়া হাজির হইবে।

নূতন বউয়ের নামটিও বড় ভাল, পেরভাতী, অর্থাৎ প্রভাতী। মেয়েটি কিন্তু বিলাসিনী। চলনে-বলনে, আচারে-রুচিতে, পোশাকে-প্রসাধনে সনাতনের বিপরীত। মেয়েটি চলে হেলিয়া দুলিয়া, কথা কহিতে হাসিয়া ভাঙিয়া পড়ে, পোড়ানো সামগ্রী তাহার মুখে রোচে না, সে পান খায়, দোক্তা খায়, কাপড় পরে পা ঢাকিয়া পরিপাটি ছাঁদে, চুল বাঁধে বাবুদের বাড়ির মেয়েদের মত 'আলবোট' কাটিয়া। অথচ সনাতন ভালবাসে পোড়ানো জিনিস খাইতে, সে ভালবাসে খাটো মোটা কাপড় আঁটসাঁট করিয়া পরিতে, রুক্ষ চুল টানিয়া মাথার উপর ঝুঁটি-খোঁপা তাহার সবচেয়ে ভাল লাগে। নন্দর মত গোবর প্রভাতী কুড়াইবে না। ছেলের ঝি হইতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু বাবুদের বাড়িতে শিশু ছেলেও কেহ নাই।

তবুও সনাতন অবনত মস্তকে মন্ত্রমুগ্ধের মত পেরভাতীর আনুগত্য স্বীকার

করিল। প্রভাতীর মনোরঞ্জনের জন্য এখানে ওখানে ঋণ করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে মনিব-বাড়ির কাজের উপর আর একটা কাজ লইল; ও পাড়ার হীরু চাটুজ্জে বিদেশে চাকরি করে, এবার সে মেয়েছেলে লইয়া গিয়াছে, রাত্রে তাহার বাড়িতে পাহারা দিবার কাজ লইল সনাতন। প্রভাতীকে সঙ্গে লইয়া সে সন্ধ্যার পর চাটুজ্জে-বাড়ি যাইত। আবার ভোর-বেলায় উঠিয়া চলিয়া আসিত।

মাস কয়েক পর—

সেদিন পেরভাতী কোন ভদ্রলোকের বধূ বা কন্যার পরনের শাড়ি দেখিয়া বলিল, ওই শাড়ি আমার চাই।

সনাতন মাথায় হাত দিয়া বসিল। মনিব-বাড়িতে বিবাহের ঋণ জমিয়া আছে, এখানে-ওখানে ঋণ করিয়াছে সেও শোধ হয় নাই, এখন টাকা কোথায় মিলিবে? ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আসিল ছোটবাবু অর্থাৎ শিবনাথের বাপের কাছে। ছোটবাবুকে নন্দ ও সে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, আর ছোটবাবু এখনও পুরা বাবু হইয়া উঠে নাই, জুতা মারিবার বয়স হয় নাই; সনাতন ছোটবাবুর পায়ের কাছে বসিয়া পা টিপিতে টিপিতে সলজ্জভাবেই কথাটা ব্যক্ত করিল।

ছোটবাবুও একটু লজ্জিত হইলেন, টাকা তো আমার কাছে নেই সনাতন।

গিন্নীমাকে চাও। নয়তো বউরানীর কাছে লাও। আমাকে কিন্তুক দিতে হবে ছোটবাবু। ছোটবাবুর তখন বিবাহ হইয়াছে, দশ-এগারো বছরের বধূ।

আচ্ছা, কাল বলব তোকে।

সনাতন খুশি হইয়া আসিয়া পেরভাতীকে বলিল, কাল।

পরদিন সকালেই ছোটবাবু টাকা লইয়া গিয়া অবাক হইয়া গেলেন। সনাতন বসিয়া আছে, তাহার সে মূর্তি অদ্ভুত। চোখ দুইটা রাঙা, মুখখানা ভীষণ, আর প্রভাতী দাওয়ার উপর পড়িয়া আছে উপুড় হইয়া অসম্বৃত বেশে অনাবৃত গৌরবর্ণ পিঠখানায় প্রহার-চিহ্ন রক্তমুখী হইয়া ফুটিয়াছে।

ছোটবাবু প্রশ্ন করিলেন, কি হয়েছে সনাতন?

সনাতন গর্জন করিয়া উঠিল, আজ আধ-মরা ক'রে ছেড়েছি, একদিন কিন্তুক নিদম মেরে ফেলাব ছোটবাবু।

প্রভাতীর পিঠের প্রহারচিহ্নগুলি দেখিয়া ছোটবাবু সনাতনকেই তিরস্কার করিলেন, ছিঃ, এমনই ক'রেই কি মারে রে!

প্রভাতী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, সনাতন গর্জন করিয়া বলিল, রেতের বেলায় চাটুজ্জের বাড়িতে আমাকে একখানা বস্তা দিয়ে বলে কি, বাথার থেকে ধান বার ক'রে লে। আমি চুরি করব ছোটবাবু!

ছোটবাবুর মনে পড়িল ছেলেবেলার কথা। তাঁহাদের বাড়ির আমগাছটায় আম পাকিত সকল গাছের আগে। যতটি আম গাছ হইতে পড়িত সনাতন কুড়াইয়া বাড়িতে দিয়া আসিত, কখনও তিনি সনাতনকে কুড়াইয়া লইয়া আম খাইতে দেখেন নাই। একবার তিনি চাহিয়াছিলেন একটা আম। সনাতন বলিয়াছিল, বাড়িতে লেবা।

ছোটবাবু কাপড়ের টাকা দিতে গেলে সনাতন লইল, বলিল, এক ছুঁচ ওকে আমি দোব না।

প্রভাতীও সহ্য করিবার মেয়ে নয়; মাস খানেক পরে সে পলাইয়া গেল বাবুদের বাড়ির চাপরাসীটার সঙ্গে—সনাতনের যথাসর্বস্ব লইয়া নিরুদ্দেশ হইল। শুধু তাই নয়, সনাতনকে পাওয়া গেল আহত রক্তাক্ত অবস্থায়। বঁটির একটা কোপ তাহার ঘাড়ে বসাইয়া দিয়াছিল। দশ দিন অচেতন অবস্থায় থাকিয়া সনাতন বাঁচিল। সে দশ দিন অচেতন সনাতনের কি চীৎকার!

নিশীথরাত্রে ঘুমন্ত মানুষ শিহরিয়া জাগিয়া উঠিয়া শুনিত, সনাতন যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে—আঁ—আঁ—আঁ—।

দশ দিন পর চেতনা পাইয়া সনাতন বড়বাবুকে সম্মুখে দেখিয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ওগো বড়বাবু গো! আমি আর বাঁচব না গো!

তাহার সে কাতরতায় বড়বাবুও বিচলিত হইলেন, সনাতন তাঁহাকে বাঘের মত ভয় করে, আজ সে তাঁহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে একান্ত আপন জনের মত।

ছোটবাবুকে সে বলিল, বাঁচি তো আর মেয়ের মুখ দেখব না ছোটবাবু।

সনাতন বাঁচিল।

... ...

সনাতন বাঁচিল এবং মাসখানেক না যাইতেই আবার বিবাহ করিল। অত্যন্ত কুৎসিতদর্শনা একটা মেয়ে। অতুল স্বাস্থ্য এবং আকারে সে সনাতনেরই

যোগ্যা। কর্তাবাবু সনাতনের নাম দিয়াছিলেন—অসুর, এবার ছোটবাবু সনাতনের নূতন বধূর নাম দিলেন—হিড়িম্বা।

সনাতন অতি সলজ্জভাবে পুলকিত হইয়া হাসিল।

নূতন বধূটিও হাসিল—হি হি করিয়া হাসিল—নির্বোধের মত হাসি দেখিয়া ছোটবাবুর গা ঘিনঘিন করিয়া উঠিল—হাসির সঙ্গে মেয়েটার মুখ দিয়া লালা গড়াইয়া পড়ে। কিন্তু হিড়িম্বা অদ্ভুত, কিছু দিনের মধ্যেই সে সনাতনকে ঠাকুর করিয়া তুলিল। সনাতনকে সে সকালবেলায় গোয়াল পরিষ্কার করিতে গোবর ঘাটিতে দেয় না, নিজেই সে গোবর পরিষ্কার করে, নন্দর মত সেও ঝুড়ি লইয়া সনাতনের সঙ্গে মাঠে যায়, সেখানে সনাতন ঘুমায়—একা হিড়িম্বা গরু মহিষ আগলায়, গোবর কুড়ায়, কুঁচিকাঠি সংগ্রহ করে, জ্বালানী কাঠ জড়ো করে। জ্বালানী কাঠের জন্য অবলীলাক্রমে সে তালগাছে উঠিয়া যায়। কুঁচি-কাঠি বিক্রি করিয়া সে পয়সা আনে, বাড়িতে ঘুঁটে দিয়া—ঘুঁটে হইতেও মাসে এক টাকা দেড় টাকা হয়।

সনাতনের অদৃষ্ট! এই হিড়িম্বাও তাহার অদৃষ্টে সহ্য হইল না; অদৃষ্টের তাড়নায় সে নিজেই একদিন দুর্দান্ত প্রহার দিয়া শেষে গলায় হাত দিয়া হিড়িম্বাকে বাহির করিয়া দিল।

হিড়িম্বার সে কি কান্না!

ছোটবাবু মধ্যস্থতা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হিতে বিপরীত হইয়া গেল।

সনাতন বলিল, সন্দেশের রস রাক্ষুসী চুষে মেরে দিলে!

সনাতন কয়েকটা রসগোল্লা কিনিয়া আনিয়াছিল, হিড়িম্বা লোভের বশে গোপনে রসগোল্লাগুলি চুষিয়া খাইতেছিল, সনাতন সেটা দেখিয়া ফেলিয়াছে।

ছোটবাবু হাসিয়া ফেলিলেন।

সনাতন বলিল, ভাত ডাল যা হয় ঘরে আগে-ভাগে চুরি করে খায়! মারের চোটে আজ নিজেই বলেছে।

ছোটবাবু বলিলেন, আচ্ছা, আর খাবে না।

তবুও সনাতন অটল। বলিল, উওর এত বড় বাড়, আমাকে 'মর' বলে! আমি মরব! আমি ম'রে যাব ছোটবাবু!

ছোটবাবু হাসিলেন, আবার খানিকটা বিরক্তও হইলেন। 'মর' বললেই কি মানুষ মরে সনাতন?

বার বার ঘাড় নাড়িয়া সনাতন তবুও বলিল, আজ্ঞে না। আমাকে 'মর' বললে উ!

এবার ধমক দিয়া ছোটবাবু বলিলেন, 'মর' বললে তো হ'ল কি? তুই অমর নাকি? মরবি না তুই?

ছোটবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া সনাতন বলিল, আপুনি আমাকে 'মর' বলছ ছোটবাবু!

সে এতদিনের মনিব-বাড়ির কাজে জবাব দিয়া সেই দিনই কোথায় চলিয়া গেল।

... ...

ফিরিল সে দীর্ঘদিন পর। আজ হইতে বৎসর খানেক আগে। তখনও সে সমর্থ, এত বড় দেহ আশির উপর বয়সেও প্রায় সোজাই আছে; অল্প একটু নমিত হইয়াছে মাত্র, আর চলিবার গতি মন্থর হইয়াছে।

এক মাথা পাকা চুল, প্রকাণ্ড বড় পাকা গোঁফ, স্থবির অসুরের মত দেহ, সনাতন একেবারে মনিব-বাড়ির অন্দরে আসিয়া ঢুকিয়াছিল। কাছারিতে যাইতে সাহস হয় নাই। এই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির কি কৈফিয়ৎ দিবে বড়বাবুর কাছে! ছোটবাবুর সম্মুখে মুখ দেখাইবে কি করিয়া!

শিবনাথের বধূ শিবনাথের ভগ্নী সকলে বিস্ময়ে চকিত হইয়া উঠিল। সনাতনও হতভম্ব হইয়া গেল। কাহাকেও সে চেনে না, ইহারা সব কে?

শিবনাথের মা আসিয়া, অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি সনাতন? বালিকা-বয়সে তিনি তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তিনি এ বাড়িতে আসিবার পর, বৎসর দুয়েক সনাতন এ বাড়িতে ছিল; কিন্তু তবু তিনি তাহাকে চিনিলেন, সনাতনের আকৃতির জন্য।

সনাতন একমুখ হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকরুন। একবার গিন্নীমাকে আর বউ-ঠাকরুনকে ডেকে ছান তো। বলেন—সনাতন আইচে।

শিবনাথের মা অল্প হাসিয়া বলিলেন, আমিই বউ-ঠাকরুন সনাতন। গিন্নীমা তো নেই।

সনাতন নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই প্রৌঢ় বিধবা—তাহার ছোটবাবুর কচি বউটি! গিন্নীমা নাই! তবে কি, তবে কি—! সে দ্রুত উঠিয়া কাছারি-বাড়িতে আসিল।

শিবনাথ নূতন, নায়েব নূতন, চাপরাসী নূতন, চাকর নূতন—সকলে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কে তুমি ?

সনাতন চারিদিক খুঁজিতেছিল। কোন উত্তরই সে দিল না। উত্তর দিলেন শিবনাথের মা। তিনি তাহার পিছন পিছন আসিয়াছিলেন। সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, শিবু, এই সনাতন। সনাতনকে বলিলেন, সনাতন, এই আমার ছেলে।

সনাতন এতক্ষণে প্রশ্ন করিল, বড়বাবু নাই ? ছোটবাবু নাই ?

... ...

গোয়াল-বাড়ির একখানা খালি ঘরে সনাতন আশ্রয় হইল। শিবনাথের বাড়িতেই অন্নের বরাদ্দ করিয়া দিলেন শিবনাথের মা। প্রথম দিনই পাচিকা ভাত দিয়া গালে হাত দিল। সনাতন ভাত লইল তিন বার। শিবনাথের মা হাসিলেন। সনাতনের আহার এখনও প্রায় সমানই আছে। খাইতে বসিলে শিবনাথের মা প্রশ্ন করিলেন, কোথায় ছিলে সনাতন ?

প্রকাণ্ড হাতে বিপুল এক গ্রাস ভাত তুলিয়া সনাতন বলিল, দু তিন জায়গায় মা।

ছেলেপুলে কি ? ঘরকন্না করেছ ?

বাঁ হাতে মাথা চুলকাইয়া সনাতন বলিল, ছেলে অ্যানেকগুলান মা। তিনটে পরিবারের ছেলে।

আরও তিনবার বিয়ে করেছিল !

মেয়েরা সকৌতুকে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সনাতন বলিল, হ্যাঁ মা। তা সে সব চুকিয়ে দিয়েছি। ছাড়পত্র করে সব তাড়িয়ে দিয়েছি।

সনাতনের এখনকার ইতিহাস এ বাড়ির সকলেই জানে ; সনাতন এ বাড়ির কাহিনীর মানুষ। শিবনাথের বোন মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিয়া বলিল, এইবার আবার ঘর-দোর পাতাও সনাতন। আপন ভিটেতে ঘর কর, বিয়ে কর।

সনাতন নির্বোধের মত খানিক হাসিয়া বলিল, আর লয় মা। সে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

উদের তাড়িয়ে দিলে কেন বাবা ?

আর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সনাতন বলিল, সবাই মরণ তাকায় মা। মর, মর, মর—ছাড়া বাক্যি নাই, তিনটে বউয়েরই ওই এক রা।

সনাতন তৃতীয় বারের ভাতটা আর শেষ করিতে পারিল না।

ভাতের অপচয়ে লজ্জিত হইয়া সে বলিল, খেতে পারি না। ই ভাত কটা আমি খাই। তা আজ লারলাম।

সনাতন বাড়িতে থাকিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত; মধ্যে মধ্যে গ্রাম প্রান্তর ঘুরিয়া আসিত।

উদাসীর ডাঙায় দীর্ঘ দিন ঘুরিয়াও সে কালকুটিকে দেখিতে পাইল না।

মধ্যে মধ্যে ডাক্তারখানায় গিয়া ওষুধ লইয়া আসিত। তাহার ক্ষুধা হয় না।

আজ কয়েকদিন সনাতন বিছানাতেই শুইয়া আছে। খাবার পাঠাইয়া দিলে অল্প-স্বল্প খায়, না পাইলেও চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। অভাবও বোধ করে না।

শিবনাথের মা এ অঞ্চলের প্রবীণ বিচক্ষণ ডাক্তার ননীবাবুকে ডাকাইয়াছিলেন। ননীবাবু হাসিয়া বলিলেন, কালরোগ।

শিবনাথ দেখিতে গেল।

কঙ্কালসার সনাতন জীর্ণ পরিত্যক্ত ঐতিহাসিক পাষাণ-দুর্গের মত পড়িয়া আছে। মোটা মোটা হাড়গুলা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সে দিগন্তের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চাহিয়া আছে। শিবনাথের মা সেখানে ছিলেন, তিনি ডাকিতেছিলেন—সনাতন! সনাতন!

সনাতন যেন শুনিতে পাইতেছে না।

শিবনাথ কাছে আসিয়া কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া ডাকিল, সনাতন! সনাতন!

এবার সনাতনের দৃষ্টি ফিরিল, সে দৃষ্টি যেন কিছু খুঁজিতেছে, কিন্তু খুঁজিয়া পাইতেছে না।

সনাতন!

এবার দৃষ্টি শিবনাথের দিকে রাখিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, দেখতে পেছি না। সে হাতের ক্ষীণ ইঙ্গিতে ডাকিল, আরও কাছে এস। শিবনাথ সরিয়া গেল।

খোকাবাবু!

হ্যাঁ। কেমন আছ?

ভাল আছি।

কি কষ্ট হচ্ছে তোমার?

ঘাড় নাড়িয়া সনাতন জানাইল, কিছু না। তারপর ক্ষীণস্বরে বলিল, দেখতে পেছি না ভাল, শুনতি পেছি না।

শিবনাথের মা এবার বলিলেন, ভয় নেই সনাতন। সেখানে তোমার নন্দ আছে, কর্তাবাবু আছেন, বড়বাবু আছেন, গিন্নীমা আছেন, ছোটবাবু আছেন—

সনাতন কাহারও সন্ধানে কোন দিকে চাহিল না—শিবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, অন্নকার!

অর্থাৎ, অন্ধকার।

রসকলি

পাল-পুকুরের ঘাটের উপরেই প্রকাণ্ড বটগাছটার একটা শিকড় বিশাল অজগরের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া গর্তের ভিতর মুখ সেঁধাইয়া যেন পিঠে রোদ পোহাইতেছে। পুলিন দাস তাহার উপর হাঁটুভাঙা দয়ের মত উবু হইয়া বসিয়া জলে খোলামকুচি ছুঁড়িয়া 'ব্যাং ছুড়ছুড়ি' খেলিতেছে। তাহার কাঁধে গামছা, কানে একটা পোড়া বিড়ি।

মিতে বলাই দাস আসিয়া ডাকিল, এই যে পেলা, উঠে আয়। ওরে ও খেপাচণ্ডী, উঠে আয়। খুড়ো যে—

পুলিন হাতের খোলামকুচিটা জলের পরিবর্তে মাটিতে আছড়াইয়া কহিল, টেঁসেছে বেটা বুড়ো?

বলাই সোৎসাহে কহিল, আর দেরি নাই, উঠে আয়।

উভয়েই গ্রামের পথ ধরিল, বলাই আগে, পুলিন পিছনে।

পুলিন সহসা কহিল, বউটা খুব কাঁদছে, নয় রে বলা?

বলা কহিল, খু-উ-ব, আছাড়-বিছেড় করছে।

মাথাটা তাহার প্রায় ঘাড়ের নিকটে হেলিয়া পড়িল, ঠোঁট দুইটা চিবুক পর্যন্ত বাঁকিয়া গেল।

আবার উভয়েই নীরব, রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছে। একটা গাই রাস্তার ধারে পতিত জমিতে লম্বা দড়িতে বাঁধা, ঘাস খাইতেছিল। জানি না, পুলিন কোন্ কৌতুকে চট করিয়া বাঁ হাতের দুইটা আঙুলে গাইটার পিঠটা টিপিয়া ঘড়-ড়-ঘোঁৎ শব্দে নাসিকা-গর্জন করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে গাইটাও মাথা নাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল।

পুলিন সলজ্জে হাত দুই সরিয়া আসিয়া কহিল, মাইরি, কি ত্যাজ রে! আমার বউটাও ঠিক এমনই, মাথা নেড়েই আছে।

পুলিনচন্দ্রের এক দেহশ্রী ভিন্ন আর কিছুই প্রশংসা করিবার মত ছিল না।

তাহার দেহখানি সুন্দর, দীর্ঘ আকার, সবল দেহ, বর্ণ গৌর, কোঁকড়া চুল, আর সর্বাঙ্গ বেড়িয়া বেশ একটি মিষ্ট লাবণ্য। এ ছাড়া আর কোন গুণই ছিল না। বুদ্ধির খ্যাতি তো কোন কালেই নাই, বাল্যকালেই পাঠশালায় গুরুমহাশয় 'এক পয়সায় তিনটে আম, তা তিনটে আমের কত দাম' ঝাড়া তিনটি ঘণ্টাতেও বুঝাইতে না পারিয়া নিজেই তাহার বই-দপ্তর গুছাইয়া বগলে পুরিয়া দিয়া কহিয়াছিলেন, বাবা, শুভঙ্কর যে এ জন্মে বৈরাগী-কুলে জন্ম নিয়ে হিসেবে পর্যন্ত বৈরাগ্য করেছেন, তা জানতাম না। তোমায় পড়ানো আমার কর্ম নয়।

ইহার পর সে ছিল যেন মূর্তিমান বে-তাল।

মজলিশে হয়তো লঙ্কাকাণ্ডের মত ভীষণ গম্ভীর আলোচনা চলিতেছে, বুড়া জাম্বুবান হয়তো মন্ত্রণা দিতেছে, মজলিশসুদ্ধ লোক স্তম্ভিত, নিস্তব্ধ, সহসা সেখানে পুলিনচন্দ্র যেন কৌতুকের কাতুকুতুতে গুলগুল করিয়া হাসিয়া উঠে—হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ, এ মাইরি আমার খুড়োকে লিখেছে, তেমুণ্ডে বুড়ো—ইয়া চুল, দাড়ি, ঠিক ঠিক, জাম্বুবান, জাম্বুবান—হেঁ-হেঁ-হেঁ হেঁ!

আবার হয়তো হনু-ভানুর মিতালির রঙ্গে মজলিশ তো মজলিশ, দেবগণ পর্যন্ত হাসিয়া আকুল, সেখানে পুলিন বিস্ময়ে হতবাক, চক্ষু দুইটা ছানাবড়ার মত বিস্ফারিত, পাশের লোককে বলে, কি মাইরি যে হাসিস, তার ঠিক নাই। তাঃপর সোৎসাহে বাহবা দেয়, বলিহারি বাপ হনু, বাবুদের প্যায়দার চেয়েও তুমি জিন্দে পালোয়ান।

গ্রন্থকারও বাদ যান না, পুলিন কহে, বইটার কিন্তু ভারি চহট মাইরি, এ একবারে অবাক-জলপান লাগিয়ে দিয়েছে!

আবার রাবণ-বধে সীতা-উদ্ধারে আনন্দিত শ্রোতৃমণ্ডলী আবেগে জয়ধ্বনি করিয়া উঠে। বিচিত্র পুলিন, বিচিত্র তাহার রসবোধ, সে সজল চক্ষে বলে, আহা-হা, এতগুলো বেধবা হ'ল, আহা-হা!

আবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যগ্র অনুসন্ধানে কহে, আচ্ছা, লঙ্কায় তাহ'লে মাছের সের কত ক'রে হল? এক পয়সা, না দু পয়সা?—তা লেখে নাই?

লোকে তাই বুদ্ধিহীনের উপর রঙ চড়াইয়া কহে, ক্ষ্যাপা।

পুলিন রাগে না, হাস্তমুখে উত্তর দেয়, অ্যা !

রাগে একজন, আর লজ্জায় দুঃখে মরিয়া যায় আর একজন। দুইজনের প্রথমটি পুলিনের স্ত্রী, বয়স আঠারো-উনিশ, গোলগাল আঁটসাট দেহ, নাম গোপিনী।

কিন্তু পুলিন কহে, সাপিনী। পুলিনের নির্বুদ্ধিতার লজ্জায়, খোঁচায় গোপিনী রাগে সাপিনীর মতই গর্জায়। কথাগুলিও বাহির হয় সাপিনীর জিহ্বার মতই, লকলকে তীক্ষ্ণ ভয়াবহ। নির্বোধ, সর্বজনের হাস্যাস্পদ স্বামীর ঘরে শত লজ্জার মধ্যেও সান্ত্বনার একটি আশ্রয় গোপিনীর মিলিয়াছিল, সে ওই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি, যে পুলিনের জন্য লজ্জায় দুঃখে মরমে মরিয়া থাকিত ; সে পুলিনের বৃদ্ধ খুড়া রামদাস মোহান্ত, যাহার সহিত পুলিন জাম্বুবানের সাদৃশ্য দেখিতে পায়।

রামদাসের অবস্থা বেশ ভালই, মোটা জোতজমা উঠানে বড় বড় মরাই, ঘরে দুগ্ধবতী গাভী, গ্রামে দু-দশ টাকার তেজারতি।

তবে তাহার চেহারাটা আজ শুধু চুল-দাড়ির জন্যই নয়, চিরকালই কেমন বেয়াড়া বিশ্রী ; তাই যৌবনে যখন সে শ্রীমতীকে লইয়া পরম আগ্রহে সংসার পাতিয়াছিল, তখন শ্রীমতী রামদাসের ওই বদ চেহারার জন্যই নাকি তাহার পাতানো সংসারে লাথি মারিয়া কোথায় একদিন উধাও হইয়া গিয়াছিল।

গৃহী-বৈরাগীর বংশধর রামদাস শ্রীমতীর সন্ধানে হরেক রকম তালি দেওয়া আলখাল্লা পরিয়া ঝোলা কাঁধে ভবঘুরে ভিখারী বৈরাগী সাজিল, শোকে সংসারকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল, কিন্তু সংসার তাহাকে ছাড়িল না।

শ্রীমতীর সন্ধান মিলিল না, কিন্তু তাহার ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে কোন্ দিন শ্রী আসিয়া প্রবেশ করিয়া তাহাকে সংসারের দিকে ফিরাইল; তখন ভিক্ষার সঞ্চয়েই তাহার তিনশো টাকা পুঁজি, আর বাড়ির জোতজমার ধান ঠিকাদার-ভাগদারের কাছে বেশ মোটা হইয়া জমিয়াছিল। শ্রীমতীর অভাবে রামদাস শ্রীকে লইয়া বেশ আঁটালো করিয়া সংসার বাঁধিল।

পাঁচজনে কহিল, মোহান্ত, এইবার ভাল ক'রে সংসার পাত, একটি ভাল দেখে বোষ্টমী।

রামদাস কহিল, রাধে রাধে, ও কথা ছাড়ান দাও দাদা। রাধারানী আমার মনেই ভাল, ধ্যানেই সোজা, বাইরে বেজায় বেঁকা। বেঁকা রায়ের লাঞ্ছনাটাই দেখ না ! জয় রাধে, শ্রীমতী শ্রীমতী !

কে একজন স্ত্রী-জাতির কি একটা নিন্দা করিল, মোহান্ত মাথা নাড়িয়া জিব কাটিয়া সবিনয়ে প্রতিবাদ করিল, রাধে রাধে, ও কথা ব'লো না, বলতে নাই। শ্রীমতীর জাত, ওরা সবাই ভাল।

একজন ঠোঁট কাটা কঠোর রসিকতা করিয়া ফেলিল, তা তোমার শ্রীমতী—

মোহান্ত হাসিয়া কহিল, বললাম যে দাদা, শ্রীমতীর জাত ওরা, সুন্দর নিয়েই যে কারবার ওদের। অসুন্দরকে কে কবে পছন্দ করে দাদা?

এই সময় রামদাসের বড় ভাই শ্যামদাস বছর আষ্টেকের ফুটফুটে মাতৃহীন পুলিনকে রাখিয়া মারা গেল। রামদাস পুলিনকে বুকে করিয়া 'না বিইয়াই শ্যামের মা' হইয়া উঠিল।

সুন্দর পুলিন বড় হইল। বৈষ্ণবের ছেলে, কীর্তনের আখড়ায় খোল করতাল ছাড়িয়া লাঠির আখড়ায় লাঠি ধরিতে শিখিল। বলা সঙ্গী হইল, গাঁজা ধরিল। রামদাস শাসন করিতে পারিল না, শুধু দুঃখই করিল; তবু মনে মনে নিজেই সান্ত্বনা খুঁজিয়া লইল, বেশ একটি গোছালো বউ আসিলেই পুলিন মানুষ হইবে, বোকা বুদ্ধিমান হইবে, ঘর বুঝিবে, না বুঝে ঘর ঘাড়ে চাপিয়া পরিচয় করিয়া লইবে।

রামদাস পুলিনের জন্য পাত্রী খুঁজিতে লাগিল।

সৌরভী বৈষ্ণবী আসিয়া কহিল, মোহান্ত, তা আমার মঞ্জরীর সঙ্গে পুলিনের বিয়ে দাও না কেন? ছেলেবেলার সাথী দুটি, ভাবও খুব—

রামদাস কহিল, রাধে রাধে, তা যে হয় না সৌরভী, আমরা হলাম জাত-বোষ্টম, আর তোমরা ভেকধারী।

সৌরভী ছিল ধোপার মেয়ে, ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়াছে। তাহার মেয়ের সঙ্গে ভাইপোর বিবাহ দিতে রামদাসের রুচি হইল না। না হইলে সৌরভীর মেয়ে মঞ্জরী বেশ সুশ্রী, বেশ নজরে ধরা মেয়ে। তবে একটু রসোচ্ছলা, যাকে বলে 'ডগমগ' ভাব, সেই ভাবে সে চঞ্চল। চলিতে তাহার দেহে হিল্লোল খেলিয়া যায়, কথা বলিতে হাসি উপচিয়া পড়ে। হাসিতে নিটোল গালে টোল পড়ে, সে গ্রীবাটি ঈষৎ বাঁকাইয়া দাঁড়ায়। নাকে রসকলি কাটে, চূড়া বাঁধিয়া চুল বাঁধে, কথার ধরনটাও তাহার কেমন বাঁকা। লোকে কত কি বলে, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না। নদীর বুকে লোহার চিরেও দাগ আঁকে না, স্রোতও বন্ধ হয় না।

মঞ্জরী পুলিনের চেয়ে বছর চারেকের ছোট, বাল্যসাথী, দুইজনের ভাবও

খুব। পুলিন সময়ে অসময়ে মঞ্জরীদের বাড়ি যায়, মঞ্জরী সাদরে অভ্যর্থনা করে, মুখে দীপ্তি ফুটিয়া উঠে, রসোচ্ছলা আরও উচ্ছল হইয়া উঠে।

পুলিন বলে, কি হে রসকলি, করছ কি?

দুইজনে 'রসকলি' পাতাইয়াছে।

মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া সুরে বলে—

"তোমায় আঁকছি হে অঙ্গে যতন ক'রে।"

পুলিন এ কথার উত্তর খুঁজিয়া পায় না।

অভাব-অভিযোগে কত দিন মঞ্জরীর মা সৌরভী আসিয়া কহে, দেখ্ লো মঞ্জরী, দুটো টাকা কারু কাছে পাওয়া যায় কি না, নইলে তোর খাড়ুটা বাঁধা দিতে হবে।

মঞ্জরী বলে, খাড়ু আমি বাঁধা দেব না রসকলি। তুমি টাকা এনে দাও।

পুলিন শশব্যস্তে বলে, সে কি রসকলির মা, খাড়ু বাঁধা দেবে কি! আমি টাকা এনে দিই।

সৌরভী আপত্তি করিলে মঞ্জরী কহে, কেন, রসকলি কি আমার পর?

খুড়ার তহবিল সন্ধান করিয়া না পাইলে চাউল বিক্রয় করিয়া সে টাকা আনিয়া দেয়।

আবার মঞ্জরী কখনও কখনও পুলিনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলে, না, তুমি দিতে পাবে না, ও মায়ের চালাকি।

মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া হয়, পুলিন ব্যস্ত হইয়া উঠে, কিন্তু মঞ্জরী কহে, খবরদার, আড়ি করব।

দশ বছর বয়সেই মঞ্জরীর একবার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু পাত্রটিকে মঞ্জরীর পছন্দ হয় নাই, তাই তাহাকে সে নাকচ করিয়া দিয়াছে। সে বেচারী বহুবার মঞ্জরীর জন্য হাঁটাহাঁটি করিয়া শেষে অন্যত্র বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছে। মঞ্জরীকে ছাড়পত্র করিয়াছে।

নানা কারণে রামদাস সৌরভীকে প্রত্যাখ্যান করিল।

রামদাস সৌরভীকে ফিরাইয়া দিল; সৌরভীও ঘরে গিয়া পুলিনকে ফিরাইয়া দিল, কহিল, বাবা, মেয়ের আমার সোমত্ত বয়েস, তুমি আর এসো না। একেই তো পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে। মনে ভেবেছিলাম, তোমরা দুটি ছেলেবয়সের সাথী, দু হাত এক ক'রে দিয়ে দেখে চোখ জুড়োব, তোমার কাকা তা দেবে না। আমাকে তো আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে!

কথাটা পুলিনের বড় বাজিল, সে দুই দিন খাইল না, শুইল না, মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইল।

রামদাস শেষে রাজি হইল, বেশ, মঞ্জরীর সঙ্গেই পুলিনের বিবাহ হোক।

সময়টা হোলির, রামদাস শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবে। তাই স্থির হইল যে, রামদাস ফিরিলে বিবাহ হইবে।

কিন্তু উপরওয়ালার অভিপ্রায় অন্যরূপ।

শ্রীধামে সহসা একদিন রামদাসের সঙ্গে হারানো শ্রীমতীর দেখা হইয়া গেল। শ্রীমতী তখন গাছতলায় কলেরায় ছটফট করিতেছে, পাশে বারো-তেরো বছরের মেয়ে গোপিনী বসিয়া বসিয়া অঝোর-ঝরে কাঁদিতেছিল।

স্ত্রীলোকটির কাতরানিতে আর বালিকাটির কান্নায় দয়াপরবশ হইয়া রামদাস সাহায্যে অগ্রসর হইয়া রোগিণীর পাশে বসিল, ক্ষণেক তাহার মুখপানে চাহিয়া সাগ্রহে ডাকিল, শ্রীমতী!

রোগযন্ত্রণায় কাতর শ্রীমতী রামদাসের মুখপানে চাহিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, রামদাস উত্তরীয়-প্রান্ত দিয়া চোখ মুছাইয়া দিল। শ্রীমতী তাহার পা দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, আমার যাবার সময় পায়ের ধুলো দাও। আর এই মেয়েটিকে নাও। বড় ভাল মেয়ে, মায়ের মত নয়, পার তো পুলিনের সঙ্গে বিয়ে দিও। ভয় নেই, অজাতের মেয়ে নয়। সেই যে, বাউল প্রেমদাসকে মনে পড়ে? সেও জাত-বোষ্টম, তারই মেয়ে।

রামদাস কাতর কণ্ঠে কহিল, শ্রীমতী, রাধারাণী, আমি যে তোমার তরে আজও শূন্য ঘর বেঁধে ব'সে আছি।

শ্রীমতী সে কথার কোন উত্তর দিল না, শুধু কন্যা গোপিনীকে কহিল, মা, এই তোর বাপ, এঁর সঙ্গে যা, আমার চেয়েও আদরে রাখবে। আর একটা কথা গোপিনী, কখনও যেন স্বামী ছাড়িস নি; হই বোষ্টম, থাকুক নিয়ম, তবু ওতে সুখ নেই।

শ্রীমতীকে বৃন্দাবনে বিসর্জন দিয়া গোপিনীকে লইয়া রামদাস বাড়ি ফিরিল।

সৌরভীকে ডাকিয়া পঞ্চাশ, একশো, শেষে দুইশোটি টাকা হাতে দিয়া কহিল, সৌরভী, আমায় বাকি্য থেকে খালাস দাও।

একমুঠা টাকা খুঁটে বাঁধিয়া সৌরভী হাসিমুখেই বাড়ি ফিরিল।

সৌরভী মঞ্জরীর অন্য পাত্র ঠিক করিল, কিন্তু মঞ্জরী কহিল, না।

মা শেষে রাগ করিয়া রামদাসের টাকা লইয়া বৃন্দাবন চলিয়া গেল।

মঞ্জরী দিন দুই কাঁদিল; তারপর আবার উঠিল, ক্রমে হাসিল, রসকলি কাটিল, কিন্তু বিবাহ করিল না।

এদিকে পুলিনের সঙ্গে গোপিনীর বিবাহ হইয়া গেল। পুলিন যেন মঞ্জরীর নেশা ভুলিল। সে দিন-রাত্রি ঘরেই থাকে, বাড়ির বাহির হয় না, দেখিয়া রামদাস সুখে হাসিল। মঞ্জরী দুই-চারি দিন পুলিনের অপেক্ষা করিয়া শেষে একদিন চূড়া করিয়া চুল বাঁধিয়া, নাকে রসকলি কাটিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে রামদাসের বাড়িতে আসিয়া উঠিল। রামদাস তখন বাড়িতে ছিল না; উঠানে দাঁড়াইয়া মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া ঘরের রুদ্ধ দ্বারকে উদ্দেশ করিয়াই বলিল, কই হে রসকলি, বউ দেখাও হে!

পুলিন ঘরের ভিতর গোপিনীর সহিত কথা কহিতেছিল, মঞ্জরীর আওয়াজ পাইয়া অন্য দুয়ার দিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। গোপিনী নতমুখে ঘরের মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিল। মঞ্জরী ঘরে ঢুকিয়া গোপিনীর ঘোমটা তুলিয়া দেখিয়া ঠোঁটের আগায় পিচ কাটিয়া কহিল, তুমি বউ?

গোপিনী মুখ তুলিয়া চাহিল।

মঞ্জরী আবার কহিল, তা হ্যাঁ বউ, রসকলির তোমাকে পছন্দ হয়েছে?

গোপিনী এবার কথা কহিল, যেন চিমটি কাটিয়া কহিল, না।

মঞ্জরী বলিল, বাঃ, এই যে পাখি পড়ে বেশ! তা হ্যাঁ বউ, কেন পছন্দ হয় নি, কিছু জেনেছ?

গোপিনী সেই চিমটি কাটার মতই কহিল, রসকলি কাটতে জানি না কিনা, তাই।

মঞ্জরী সব বুঝিল, এবার সে হাসিয়া বিস্ময়ের ভঙ্গীতে গালে হাত দিয়া কহিল, ওমা, তাই নাকি? তা আমার কাছে রসকলি কাটা শিখবে বউ?

গোপিনী কহিল, শেখাবে? দেখো, ঠিক তোমার মতনটি হওয়া চাই।

মঞ্জরী কহিল, তাই শেখাব, কিন্তু ধৈরয ধ'রে থাকা চাই। পারবে তো?

গোপিনী কহিল, পারব, কিন্তু তোমার সময় হবে তো? বলি, আসবে কখন? রসময়রা ছাড়বে তো?

মঞ্জরী এবার ঠেকার দিয়া কহিল, আমার রসময়রা নয় অসময়ে এসে সময় দেবে। তোমার রসময় যে একদণ্ড ছাড়ে না দেখি!

গোপিনী কহিল, ও দুদিন, এখন নতুন নতুন নালতের শাক হে। তারপর বুড়ো গরু ঠিক দামে গিয়ে পড়বে, ভয় নাই।

মঞ্জরী একটু ঝঙ্কার দিয়া কহিল, তা ভাই, বুড়ো গরু বেঁধে রাখলেই হয়! যার দড়ি নাই, তার আবার গরু পোষার শখ কেন?

গোপিনীও এবার একটু ঝঙ্কার দিয়া কহিল, ঘোড়া হ'লে কি চাবুকের অভাব হয় হে, তা হয় না। যখন গরু পুষেছি, তখন দড়ি কি না জুটবে? বলি, পরনের কাপড়ে আঁচল তো আছে, তাতেই বাঁধব।

মঞ্জরী হাসিয়া কহিল, যদি ছিঁড়ে পালিয়ে যায়?

গোপিনী কহিল, ইস, সাধ্যি কি!

মঞ্জরী কহিল, দেখো।

গোপিনী সেই দম্ভভরেই কহিল, তখন না হয় ছেঁড়া আঁচল গলায় দিয়ে ঝুলব হে, তা ব'লে জ্যান্তে তো আর ভাগাড়ে দিতে পারি না!

ইহার পর মঞ্জরী আর কথা কহিল না, আচমকাই যেন বাড়ি ফিরিল, তখন মুখখানায় হাসি ছিল না, যেন থমথমে জলভরা মেঘ।

পরদিন হইতে রসকলির বাড়িতে পুলিনের আদর যেন বাড়িয়া গেল। লোক পাঠাইয়া পুলিনকে আনাইল, তাহার লজ্জা ভাঙিয়া দিল। এখন আর পুলিনের গাঁজার আড্ডায় মঞ্জরী ঝঙ্কার দেয় না। সঙ্গী বলাকে দেখিয়া বিরক্ত হয় না। এখন কথায় কথায় মঞ্জরী যেন ঢলিয়া পড়ে। পান দেয়। পুলিন আবার বাড়ি ছাড়িল, পূর্বের চেয়ে যেন বেশি শক্ত করিয়া মঞ্জরীর বাড়িতে আড্ডা গাড়িল।

মঞ্জরী মাঝে মাঝে আবার এও বলে, রসকলি, এ তো ভাল কাজ হচ্ছে না।

পুলিন হোঁৎকার মত কহে, কি?

মঞ্জরী মুচকি হাসিয়া বলে, এই—আমার বাড়িতে এমন ক'রে চব্বিশ ঘণ্টা প'ড়ে থাকা।

পুলিন তেমনই ভাবেই বলে, কেন?

মঞ্জরী সুর করিয়া গান ধরে—

"পাঁচ সিকের বোষ্টুমি তোমার,
ওহে, গোসা করেছে, গোসা করেছে।"

পুলিন কহে, ধ্যেৎ।

গোপিনী সত্য সত্যই রাগ করিল, কিন্তু ভাঙায় কে? যাহার উপর মান, সেই যে মানের মুখে ছাই দিয়া দিল। সে খাবার সময় আসে, দুইটা খায়, দেশের দশের হাস্যাস্পদ হইয়া ফেরে, মঞ্জরীর বাড়ি আড্ডা জমায়, ঘরের পয়সা পর্যন্ত মঞ্জরীর ঘরে তুলিয়া দিয়া আসে। মঞ্জরীর নাকি সোনার নথ হইতেছে, গোপিনী জ্বলিয়া গেল। পুলিন যে-দুই-চারিটা কথা গোপিনীর সহিত কয়, তাহা পর্যন্ত মঞ্জরী-বিশোভিত। সেদিন রাত্রে কথায় কথায় নির্বোধ কহিল, রসকলি তোমার কি নাম দিয়েছে জান গা? গোপিনী নয়, সাপিনী। তা সত্যি, সবেতেই তোমার ফোঁস।

গোপিনী একটা জ্বলন্ত অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ হানিয়া ছুটিয়া পলাইল। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বাহিরে কাঁদিতে কাঁদিতে মনে পড়িল, সে বলিয়াছিল, যদি আঁচল ছেঁড়ে তবে ছেঁড়া আঁচল গলায় দিয়া ঝুলিবে। উদ্‌ভ্রান্ত ব্যথাহত নারী সত্যই আঁচল ছিঁড়িয়া দড়ি পাকাইতে বসিল। ঘরে পুলিন তখন অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে, বুঝি বা রসকলিকে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া বৃদ্ধ মোহান্ত বাহির হইল, শ্বেতবস্ত্রা গোপিনীকে দেখিয়া চমকিয়া কহিল, কে? কে? এ কি মা! বাইরে কেন, মা আমার?

গোপিনী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, বৃদ্ধের স্নেহস্পর্শে তাহার হাতের পাকানো আঁচল এলাইয়া খুলিয়া গেল।

মোহান্ত গোপিনীকে বুকে লইয়া কাঁদিয়া কহিল, মা, বুড়ো ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ধৈর্য ধর্, মা আমার, আমি আশীর্বাদ করছি—ভাল হবে, ভাল হবে তোর।

পুলিনের ব্যবহারে শান্ত স্নেহ-দুর্বল বৃদ্ধ মরমে মরিয়া গেল। কঠোর হইতে চেষ্টা করিল, পয়সায় টান দিল, কথা বন্ধ করিল, কিন্তু তবুও যে-পুলিন সেই পুলিনই রহিয়া গেল। অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন!

শুধু রসকলির বাড়িতে বসিয়া বলার সহিত খুড়ার আয়ুর দিন গণনা করিতে লাগিল।

রামদাস কিন্তু বাঁচিতে চাহিয়াছিল, মরমে মরিয়াও গোপিনীর জন্য বাঁচিতে চাহিত। সর্বদা তাহার ভাবনা হইত, সে মরিলে গোপিনীর দশা কি হইবে?

কিন্তু মানুষ অমর নয়, মরণের পরোয়ানা সঙ্গে লইয়াই জন্ম লওয়া। সহসা একদিন রামদাসের তলব আসিল। মোহান্তের বয়স হইয়াছিল, হাঁপানি ছিল, হঠাৎ একদিন হাঁপানি মৃত্যুর মূর্তিতে বুকে চাপিয়া বসিল।

গোপিনী চোখের জলে বুক ভাসাইয়া সেবা করিতে বসিল। পাড়া-পড়শী আসিয়া জমিল। মোহান্ত যেন কাহার অনুসন্ধান করিতেছিল, কিন্তু সে তখন পাল-পুকুরের ঘাটে বসিয়া 'ব্যাং ছুড়ছুড়ি' খেলিতেছিল।

পাড়াপড়শী ভিড় জমাইয়া বসিয়া আছে, কেহ বলে, মোহান্ত, হরি বল, বল —জয় রাধারাণী!

রাধারাণীর জয়গানে চিরমুখরকণ্ঠ চারণ কিন্তু আজ এ সময়ে রাধারাণীর ধ্যান করিতে পারিল না। মৃগমায়াচ্ছন্ন রাজা ভরতের মত শুধু বলিল, মা গোপিনী, কিছু করতে পারলাম না মা।

গোপিনী শেষে আছাড় খাইয়া পড়িল। হায়, তাহার নীড় যে ভাঙিয়া যায়! ভ্রষ্টনীড় বিহঙ্গিনীর ক্রন্দন ছাড়া আর উপায় কি? পাড়ার মেয়েরা দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু কেহ এই গোপিনীকে ধরিতে সাহস করিল না। বুড়া রোগী, কখন শেষ নিশ্বাস পড়িবে, খাবি খাইয়া মরিবার নোটিসও হয়তো দিবে না। মড়া ছুঁইয়া কে অশুচি হইবে!

ধ'রিল শেষে একজন। সে মঞ্জরী।

মঞ্জরী আসিয়াই শোকবিহ্বলা গোপিনীকে ধরিল। কহিল, ভয় কি?

মুমূর্ষু মোহান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া টানিয়া টানিয়া কহিল, গ্রামের পাঁচজন আছেন, আমার শেষ ইচ্ছা ব'লে যাই।—আমার স্থাবর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হ'ল গোপিনী। আর সকলের কাছে এই ভিক্ষে, ছেলেটাকে যেন ওই বেশ্বের হাত হতে বাঁচিও।

কথাটায় সকলের চক্ষু গিয়া পড়িল মঞ্জরীর উপর। সকলেই ভাবিতেছিল, সে কি করিয়া বসে, সে কি করিয়া বসে! কিন্তু মঞ্জরী গোপিনীর এলানো দেহখানি পরম সান্ত্বনাভরে জড়াইয়া বসিয়া ছিল। বসিয়াই রহিল, চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

মোহান্ত যখন কথাটা আরম্ভ করে, তখনই বলার সঙ্গে পুলিন আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সেও কথাটা শুনিল।

কথাটা আজ তাহাকে প্রথম আঘাত দিল, মান-অপমানের স্বাদ আজ সে বুঝি প্রথম বুঝিল।

লোকে তখন মোহান্তের শেষ ইচ্ছার সমালোচনায় ব্যস্ত। পুলিন দাওয়া হইতে নামিয়া পড়িল, কেহ লক্ষ্য করিল না; কিন্তু মঞ্জরী ডাকিল, যাচ্ছ কোথা?

পুলিন কহিল, আর এ বাড়িতে নয়।

মঞ্জরী কহিল, ছিঃ, এই কি রাগের সময়? এস, খুড়োর মুখে জল দাও, কানে নাম শোনাও।

পাড়াসুদ্ধ লোক এই বেহায়া মেয়েটার সীমাহীন নির্লজ্জতায় অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মেয়েরা গালে হাত দিল। পুলিনও মঞ্জরীর মুখপানে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে খুড়ার শিয়রে বসিয়া মুখে গঙ্গাজল দিল, ডাকিয়া কহিল, বল কাকা, জয় রাধারাণী!

বৃদ্ধ কহিল, জয় রাধারাণী! দয়া কর মা, অনাথিনী দুঃখিনীকে দয়া কর মা!

বেলা আড়াই প্রহরের সময় রামদাস মরিল, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইতে রাত্রি এক প্রহর হইয়া গেল।

তখন মঞ্জরী গোপিনীকে কহিল, তবে আমি আসি।

গোপিনী বলিল, এস।

মঞ্জরী চারিদিক চাহিয়া সরলভাবেই কহিল, কত্তা কই? একাটি থাকতে ভয় করবে না তো?

গোপিনীর মনে হইল, মঞ্জরী বুঝি তাহাকে ঠাট্টা করিল। সে উত্তর করিল, আসা যাওয়াই যখন একা, তখন একা থাকতে ভয় করলে চলবে কেন? আর একাই তো থাকা এক রকম।

মঞ্জরী কথাটা গায়ে না লইয়া কহিল, আমি কিন্তু ভাই, একা থাকতে পারতাম না।

গোপিনী কহিল, আমি হ'লে একা থাকতে যদি না পারতাম, গলায় দড়ি দিতাম, তবু—

মঞ্জরী এবার একটু ঝাঁঝিয়া উত্তর দিল, বালাই, ষাট, মরব কেন? আসি ভাই, কিন্তু রসকলি গেল কোথা?

গোপিনী ক্ষিপ্তের মত কহিল, রসকলি নাকেই আছে, ঘরে গিয়ে আয়না নিয়ে দেখ, পোড়া মুখের ওপরেই ঝলমল করছে।

মঞ্জরী এই আকস্মিক আঘাতে যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল। বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়াও কিন্তু শেষটা উত্তরের বেলায় বলিয়া ফেলিল, রসকলি

তো নিজের নাকেই থাকে বউ, এ যে কেড়ে নেওয়া যায় না। তা তুমি যদি চাও তো না হয় দেবার চেষ্টা করি।

গোপিনী ফোঁস করিয়া বলিয়া দিল, কি বললে তুমি? তোমার কাছ থেকে ভিক্ষে আমি চাই নে, চাই নে। যাও তুমি, যাও।

কথাগুলি ক্রুদ্ধ এক-নিশ্বাসে বলিয়াই সে ঘরে ঢুকিয়া মঞ্জরীর মুখের উপরেই দরজাটা দড়াম করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

মঞ্জরী ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিল, বুকের ভিতর তাহার যেন আগুন জ্বলিতেছিল। সাপিনীর এত বিষ! আপনার বিষে হতভাগিনী আপনি জর্জর হইয়া মরুক।

আপন বাড়ি ঢুকিতেই মঞ্জরী দেখিল, পুলিন তাহার দাওয়ার উপর বসিয়া।

মঞ্জরীর দেহ ব্যাপিয়া একটা হিল্লোল বহিয়া গেল। হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল।

পুলিন উঠিয়া কহিল, রসকলি!

মঞ্জরী হাসিয়া উত্তর দিল, ব'স, বলি।

পুলিন বসিল।

ঘরের তালা খুলিতে খুলিতে মঞ্জরী বলিল, রসকলি, তুমি ভাই সোনাকপালে পুরুষ। স্ত্রী-ভাগ্যে ধন।

পুলিন খুব রাগিয়াই কহিল, ও ধন আমার ভাদ্দর-বউ, ছুঁতে পাপ।

মঞ্জরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিল, আর বউটি? কি গো, চুপ ক'রে রইলে যে? উত্তর দিতে পারলে না? আচ্ছা, আমিই ব'লে দিই, সে তোমার গলার মালা, ঠোঁটের হাসি।

পুলিন কহিল, না রসকলি, হ'ল না, সে আমার গলার ফাঁসি। ঠাট্টা নয় রসকলি, একটা কথা তোমায় বলতে এসেছি, আমি কাল থেকে নিজের বাড়িতে যাব। ও বাড়িতে আর থাকব না।

নিজের বাড়ি অর্থে পুলিনের পৈতৃক বাড়ি। বাস্তব চক্ষে বাড়িটি একটি মূর্তিমন্ত বিভীষিকা, কিন্তু কল্পনায় বাড়িটি বেশ, অর্থাৎ উঠান-ভরা বনফুল, প্রাচীর ভাঙিয়া সীমা অসীমে মিশিয়াছে, ঘরের ভিতরেও চাঁদের আলো খেলে।

মঞ্জরী কহিল, বেশ, তা ভাল, তারপর খাবে কি ক'রে ?

পুলিন চট করিয়াই কহিল, বোষ্টমের ছেলে, ভিক্ষে ক'রে খাব।

মঞ্জরী কহিল, আরও ভাল; কিন্তু ভিক্ষেতে মেলে তো চাল, তা রাঁধবে কে ? বউকে নিয়ে যাও।

পুলিন প্রবল প্রতিবাদে মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

মঞ্জরী কহিল, কেন ? আর তুমি 'না' বললেও সে যদি না ছাড়ে ?

পুলিন কহিল, ছাড়বে না ? মারের চোটে ভূত ছাড়ে, তা জান ? হুঁ হুঁ, কথায় আছে, 'পড়লে পরে দুধু ভাতু, না পড়লে ঠেঙার গুঁতু'।

মঞ্জরী কহিল, বেশ। রসকলি আমার বলে ভাল, এ যেন সেই—'ও পারেতে ধান পেকেছে লম্বা লম্বা শীষ, টুকুস ক'রে ম'রে গেল লঙ্কার রাবণ'। তা যেন হ'ল, আজ রাত্রের মত তো বাড়ি যাও।

পুলিন বলিল, না, আর নয়।

মঞ্জরী পরিহাস ছলেই কহিল, তবে আজ রাতটা পাল-পুকুরের বটগাছেই কাটাবে নাকি ?

পুলিন কহিল, না, তোমার দাওয়াতেই প'ড়ে থাকব।

মঞ্জরী হাসিল, দুই আর দুইয়ে চার হয়—এ কথাটা যে বুঝে না, সে চারের গুরুত্ব না বুঝিলে তাহার উপর রাগ করিয়া লাভ কি ?

তবু সে বলিল, লোকে বলবে কি ?

পুলিন বাহির-দরজার দিকে ফিরিল।

মঞ্জরী কহিল, যাও কোথা ?

পুলিন কহিল, দেখি, কোথাও—

মঞ্জরী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, যেতে হবে না, এস, শোবে এস।

পুলিন ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, লোকে বলবে কি ?

মঞ্জরী কহিল, যা বলবার তারা তো ব'লেই নিয়েছে, আবার বলবে কি ? শোন নি, আজই তোমার কাকা বললে, ওই—

পুলিন, তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তোমার পায়ে ধরি রসকলি, ছি, ও কথা তুমি ব'লো না।

মঞ্জরী হাসিয়া মৃদুস্বরে গান ধরিল—

'লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী,
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী।'

পুলিন তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল। স্পর্শে তাহার সে কি উত্তাপ! মঞ্জরী মৃদু আকর্ষণে হাতখানি ছাড়াইয়া শান্ত মধুর কণ্ঠে কহিল, ছাড়, বিছানা করি।

তকতকে ঘরখানি, লাল মাটি দিয়া নিকানো, আলপনার বিচিত্র ছাঁদে চিত্রিত; দেওয়ালে খান-কয়েক পট—সেই পুরানো গোরাচাঁদ, জগন্নাথ, যুগল-মিলন; সবগুলির পায়ে চন্দনের চিহ্ন। মেঝের উপর একখানি তক্তাপোশ, এক দিকে পরিষ্কার বেদীর উপর ঝকঝকে বাসনগুলি সাজানো।

তক্তাপোশের উপর গুটানো বিছানা বিছাইয়া দিয়া একটি ছোট চৌকির উপর রক্ষিত তোলা বিছানার গাদা হইতে দেখিয়া দেখিয়া একখানা 'সিজুনী' আনিয়া পুরাতন বিছানার উপর বিছাইয়া দিল। সিজুনীটি মঞ্জরীর নিজের হাতে অতি যত্নে প্রস্তুত, চারুশিল্পের অপরূপ ছাঁদ বিচিত্রিত। বিছানাটি বেশ করিয়া কয়বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া ডাকিল, এস।

পুলিন ঘরে আসিয়া তক্তাপোশে বসিল। দেখিল, মঞ্জরী অভ্যাসমত ঈষৎ বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া।—সেই হাসি, সেই সব; শুধু দৃষ্টিটুকু নূতন। সে তখন মুগ্ধ, আবিষ্ট, একাগ্র।

পুলিন কথা কহিল, ভাবটা গদগদ, কিন্তু সঙ্কুচিত, রসকলি!

মঞ্জরী চমক ভাঙিয়া কহিল, কি গো?

পুলিন কহিল, তুমি—তুমি—আমার—আমার—আমার—

কথাটা শেষ করিতে পারিল না, প্রতিবারই বাধিয়া যায়, আর পুলিন রাঙা হইয়া উঠে।

মঞ্জরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার—তোমার—তোমার—কি গো?

কৌতুকে গ্রীবা বাঁকাইয়া খানিকক্ষণ পুলিনের নত লজ্জিত মুখের উপর উজ্জ্বল দৃষ্টি হানিয়া সহসা মঞ্জরী তাহার মুখ পুলিনের কানের কাছে লইয়া গিয়া বলিল, আমি তো তোমারই গো।

কথাটা বলিয়াই সে চট করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, চঞ্চল লঘু গতিতে, ছোট ত্বরিতগতি ঝরনাটির মতই। বাহিরে গিয়াই দরজাটা টানিয়া শিকল আঁটিয়া দিল। একরাশ দমকা দখিনা বাতাস আসিয়া যেন পুলিনকে তৃপ্ত করিয়া অন্তরকে দীপ্ত করিয়া আচমকাই চলিয়া গেল।

শিকল টানিয়া দিয়া আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে ঢেঁকিশালায় আসিয়া মঞ্জরী আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

রাত্রিতে পুলিন আসে নাই, বেলা এক প্রহর হইয়া গেল, তবুও দেখা নাই। গোপিনী অপেক্ষায় বসিয়া ছিল, সহসা সে সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া উঠিল, স্নান সারিয়া রান্না চড়াইল।

খুট করিয়া শব্দ হইল, ওই বুঝি আসিল! প্রবল অভিমানে ব্যগ্র দৃষ্টিকে রান্নার কড়ায় সে নিবিষ্ট করিল, হাতের খুন্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত অতি-বিক্রমে ঘুরিয়া উঠিল, খন—খন—খন।

এই বুঝি ডাকে, সাপিনী হে!

পোষা বিড়ালটা দাওয়ায় লাফাইয়া উঠিয়া ডাকিল, ম্যাও—ম্যাও—ম্যাও।

আর দৃষ্টি মানিল না, ফিরিল; কিন্তু কই? শূন্য অঙ্গন, ভেজানো বহির্দ্বার—মানুষের বার্তা তো দিল না।

হাতের খুন্তিটা সজোরে বিড়ালটার পিঠে হানিয়া গোপিনী গালি পাড়িল, বেরো, বেরো, বেরো, আপদ বেরো।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল, গোপিনীর মনে হইল, বুঝি বা একটা যুগ।

সহসা বহির্দ্বার খুলিয়া বলাই আসিয়া দাওয়ায় বসিল। হাতের হুঁকা টানিতে টানিতে কহিল, শুনেছ মিতেনী, কাল রেতে মিতে যে মঞ্জরীর বাড়িতে—

বলাই পুলিনের মিতে, তাই গোপিনীকে ডাকিত—মিতেনী, গোপিনী ডাকিত—মিতে।

গোপিনী কহিল, শুনি নাই, তবে জানি।

বলাই বলিল, আবার নিজের ঘর সাফ হচ্ছে, সেইখানেই থাকবে, এ বাড়িতে থাকবে না।

একটা লজ্জা ঢাকিতে পাঁচটা লজ্জা মাথায় লইতে হয়। গোপিনী কহিল, আমিই যে থাকতে দেব না, সে আমি কাল ব'লে দিয়েছি, বাড়ি ঢুকলে ঝাঁটার বাড়ি দেব।

বলাই বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, ও, তাই বুঝি এত! আবার মঞ্জরীকে পত্র করবে!

বুকে পাথর চাপা দিলেও মানুষ কাতরাইতে পারে, কিন্তু এই কথাটা এমন স্থানে গোপিনীকে আঘাত করিল যে, সে আর কথা কহিতে পারিল না।

বলাই কহিল, কাল রেতে জমিদার গাঁয়ে এসেছেন, তুমি নালিশ কর।

গোপিনী দীপ্ত প্রতিবাদে কহিল, না।

তারপর উভয়েই নীরব; গোপিনীর হাতের খুন্তি নড়ে না, চোখ কড়ার উপর, কিন্তু দৃষ্টি নয়, পলকও পড়ে না।

বলাই মনে মনে কি যেন মন্ত্র করিতেছিল, শেষে দালালির ভঙ্গীতে রসান দিয়া কহিল, বেশ বলেছ, সেই ভাল, ও 'দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই ভাল'।

তারপর আবার হুঁকায় টান পড়িল—ফড়র ফড়র। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল, আমাদের তো ছিঁড়লে মালা গাঁথতে আছে, ভাবনাই বা কি! ভাত থাকলে কি কাকের অভাব হয়, কি বল মিতেনী? আমি রয়েছি, সব ঠিক ক'রে দেব তোমার।

পরিশেষে সম্মতির আশায় মিতেনীর মুখপানে চাহিল।

মিতেনী কোন কথার উত্তর না দিয়া ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। রান্না পুড়িতে লাগিল।

পুলিন কোদালি হাতে বাড়ি সাফ করিতেছিল। অনভ্যাসের কোঁটায় কপাল চড়চড় করে, পুলিন ঘামিয়া যেন নাহিয়া উঠিয়াছে। হাত টাটাইয়া উঠিয়াছে, শিরদাঁড়া টনটন করিতেছে, তবু কাজ সারা চাই। স্ত্রীলোকের অন্নদাস, ছিঃ—তার বড় লজ্জা আর কি!

মিতে বলাই আসিয়া কহিল, ভ্যালা রে মিতে, তা ভাল।

পুলিন কোদালি নামাইয়া বলিল, কল্কেতে কিছু আছে? হুঁকো নয়, অশুচ আমার।

বলা কলিকাটা খসাইয়া পুলিনকে দিল। ধুতরো-ফুলি ছাঁদে হাত ফাঁদিয়া পুলিন টান মারিল, হুশ হুশ হু—শ।

বলাই কহিল, তা এক কাজ করলি না কেন মিতে? জমিদার এসেছেন, তাঁর কাছে পাড়লে একবার হ'ত না? তোর হ'ল সোদর খুড়ো, আর ওর সৎবাবা। ওয়ারিশ হ'লি তুই, ও মাগী সম্পত্তির কে? চল্ তু একবার, দেখবি, এখুনি তোর সম্পত্তি তোর হবে।

অদ্ভুত পুলিন, বিচিত্র তার সংসার-বোধ, সে কহিল, ওর কি হবে?

বলাই বলিল, তোর বউ—তুই খেতে দিবি।

পুলিন কহিল, না না, আমি যে রসকলিকে—

বলাই সোৎসাহে কহিল, রসকলিকে পত্র কর্‌বি, ও মরুকগে—যা মন করুকগে। তোর কি ?

সে যে নেহাত অমানুষী হয়, হাজার হউক সে স্ত্রী। মনটা পুলিনের মোচড় দিয়া উঠিল। পূর্বে তাহার সান্ত্বনা ছিল, তাহার প্রাপ্য ধনমূল্যে গোপিনীর নিকট মুক্তি পাইবার হকদার সে।

পুলিন বলিল, না মিতে, তা হয় না।

যেমন দেবা, তেমনই দেবী!—বলাই বিরক্তভাবে উঠিল, রাস্তা ধরিল জমিদারের কাছারির পানে।

পুলিন ভাঙা দাওয়াটার উপর ভাবিতে বসিল।

জমিদারের পশ্চিমা চাপরাসী আসিয়া ভাঙা কাঁসরের মত খনখন করিয়া কহিল, আরে পুলিয়া, আসো আসো, বাবুর তলব আসে।

পুলিন চমকাইয়া বলিল, ক্যানে, ক্যানে, কাহেসে দারোয়ানজী ?

পশ্চিমা কহিল, সো হামি জানে না।

জমিদারের কাছারিতে পুলিন আসিয়া প্রণাম করিল।

বাবু ফরসিতে তামাক টানিতেছিলেন, গোমস্তা কলম পিষিতেছে। কয়-জন মাতব্বর এধারে বসিয়া ছিল, আর ওধারে এক পাশে আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সঙ্কুচিতা গোপিনী।

বাবু পুলিনের দিকে চাহিয়া কাছারিকে উদ্দেশ করিয়াই কহিলেন, সে হারামজাদী কই ?

রাখাল পাইক বসিয়া ছিল, কহিল, আজ্ঞে, তিনি চানে গেল, আসছেন।

বাবু পুলিনকে বলিলেন, পুলিন, তোমার খুড়োর সম্পত্তি খারিজ করতে হবে।

পুলিন শশব্যস্তে কহিল, আজ্ঞে, সম্পত্তি আমার নয়, ওরই।

জোড়হস্তে অঙ্গুলি-নির্দেশে গোপিনীকে দেখাইয়া দিল।

বাবু কহিলেন, ওই হ'ল হে, ওই হ'ল, স্বামী আর স্ত্রী। মুখ থাকতে নাকে ভাত খায় কে হে ? আর তুমি থাকতে সম্পত্তির ও কে ? ও সম্পত্তি পেলে কি ক'রে ? কথা কও গো, চুপ ক'রে থাকলে চলবে না।

অগত্যা গোপিনী মৃদু কণ্ঠে বলিল, আজ্ঞে, তিনি আমায় দিয়ে গিয়েছেন।

বাবু কহিলেন, তোমাকেই তবে খারিজ করতে হবে, পাঁচশো টাকা লাগবে।

পুলিন বলিল, আজ্ঞে, ও মেয়েমানুষ—

বাবু ধমক দিয়া কহিলেন, তুই থাম্ বেটা। বল গো, তুমি বল। আবার চুপ করলে যে, উত্তর দাও, পাঁচশো টাকা চাই আমার।

পথভ্রান্তকে যে পথ দেখাইয়া দেয়, সেই পথেই সে চলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়া গোপিনী পুলিনের কথা ধরিয়াই বলিল, আজ্ঞে, আমি যে মেয়েমানুষ—

বাবু কহিলেন, আরে, সম্পত্তি তো মেয়েমানুষ নয়। আচ্ছা, না পার, সম্পত্তি তুমি পুলিনকে ছেড়ে দাও।

পুলিন শশব্যস্তে বলিল, আজ্ঞে না।

গোপিনীও বলিল, আজ্ঞে না।

বাবু চটিয়া কহিলেন, আচ্ছা, তবে সম্পত্তি সদরে বাজেয়াপ্ত হবে। আর পুলিন, তুই বেটা ওই মঞ্জরীকে নিয়ে গাঁয়ে ঢলাঢলি করছিস কেন? ওসব হবে না, পরিবার নিয়েই থাকতে হবে।

অভিমান অনবুঝ, স্থানকাল-জ্ঞান নাই; পুলিন কিছু না বলিতেই গোপিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

প্রতিবাদে বাবু চটিয়া দীপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, চোপরাও হারামজাদী, ওই পুলিনকে নিয়েই তোকে থাকতে হবে।

গোপিনী আঁতকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঠিক তখনই মঞ্জরী আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, বাবু, আমায় তলব করেছেন?

বাবু মুখ ফিরাইয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না। সম্মুখে রসোচ্ছলা মেয়েটি—চূড়ার মত চুল বাঁধা, নাকে রসকলি আঁকা, মুখে মিষ্ট হাসি, গালে দুইটি ঈষৎ টোল। মঞ্জরীকে দেখিয়া ক্ষণেক তাঁহার কথা সরিল না।

মঞ্জরী পুনরায় বলিল, হুজুর!

চমক ভাঙিয়া বাবু কহিলেন, হ্যাঁ, এস।—শুনছ গো, ওসব চলবে না, পুলিনের সঙ্গেই ঘর করতে হবে।

শেষটা কহিলেন গোপিনীকে। কথার নির্দেশে মঞ্জরীর দৃষ্টি পড়িল ভয়ত্রস্তা গোপিনীর উপর, সে ত্বরিতপদে নিকটে গিয়া গোপিনীকে কাছে টানিয়া লইল।

আশ্বাস লোকে কথাতেও পায়, দৃষ্টিতেও পায়, স্পর্শেও পায়; গোপিনী মঞ্জরীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, রসকলি!

উজ্জ্বল হাসিতে মঞ্জরীর মুখখানি দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল, ভয় কি রসকলি?

বাবু পুনরায় কহিলেন, বুঝলে, এই আমার হুকুম। উত্তর দাও, রাজি কি না? শুনছিস পুলিন?

পুলিন, গোপিনী উভয়েই নীরব। উত্তর দিল মঞ্জরী, তেমনই হাসিয়া, হুজুর, স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া কি ধমকে মেটে?

বাবু কহিলেন, আলবাৎ মিটবে, না মিটলে চলবে না।

মঞ্জরী বলিল, নাই যদি মেটে হুজুর, তাই বা কি? আমরা জাতে বোষ্টম, ছিঁড়লে মালা আমরা নতুন গাঁথি।

বাবু কহিলেন, বেশ, তবে ও বলাকে পত্র করুক।

ওপাশে বসিয়া বলা মুচকি হাসিল।

গোপিনী প্রবল প্রতিবাদে বলিল, না, না!

বাবু কহিলেন, তবে কি মতলব শুনি? কিন্তু আমার রাজ্যে ওসব বদমায়েশি চলবে না।

পুলিন কি একটা প্রতিবাদ করিল, কিন্তু এত ক্ষীণ যে, কাহারও খেয়ালে আসিল না। সে নড়িয়া-চড়িয়া বসিল, যেন ধৈর্য আর থাকে না। গর্তের সাপ ধরা পড়িবার পূর্বে যেমনতর বাহির হইতেও পারে না, অথচ ক্রোধে গর্তের ভিতরে কুণ্ডলী পাকাইয়া যেমন ঘোরে, তেমনই ভাবেই তাহার মনটা পাক খাইতেছিল।

মঞ্জরী কিন্তু বেশ সবিনয়ে সবল প্রতিবাদ করিল, জিব কাটিয়া সে বলিল, ছি ছি, বাবু, আপনাকে ওসব কথা বলতে নাই।

বাবু অপ্রস্তুত হইয়া মঞ্জরীকে ধমক দিয়া কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা। তোমারও এখানে থাকা চলবে না, পাঁচজনে তোমার নামে পাঁচ কথা বলছে, তোমায় গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে।

মঞ্জরী সবিনয়ে বলিল, আজ্ঞে, কোথায় যাব? মেয়েমানুষ আমি—

বাবু তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আমার সঙ্গে চল তুমি, আমার বাড়িতে থাকবে।

মঞ্জরী বলিল, আজ্ঞে, ঝি-গিরি আমি করতে পারব না।

বাবু কহিলেন, আচ্ছা, কাজ তোমায় করতে হবে না।

মঞ্জরী হাসিয়া বলিল, বাপ রে! রাণীমা তা হ'লে ভাত দেবেন কেন?

বাবু এবার বেশ রস দিয়া কহিলেন, সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না।

আমাদের বাগানে তোমার বুক ক'রে দেব, এখানে যেমন আছ তেমনই থাকবে।—বলিয়া বাবু হাসিলেন, হাসিটি গেঁজলা রসের মত, কেমন যেন বিশ্রী, কুৎসিত গন্ধের আভাস দেয়।

মঞ্জরী কহিল, আমার পোড়ার মুখকে কি আর বলব।—সত্যি সত্যিই এ মুখে আগুন দিতে হয়। আপনি রাজা, আপনিও শেষ—! না হুজুর, আমি এ গাঁ ছেড়ে কোথাও যাব না, সে যে যা বলবে, বলুক।

বাবু মেয়েটার স্পর্ধা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, সহসা তিনি উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া কহিলেন, কেয়া হারামজাদী? ভূতসিং, লাগাও জুতি হারামজাদীকো।

বদ্ধ লৌহদ্বার মত্ত হস্তীও ঠেলিয়া খুলিতে পারে না, আবার অর্গল খুলিলে আঘাতের অপেক্ষাও সয় না, খুলিয়া যায়। পুলিনের মনের দরজার ঠিক অর্গলটিতে হাত পড়িতেই সে খুলিয়া গেল, ভিতরের মানুষটি বাহিরে আসিল, সে একটা ভীষণ দাপে হাঁকিয়া উঠিল, খবরদার!

রাখাল পাইকের শিথিল মুষ্টির লাঠিগাছটা কাড়িয়া লইয়া মাটিতে ঠুকিয়া পুলিন বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

ব্যাপারটা গড়াইত কতদূর কে জানে, কিন্তু লোকে ব্যাপারটা গোটা বুঝিতে না বুঝিতে মঞ্জরী ত্বরিতপদে পুলিন ও গোপিনীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

স্তম্ভিত ভাবটা কাটিতেই বাবু কহিলেন, ভূতসিং!

বলা মৃদুকণ্ঠে কহিল, হুজুর, ওই মঞ্জরীর সঙ্গে গোকুলবাটীর থানার দারোগার পরিবারের সঙ্গে খুব সুখ, একটু বুঝে—

বলার কথাটা ঢাকিয়া দিয়া লাঠি হস্তে ভূতসিং ঘ্যানঘ্যান করিয়া বলিল, হজৌর, হুকুম!

বাবু কহিলেন, কুছ নেহি, যাও।

মঞ্জরী দুইজনের হাত ধরিয়া আসিয়া উঠিল একেবারে রামদাসের বাড়িতে। সারাটা পথ সে যেন কি ভাবনায় ভোর হইয়া ছিল;—ভাবনা বলিলে ঠিক হয় না, সে যেন একটা আবেশ, একটা নেশা।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই মঞ্জরী দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া, একগাছা মোটা

লাঠি আনিয়া পুলিনের হাতে দিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, বাইরে ব'স পাহারাওলা।

পুলিন লাঠি হাতে বাহিরে বসিল, আর ঘরের মেঝেতে বসিয়া নীরবে চোখের জল ফেলিতেছিল দুইটি নারী। গোপিনী নত দৃষ্টিতে, আর মঞ্জরী তাহার মুখের পানে চাহিয়া যেন নেশায় ভোর হইয়া বসিয়া ছিল।

সহসা হাসিয়া সে কহিল, রসকলি!

গোপিনী মুখ তুলিয়া হাসিল, বড় বিষাদের হাসি, যেন মলিন ফুলটি।

মঞ্জরী বলিল, এক কাছারি লোকের সামনে রসকলি পাতিয়েছে, 'না' বললে তো চলবে না।

গোপিনী কহিল, হ্যাঁ।

মঞ্জরী বলিল, তা ভাই, অনুষ্ঠানটা হয়ে যাক, তুমি আমার নাকে রসকলি এঁকে দাও, আমি তোমায় দিই,—যা নিয়ম তা তো করতে হবে।—বলিয়াই খুঁজিয়া পাতিয়া সব সরঞ্জাম বাহির করিয়া তিলকমাটি ঘষিতে বসিল।

তারপর গোপিনীর কোল ঘেঁষিয়া বসিয়া কহিল, তুমি ভাই, আগে বলেছ, আগে তোমার পালা। দাও, আমার নাকে রসকলি এঁকে দাও।—বলিয়া নিজের আঁকা রসকলিটি মুছিয়া ফেলিল।

হতভম্ব গোপিনী কম্পিত করে মঞ্জরীর নাকে রসকলি আঁকিয়া দিল।

মঞ্জরী বলিল, দাঁড়াও, সাক্ষী ডাকি।—বলিয়া বাহিরে পুলিনকে ডাকিল, সেই মধুভরা কণ্ঠ, রসকলি, এস, বলি।

পুলিনকে লইয়া গোপিনীর হাতে হাতে নিজের হস্তবন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া কহিল, এই নাও রসকলি, আমার রসকলি তোমায় দিলাম।

পুলিনের কথা সরিল না।

তারপর পুলিনকে বলিল, আমি দিচ্ছি, 'না' ব'লো না।

গোপিনী ও পুলিন বিস্মিত নির্বাক।

সহসা গোপিনী মঞ্জরীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, না .না, তুমি সুদ্ধ এস, আমরা দু বোনে—

রসোজ্জ্বলা রসোজ্জ্বলার মতই কহিল, দূর, আমি যে রসকলি!

বৈকালের মুখে মঞ্জরী কহিল, দাঁড়াও, আমি একবার গাঁয়ের হালচাল দেখে আসি।

পুলিন বাধা দিয়া কহিল, সে কি! একলা?

মঞ্জরী হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল, বলিল, ভয় কি! আমার রসকলি যে সঙ্গে। —বলিয়া নাকের রসকলি দেখাইয়া দিল। তারপর আবার কহিল, ভয় নাই, আমি বাইরে বাইরে খবর নেব, তেমন তেমন বুঝলে আমি গোকুলবাটী থানায় যাব। আজ রাত্রে না ফিরতেও পারি, বুঝলে? খবরদার, তোমরা বেরিও না, দিব্যি রইল, মাথা খাও।

সে কণ্ঠস্বরে পরিহাসের বিন্দুও ছিল না, পুলিন সে কথা অবহেলা করিতে পারিল না।

মঞ্জরী চলিয়া গেল, রাত্রে ফিরিল না।

পরদিন প্রাতে বলাই আসিয়া ডাকিল, মিতে!

মঞ্জরীর সংবাদের আশায় নিজের বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া দরজা খুলিয়া কহিল, এস।

বলাই বলিল, বেশ বেশ, তা মঞ্জরীকে দিয়ে টাকাটা পাঠালি কেন? নিজে গেলেই তো হ'ত। তা ও বেশ ভালই হ'ল। বাবুও বললেন, বলাই, পুলিন যখন পঞ্চাশ টাকা জরিমানাই দিলে, তখন আর তার ওপর রাগ নাই আমার। তা পুলিন বোধ হয় ভয়ে আসে নাই, তাই মঞ্জরীকে দিয়ে পাঠিয়েছে। মঞ্জরীকেও মাপ হয়ে গিয়েছে। তা একবার আজ যাস, বাবুকে পেন্নাম ক'রে আসিস। ভয় নাই, আমিও সব ব'লে ক'য়ে দিয়েছি।

পুলিনের কথা সরিল না।

জমিল না দেখিয়া বার-কয়েক হুঁকা টানিয়া বলাই চলিয়া গেল। পুলিন স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল, কে জানে—কতক্ষণ! একটি পুঁটলি কাঁখে মঞ্জরী আসিয়া হাসিমুখে অভ্যাসমত হেলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, রসকলি!

পুলিন কথা কহিল না।

হাসিয়া মঞ্জরী বলিল, রসকলি, রাগ করেছ?

পুলিন অভিমানভরে বলিল, তুমি জমিদারকে—

মঞ্জরী কহিল, জলে বাস ক'রে কুমিরের সঙ্গে বাদ করা কি চলে গো? তাই মিটিয়ে ফেললাম।

পুলিন কহিল, টাকা— ?

মঞ্জরী কথা কাড়িয়া বলিল, সে তো তোমারই গো, আমি কি তোমার পর?

তারপর পুলিনের হাত দুইটি ধরিয়া কহিল, তবে আসি।

উদ্‌ভ্রান্তের মত পুলিন বলিল, কোথায়?

মঞ্জরী কহিল, বৃন্দাবন।

পুলিন অভিমান করিয়া বলিল, রসকলি!

মঞ্জরী কহিল, আমি তো তোমারই গো।

গোপিনী দ্বারের পিছনে ছিল, সম্মুখে আসিয়া যেন দাবি করিল, না, যেতে পাবে না।

মঞ্জরী বলিল, তীর্থের সাজ খুলে কুকুর হব?

গোপিনী কহিল, বল তবে, ফিরে আসবে?

মঞ্জরী বলিল, আসব।

গোপিনী কহিল, আসবে? দেখো।

উত্তর না দিয়া মঞ্জরী হাসিয়া পুঁটলিটি তুলিয়া লইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। বিচিত্র সে হাসি, রহস্যের মায়া-মাধুরীতে ভরা, কে জানে তার অর্থ।

চলিতে চলিতে গান ধরিল—

"লোকে কয় আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী;
সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী গো,
আমি গরবিনী।"

নাকে তাহার রসকলি, মুখে তাহার হাসি, চলনে সে কি হিল্লোল, রসধারা যেন সর্বাঙ্গ ছাপাইয়া ঝরিতেছিল।

দেবতার ব্যাধি

দীর্ঘকাল পরে বুড়ো হেডমাস্টার চিঠি পেলেন—ডাক্তার গরগরির কাছ থেকে। ডাক্তার গরগরি! কতকাল আগের কথা! অনেক দিন আগের কথা। ঠিক কতদিন হ'ল কারোই মনে নেই। তবে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে এতে আর ভুল নেই।

ছ'ফুটের উপর লম্বা একটি মানুষ, পাতলা হিলহিলে কাঠামো, মাথাটি ছোট, টিয়াপাখীর ঠোঁটের মত নাক, চোখ দুটিতে কোন বিশেষত্ব না থাকলেও চোখের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত রুক্ষ—তীব্র; এই ছিল গরগরি ডাক্তারের চেহারা। ডাক্তার

এসে উঠল—সন্ন্যাসিচরণ প্রধান মশায়ের নটকোনের দোকানে। দোকানের পাশেই ছিল ছোট ছোট দুটি কুঠুরি—সেই কুঠুরি দুটি ভাড়া নিয়ে প্রথমেই টাঙিয়ে দিলে দুটি টিনের পাতে লেখা সাইনবোর্ড। একটায় ইংরিজীতে লেখা Doctor Gargari, Experienced Physician, অপরটায় বাংলায় লেখা—ডাক্তার গরগরি, সুবিজ্ঞ চিকিৎসক। লোকে ঠাট্টা করে নাম দিলে—ডক্টর গ্রেগরী।

রাঢ়দেশের পল্লীগ্রাম—গণ্ডগ্রাম অবশ্য বলা চলে, সপ্তাহে দুদিন হাট বসে, ছোটখাট বাজারও আছে; মিষ্টির দোকান, নটকোনের দোকান, কাপড়ের দোকান, মণিহারী দোকান, কাটা কাপড়ের দোকান না থাকলেও বৈরিগী খোঁড়া আর তিনু মিয়া দুজনের দুটো সেলাইয়ের কল চলে—একটা বাজারের এ-মাথায় একটা ও-মাথায়। কিন্তু বাজার হাট সব এই দিকে সত্ত্বেও, গ্রামের যাকে বলে মুখপাত—সেটা এ দিকে নয়। সেটা হল ভদ্রলোক-পল্লীতে। যে আমলের কথা, তখন টাকা-পয়সা যার যতই থাক—জমিদারেরাই ছিল সমাজের প্রধান। গ্রামটির ভদ্রলোক-পল্লীটির চেহারা ছিল বেঙাচি-ভরা খিড়কি-ডোবার মত। জমিদারে জমিদারে প্রায় শিবময় কাশীধামের মত অবস্থা। বছরে পঞ্চাশ-একশো-দুশো-পাঁচশো-হাজার-দুহাজার আয়ের জমিদার সব। তিন চার ঘর চার পাঁচ হাজারী, এক ঘর পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে ক্রমে ক্রমে বাড়ছেন দিন দিন শুক্লপক্ষের চাঁদের মত। ঘরে ঘরে মজলিশ বসে, কাছারী হয়, খানা পিনা গীতবাদ্য হয়, রাত্রি বারোটা-একটা পর্যন্ত আসর সরগরম থাকে। ডাক্তার ঘাড় বেঁকিয়ে তির্যক্‌ভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে সন্ন্যাসী প্রধান মশায়কে বললে—আই ডোণ্ট কেয়ার! ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মি মিঃ প্রডানা?

সন্ন্যাসিচরণ ইংরিজী বুঝতো না। সে ডাক্তারের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—কি বলছেন ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার গরগরি বললে—ওদের আমি গ্রাহ্যও করি না। ব'লে হাসলে। বোধ হয় কথাটাকে একবার পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে বললে—আপনাদের ওই জমিদারদের!

তারপর ডাক্তার বের হল—সাজগোজ ক'রে বিকেল বেলা বেড়াবার জন্যে। ডক্টর গ্রেগরী বলে—ইভনিং ওয়াক। মর্নিং ওয়াক অবশ্য সব চেয়ে ভাল—বাট ইউ সি (but you see), ভোরে ঘুম আমার ভাঙে না। আবার হেসে

বলে—ইট ইজ এ ডক্টরস্ ডিজিজ! সব বড় ডাক্তারের ঘুম ভাঙে নটার পরে! ব'লে সে ছড়ি ঘুরোতে ঘুরোতে বেরিয়ে পড়লে। ছ'ফুট লম্বা ডাক্তারের মাথায় একটা গুজরাটি কালো টুপি, গায়ে হাঁটু-পর্যন্ত ঝুল চায়না কোট, পরনে সাদা থান কাপড়, পায়ে সে আমলের হুড বার্নিশ, পাশে স্প্রিং দেওয়া জুতো। মুখে একটি সিগার। কড়া সিগারের গন্ধে রাস্তার লোকে নাকে কাপড় দেয়। ডাক্তার তাদের দিকে তাকিয়ে বলে—আন্‌সিভিলাইজড ক্রীচারস! ডাক্তারও নাকে রুমাল দেয়—বাড়ির পাশের ড্রেনগুলো দেখে। বলে—ডার্টি—হুইসেন্স! তার বেশ-ভূষার দিকে হাঁ ক'রে যারা চেয়ে থাকে তাদের সে বলে—হামবাগ!

পশ্চিম রাঢ়ের পল্লী, লোকেদের কথায় বিচিত্র টান—ঐকার, একার, চন্দ্রবিন্দু, ড়কারের ছড়াছড়ি; গিয়েছে হয়েছের স্থলে বলে—গৈছে, হইছে; কেনকে বলে কেনে; খেয়েছিকে বলে খেঁয়েচি; হারকে হাড়; রামকে বলে—ড়াম; নিতান্ত নিম্নস্তরের লোকে আবার রামকে বলে—আম, আর আমকে বলে—ড়াম। ডাক্তার শুনে বলে—বারবেরিয়ানস! ব্রুট্‌স! বাংলাতে বলে—অনার্য—বর্বরের দেশ।

বাজারের ভিতরের রাস্তাটা ধরে সে বরাবর চলে গেল ইস্কুলের দিকে। এখানে একটি এম-ই ইস্কুল আছে। পথে থানা। সে আমলের থানা, খানকয়েক চেয়ার, দুখানা টেবিল থাকলেও তক্তাপোশের আধিক্য ছিল বেশি; দারোগা-বাবুরও ভুঁড়ি ছিল; তক্তাপোশের উপরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে পান চিবুচ্ছিলেন আর গড়গড়ায় তামাক টানছিলেন। হঠাৎ এই এমন সজ্জায় সজ্জিত ডাক্তারকে দেখে তিনি ডাকলেন—চামারী সিং! দেখো তো—উ কৌন যাতা হ্যায়!

চামারী সিং পালোয়ান লোক, সে এসে গম্ভীর ভাবে বললে—এ বাবু সাব!

মুখ থেকে চুরোটটা নামিয়ে ডাক্তার অল্প একটু পাশ ফিরে বললে—ইয়াস্?

'ইয়েস'কে ডাক্তার বলে—ইয়াস্—লম্বা করে টেনে উচ্চারণ করে।

চামারী ঈষৎ চকিত হয়ে গেল—বললে—আপকে দরোগা-বাবু বোলাতে হেঁ।

—Wha—t? বোলাতে হেঁ? why? কাহে? আই এ্যাম নট এ চোর, নট এ জুয়াচোর, নায়দার এ ডেকইট—নর এ ফেরারী আসামী। Then why? থানামে কাহে যায়েগা?

চাপরাসী উত্তরোত্তর ভড়কাচ্ছিল, তবুও সে থানার জমাদার লোক, সে বললে —কেয়া নাম আপকো ? পাতা কেয়া ? কাঁহা আয়ে হ্যায় হিঁয়া—বাতাইয়ে তো !

ডাক্তার পকেট থেকে একখানা কার্ড বের করে চাপরাসীর হাতে দিয়ে বললে —সব লিখা হ্যায় ইসমে। দেও—তুমহারা দারোগা-বাবুকো! বলেই আবার চুরোটটা মুখে দিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে অগ্রসর হল।

পথে কয়েকটা কুকুর টুপি-পরা অপরিচিত এই মানুষটিকে দেখে—ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল! ডাক্তার হাতের ছড়িটা তুললে—বিরক্তি ভরে; দেখতে সৌখীন হ'লেও তার ছড়িটা বাবুছড়ি নয়—দস্তুরমত যষ্টি। পাকা বেতের, এবং মোটা অর্থাৎ বেড়ে প্রায় সে আমলের ডবল পয়সার মত, তার ওপর ডাক্তারের মত লম্বা মানুষের উপযুক্ত লম্বা; দু চার ঘা বেশ দেওয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই হেসে ফেলে ডাক্তার ছড়ি নামিয়ে নিলে—কুকুরগুলোকেই বললে—দ্যাটস্ গুড! বিশ্বাসী গ্রামভক্ত কুকুর! এঁটো-কাঁটার নুন খেয়ে নিমকহালাল! এঁ্যা! দ্যাটস গুড!—বলেই আবার অগ্রসর হল।

গ্রামের প্রান্তে এম-ই ইস্কুল। খ'ড়ো বাংলা ধরনের লম্বা বাড়ি। পাশেই একটা কোঠাঘরে হেডমাস্টার থাকেন। প্রবীণ লোক। বাসার সামনে বেঞ্চি পেতে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিলেন, আর খবরের কাগজ পড়ছিলেন। সে আমলের কাগজ—সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, অবশ্য ইংরিজী। ডাক্তার তার সামনে এসে দাঁড়াল—হ্যালো—আর ইউ দি ভেনারেবল হেডমাস্টার অব দিস স্কুল ?

হেডমাস্টার উঠে দাঁড়ালেন। —ইয়েস! বলে সবিস্ময়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ডাক্তার বললে—গুড ইভনিং! তারপর নিজের একখানি কার্ড বের করে হেডমাস্টারের হাতে দিয়ে বললে— এখানে প্র্যাক্‌টিস করতে এসেছি আমি। বাট ইউ সি—জীবনে বন্ধুর প্রয়োজন আছে। আই হ্যাভ কাম টু আস্ক ইউ টু বি এ ফ্রেণ্ড অব মাইন।

হেডমাস্টার হেসে বললেন—বসুন—বসুন।

—লেট মি হ্যাভ ইয়োর হ্যাণ্ড ফার্স্ট! মাস্টারের হাতখানি নিয়ে হ্যাণ্ডশেক ক'রে ডাক্তার বসল।

মাস্টার মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় উঠেছেন ? এখানে আর কেউ জানাশোনা আছে কিনা ? দেশে কে-কে আছে ? কোথায় দেশ ? কেমন অবস্থা—সে কথাও ইঙ্গিতে জানতে চাইলেন।

বেঞ্চের উপর বসে ডাক্তার তার লম্বা পা-দুখানি নাচাতে নাচাতে উত্তর দিলে আর চুরুট টানল। শেষের প্রশ্নের উত্তরে বললে—দেশ কলকাতার কাছেই। মা আছেন—তিনি থাকেন কাশীতে। স্ত্রী আছেন—পুত্র আছেন—কন্যাও আছেন। গরিব মনুষ্য আমি হেডমাস্টার—এ পুয়োর ম্যান।

মাস্টার প্রশ্ন করলেন—এখানেই যখন থাকবেন, তখন নিয়ে আসবেন তো এখানে?

—ডাক্তারের পা দুটো ঘন ঘন নাচতে আরম্ভ করলে—নো হেডমাস্টার, সে আইডিয়া আমার নাই।

—তা হ'লে? তাঁরা সেখানে থাকবেন কার কাছে?

—ও! ডাক্তার বললে—তাদের আমি বাপের বাড়িতে—আই মীন আমার শ্বশুরবাড়িতে রেখে এসেছি, সেইখানেই তারা থাকবে। একটু চুপ করে থেকে অনেকটা যেন হঠাৎ আবার বললে—ইয়াস্—হেডমাস্টার, সেইখানেই তারা থাকবে। এখানে আনার কথা—আমি ভাবতেও পারি না।

এরপর সে প্রায় চুপ করেই গেল—এবং অত্যন্ত দ্রুতভঙ্গীতে পা নাচাতে আরম্ভ করলে।

হেডমাস্টার বললেন—চলুন, আমি যাব গ্রামের দিকে, ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ হবে। চলুন।

ডাক্তার উঠে দাঁড়াল—সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে টুপি-মাথায় চায়না কোট পরা লম্বা লোকটিকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল, স্থির সুদীর্ঘ একটি রেখার মত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে বললে—গুড নাইট, হেডমাস্টার!

—সে কি! গ্রামের মধ্যে যাবেন না?

—নো! মাফ করবেন হেডমাস্টার। তাঁরা সব ধনী ব্যক্তি, পুরুষানুক্রমে জমিদার। আমি একজন গরিব মনুষ্য। খেটে খাই। Water and oil—ইউ সি, হেডমাস্টার—কখনও মিশ খায় না। গুড নাইট!

কথাটা গ্রামে অজানা রইল না কারুর। জানাতে অবশ্য বারণ করেনি ডাক্তার, কিন্তু ঢাক বাজিয়ে বলার মত ইচ্ছেও তার ছিল না। ঢাক বাজিয়ে যে কথাই বলতে যাক—তাতে গলাই শুধু উঁচুতে চড়ে না, রঙ চড়ে, কথাও কলাও হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। গাঁয়ের বাবুপাড়ায় কথাটা ঘোরালো এবং জোরালো হয়ে আলোচিত হতে আরম্ভ হল। কেউ

বললে - ডাক্তার বলেছে—গুণ্ডার দল সব। না কামিয়ে দর্জি। বাপের পয়সায় খায়, নিষ্কর্মার দল। মাতাল। লম্পট। অত্যাচারী।

ডাক্তারও শুনলে-শুনে হেসে বললে—ওরা নিজেরা নিজেদের সত্যি বিশেষণগুলো রাগের মাথায় আমার কথা ব'লে বলে ফেলছে। ওর একটাও আমার কথা নয়।

কেউ বললে—ডাক্তার বলছে—ইতর, ওদের আমি ঘেন্না করি। বলে থু থু করে থুথু ফেলেছে।

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বললে—না। একথা আমি বলতে পারি না।

বাবুরা বললে—দেখে নেব আমরা।

ডাক্তার একবারও কোনো জবাব দিলে না। শুধু হাসলে।

বাবুরা প্রায় হুকুম জানিয়েই প্রচার করে দিলে—ওকে বাবুরা কেউ ডাকবেই না, অন্য লোকেও যেন না ডাকে। দারোগা-বাবুর সঙ্গে বাবুদের খুবই সদ্ভাব। দারোগা-বাবুও সে মজলিশে ছিলেন।

সন্ন্যাসী প্রধান বললে—ডাক্তারবাবু, কাজটা ভাল হচ্ছে না। চলুন একদিন বাবুদের ওখানে যাই। গেলেই ব্যাপারটা মিটে যাবে।

ডাক্তার নিবানো আধখানা চুরোটাটি কামড়ে' ধরে দেশলাই জেলে ধরিয়ে ফেললে, বললে—বাবুরা আপনার যদি ক্ষতি করতে পারে বলে মনে করেন সন্ন্যাসী বাবু, বলবেন আমাকে—আমি তা হ'লে চলে যাব আপনার এখান থেকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা ব্যাপার ঘটে গেল। বাবুদের টমটমে চামারী সিং ছাতা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল একটি ছেলেকে—দশ বারো বছরের ছেলে। ছেলেটি চীৎকার করে উঠল—ও—মাগো—ও বাবা রে! প্রায় সে নেতিয়ে পড়ে গেল টমটমের উপর। চামারী সিং ব্যস্ত হয়ে উঠল, টমটমের কোচম্যানকে বললে—রোখো! গাড়িটা দাঁড়াল।

চামারী লাফ দিয়ে নেমে সন্ন্যাসীকে বললে—থোড়া পানি দিবেন তো প্রধান মাশা।

ডাক্তার উঠে এগিয়ে গেল গাড়ির কাছে। ছেলেটি পেট ধরে কাতরাচ্ছে। চামারী জল আনতেই ডাক্তার প্রশ্ন করলে—কি হয়েছে এর?

চামারী বললে—দরোগা বাবুর লড়কা।

—লড়কা তো বটে। কি হয়েছে?

প্রধান বললে—ভারি দুঃখের কথা ডাক্তারবাবু—ছেলেটির এই বয়সেই অম্বলশূল হয়েছে।

—আই সি। তা' এই রোদ্দুরে এই অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে কোথায়?

—কালীতলা। পাশের গাঁ দেবীপুরে ভারি জাগ্রত কালীমা আছেন—সেইখানে যাচ্ছে। ফি মাসে অমাবস্যেতে যেতে হয়। কালী-মায়ের ওখানেই পড়েছে—শেষ পর্যন্ত।

—হুঁ। কে বললে—শূল বেদনা?

—মা-কালীর ভরণে বলেছে।

ডাক্তার বললে—হামবাগ!

চামারী বিব্রত হয়ে প্রধানকে বললে—কি কহি হামি প্রধান মাশা?

ডাক্তার নিজেই ছেলেটিকে কোলে নিয়ে নিজের ঘরে এনে শোয়ালে। চামারীকে বললে—বোলাও তোমার দরোগা বাবুকে। যাও বলছি।

ডাক্তার দারোগাকে বললে—শূল-ফুল নয়। এ আপনাদের মা-কালীর বাবারও সাধ্যি নাই যে ভাল করে দেয়। বুঝলেন?

দারোগা অবাক হয়ে গেলেন, বিশেষ করে ডাক্তার যখন মা-কালীর বাবা তুলে জোর দিয়ে বললে—তখন আর তিনি কোন জবাব খুঁজে পেলেন না। কারণ কালীকেই তিনি ভাল ক'রে জানেন না কিন্তু ডাক্তার তার বাবার সংবাদ পর্যন্ত জানে। সে ক্ষেত্রে তিনি আর কি জবাব দেবেন?

ডাক্তার বললে—আমি ভাল ক'রে দিতে পারি। কিন্তু ফি দু টাকা, ওষুধের দাম এক টাকা—তিন টাকা লাগবে। ভাল না হয় টাকা ফেরত দেব আমি।

দারোগা বললেন—ওষুধ দিন—আমি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চুরুটে টান দিয়ে ডাক্তার হঠাৎ অত্যন্ত নিরাসক্ত হয়ে গেল যেন, বললে—ধারে কারবার আমি করি না।

চামারী সিং দৌড়লো—সন্ন্যাসী ব্যস্ত হয়ে বললে—আমি টাকা দিচ্ছি, ডাক্তারবাবু।

—দেবেন তাতে আমার আপত্তি কি আছে। কিন্তু আপনি ফেরৎ পাবেন তো?

ডাক্তার ওষুধ দিলে। একটা পুরিয়া আর একদাগ ওষুধ। বললে—পাইখানা হবে। ভয় পাবেন না।

দারোগা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলেন—পাইখানার সঙ্গে নাড়ীর মত লম্বা কি বেরিয়েছে। ডাক্তার বললে—শূল বেরুচ্ছে। কৃমি—কৃমি! ছেলের পেটে কৃমি ছিল।

—এত বড় কৃমি?

—হ্যাঁ। ভাল হয়ে গেল শূল বেদনা। যান বাড়ি যান। তারপর আবার বললে—আপনার মাথাতেও দেখছি কৃমি আছে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন যে রকম! হাসতে হাসতে আবার বললে—ওর ওষুদ আমার কাছে নাই। যান বাড়ি যান। প্রধান মশাইয়ের টাকা তিনটে দিয়ে দেবেন'। বুঝলেন?

... ...

এক চিকিৎসাতেই ডাক্তারের পসার জমে গেল। দারোগা প্রত্যেককে বললেন—ধন্বন্তরি। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।

ডাক্তার এতেও হাসে। এ হাসি কিন্তু অন্য রকম। ডাক্তারের হাসিতে কথায় যে একটা ধারালো ভাব আছে সেটা নেই এ হাসিতে। সন্ন্যাসিচরণও একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। ডাক্তার সন্ধ্যায় হেডমাস্টারের ওখানে যেতেই হেডমাস্টার হেসে বলেন, যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, রাতারাতি বিখ্যাত ব্যক্তি!

ডাক্তার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে, লম্বা ঘাড়টা একটু তুলে আপন মনে চুরুট টেনে যায়। আসর জমে না।

হেডমাস্টার জিজ্ঞাসা করেন—কি ব্যাপার ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে চুরুটটার দিকে তাকিয়ে বলে—নাথিং হেডমাস্টার!

—তবে?

ডাক্তার কোন উত্তর না দিয়ে বসে থাকে চুপ করে। ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে, আকাশে তারা ফুটে ওঠে; ডাক্তার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ বলে—হেডমাস্টার!

—বলুন!

—এগুলো ঠিক আমি পছন্দ করি না।

—কি? কি পছন্দ করেন না? ব্যাপারটা কি বলুন তো?

—ব্যাপার কিছু নয়। এই যে অনাবশ্যক—অনুচিত—অবাঞ্ছনীয় কৃতজ্ঞতা; দারোগার ছেলেটার কৃমি হয়েছিল পেটে, অত্যন্ত সাধারণ সোজা অসুখ, এক পুরিয়া স্যান্টোনাইন—এক ডোজ ক্যাস্টর অয়েলে ভাল হয়ে গেল;

আমি তার জন্যে দু'টাকা ফীজ—এক টাকা ওষুধের দাম নিয়েছি। তবুও দারোগা আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে গেল, চারিদিকে বলে বেড়াচ্ছে, আমি ধন্বন্তরি—এগুলো— অত্যন্ত—অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় মনে করি।

হেডমাস্টার অবাক হয়ে গেলেন।—কি বলছেন ডাক্তারবাবু? মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

—না। ডাক্তারের কণ্ঠস্বর যত রূঢ় তত দৃঢ়; হেডমাস্টার খানিকটা আহত হলেন মনে মনে, ডাক্তারের কথা বলার এই ধরনের জন্য। তিনি একটু চুপ করে থেকে বেশ শক্তভাবেই জবাব দিলেন—আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না আমি।

—ইউ আর এ ফু ল!

—কি বলছেন আপনি!

—ইউ ডোণ্ট নো হেডমাস্টার—ইউ ডোণ্ট নো। এই ধরনের কৃতজ্ঞতা —ব্যাড, ভেরি ব্যাড—অত্যন্ত খারাপ।

হেডমাস্টার দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে উঠলেন—কখনও না। এটা আপনার মনের দোষ!

ডাক্তার আবার বললে—ইউ আর এ ফু-ল!

এর পর ডাক্তারের সঙ্গে হেডমাস্টারের আরম্ভ হল ঈষদুষ্ণ তর্ক—ক্রমশ সে উষ্ণতা বাড়তে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে ডাক্তারের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত রূঢ় তীব্র উচ্চধ্বনিতে চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছিল। বলতে ভুলেছি—ডাক্তারের কণ্ঠস্বরটাই তীক্ষ্ণ, সরু আওয়াজ; কিন্তু ডাক্তারের আকৃতির মতই প্রস্থে কম হলেও ছ'ফুট উচু ডাক্তারের মতই বর্শা ফলকের মত দীর্ঘ এবং ধারালো।

ইস্কুলের সঙ্গে লাগাও একটা বোর্ডিং আছে;—এই বাদ-প্রতিবাদের উচ্চ কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে ছেলেরা অন্ধকারের মধ্যে অদূরে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দিকে দৃষ্টি পড়তেই হেডমাস্টার চুপ করে গেলেন। তিনি আসন ছেড়ে উঠে স্থান ত্যাগ করে এগিয়ে গেলেন ছেলেদের দিকে। মৃদু গম্ভীর স্বরে বললেন—বয়েজ, যাও-যাও পড়গে যাও! চল-চল! বলে তিনিও চলে গেলেন ছেলেদের সঙ্গে। ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। তারপর উঠল এবং উচ্চস্বরে বললে—হেডমাস্টার, আমি চললাম। গুড নাইট!

কয়েক দিনের মধ্যেই ডাক্তারের খ্যাতি আরও বেড়ে গেল। খ্যাতি বই কি। সু কিম্বা কু সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু প্রতিষ্ঠা যে ডাক্তারের

বাড়ল তাতে আর সন্দেহ নেই। লোকে বলতে লাগল—ভারি তেজী ডাক্তার। আগুন একেবারে।

কেউ বললে—ডাক্তার ভাল হলে কি হবে। যেমন দুর্মুখ তেমনি চামার।

কেউ বললে—পাষণ্ড।

দারোগা একদিন নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন—ডাক্তার তাঁকে প্রায় হাঁকিয়ে দিয়েছে। না-না-না, ও সব আমার অভ্যেস নেই। রোগীর বাড়ি ফীজ নিই, চিকিৎসা করি—নেমন্তন্ন খাই না।

মানুষ মরছে—কি ম'রে গেছে—সেখানেও ডাক্তার ফি-এর জন্মে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দয়ার জন্মে কেউ কাকুতি করলে বলে—দয়া করতে আমি আসিনি এখানে, স্ত্রীপুত্র ঘরবাড়ি ছেড়ে। ফীজ ছাড়তে আমি পারব না। না দিতে পার—ডেকো না আমাকে।

হেডমাস্টারকে বলে,—হেডমাস্টারের সঙ্গে পরের দিনই আবার মিটে গেছে—বিনা বেতনে আগেকার গুরুদের মত ছেলে পড়াতে পারেন আপনি ?

হেডমাস্টার চুপ করে থাকেন। এই উগ্রমস্তিষ্ক লোকটির সঙ্গে কোন মতামত নিয়ে আলোচনা করতে তিনি চান না, বিশেষ করে যেখানে সামান্য মত-বিরোধের সম্ভাবনা থাকে।

ডাক্তার পা নাচাতে সুরু করে। চুরুট টানতে টানতে বাঁকা সুরে বলে—অবশ্য এর চেয়ে তাতে লাভ বেশি হেডমাস্টার।

হেডমাস্টার মৃদু হাসেন।

ডাক্তার বলে—আরুণি গুরুর আল বাঁধতে গিয়ে জল আটকে শুয়ে থাকে। উতঙ্ক দেবদুর্লভ কুণ্ডল এনে দেয় গুরুপত্নীর জন্ম। শুঁড়ো থেকে, গরু থেকে—ধন-রত্ন মণি-মাণিক্য সব পাওয়া যায়। এমন কি শিষ্যের জীবনও চাইলে পাওয়া যায়।

আবার একটু চুপ ক'রে হেসে বলে—আমি ঠিক জানি না, তবে আমার মনে হয়—আরও বহুতর গুরুদক্ষিণার উপাখ্যান পুরাণে উল্লিখিত হয় নাই। আমি যদি ডাক্তার না হ'তাম হেডমাস্টার—তবে এগুলো নিয়ে রিসার্চ করতে পারতাম।

ব্যাপারটা চরমে উঠল—একটা সদনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী তরুণ—অনেক জল্পনা-কল্পনা করে একটি সেবা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করলে।

দরিদ্র গৃহস্থকে সাহায্য, অনাথ-আতুরের সেবা করবে তারা। প্রত্যেক গৃহস্থ-বাড়িতে একটি করে ভাঁড় দিয়ে বলে গেল, দৈনন্দিন গৃহস্থের খোরাকির চাল হতে এক মুঠো করে এই ভাঁড়ে তুলে রাখবেন। সাতদিনের সাত মুঠো চাল রবিবারে এসে নিয়ে যায়। এ ছাড়া অবশ্য ভদ্রলোকেদের ব্যবসায়ীদের কাছে মাসিক চাঁদাও তারা পাবে।

তারা ডাক্তারকে এসে বললে—আপনার কাছে টাকা সাহায্য আমরা নেব না। আপনাকে আমাদের ডাক্তার হিসেবে সাহায্য করতে হবে।

ডাক্তার প্রায় ক্ষেপে গেল। সোজা বলে দিলে—থিয়েটার কর তো চাঁদা দেব। মদ খাও, গাঁজা খাও, তাতে কোনদিন পয়সার অভাব হয়, আমার কাছে এসো। কিন্তু এ সব চলবে না।

তারা অবাক হয়ে গেল।

ডাক্তার বললে—যাও যাও—ক্লিয়ার আউট, ক্লিয়ার আউট!

একজন রুখে উঠল—কী বলছেন আপনি!

ডাক্তার বললে—আমি বলছি—গেট আউট! চলে যাও এখান থেকে।

গোটা গ্রাম জুড়ে এবার ডাক্তারের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন উঠল। জনকতক ছেলে ডাক্তারকে অন্ধকারে প্রহার দেবার জন্যে ষড়যন্ত্র করলে। জনকতক তাকে বয়কট করবার চেষ্টা করতে লাগল—অন্য ডাক্তার আনবার জন্য।

ডাক্তার কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। দাওয়ার উপরে চেয়ারখানিতে বসে পা দোলাতে লাগল। প্রধান মশায় কিছু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। অদ্ভুত মানুষ! লোকের অনুরাগে বিরাগে সমান নিস্পৃহ। নিঃসন্দেহে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর। লোকটি গ্রামের লোকের প্রীতি অনুরাগ সব কিছুকে উপেক্ষা ক'রে, অপমানিত ক'রে, তারই ঘরে রয়েছে—এতে তার মন খানিকটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করে পারছিল না। কিন্তু উপায় নেই, ডাক্তার পুরো বছরের ভাড়া দিয়ে রেখেছে। তা'ছাড়া—তার ব্যবহার রূঢ় কর্কশ যাই হোক—অন্যায্য কিছু নেই। সে তিক্ত অথচ শঙ্কিত দৃষ্টিতেই নিজের গদিতে বসে আড়চোখে ডাক্তারের দিকে প্রায় চেয়ে দেখে।

ডাক্তার শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে চুরুট টানে।

হঠাৎ যেন ডাক্তার উদাসীন হয়ে গেল। এটা নজরে পড়ল সর্বাগ্রে প্রধানের। সে কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলে না। তারপরই

লক্ষ্য করলেন হেডমাস্টার। ডাক্তার যেন অতিরিক্ত মাত্রায় স্তব্ধ। তর্ক-প্রসঙ্গে অত্যধিক উগ্র হয়ে ওঠার পর ডাক্তার অনেক সময় স্তব্ধ হয়ে থাকে। হেডমাস্টার লোকটিকে ভালবেসে ফেলেছেন। তিনি তখন বলেন—কি মশাই? এখনও আপনার রাগ গেল না?

ডাক্তার তাতেও উত্তর না দিলে হেসে মাস্টার বলেন—অন্ধকারে কেউ দেখতে পাবে না, আমিও চীৎকার করব না; রাগ যদি না মিটে থাকে—তো আমাকে নয় দু'ঘা মেরেই রাগটা মিটিয়ে ফেলুন।

ডাক্তার তাতে হেসে ফেলে। কিন্তু এবারের স্তব্ধতার সেরকম কোন কারণই নেই। তা ছাড়া এ স্তব্ধতার ধরনটাও অন্য রকমের। ডাক্তার শুধু স্তব্ধই নয়—অত্যন্ত অন্যমনস্ক—চুরুট খাওয়ার মাত্রাও বেড়ে গেছে। তর্কে পর্যন্ত রুচি নেই।

হঠাৎ উঠে ডাক্তার চলে যায়। খানিকটা গিয়ে বোধ হয় মনে পড়ে বিদায়-সম্ভাষণের কথা। থমকে দাঁড়িয়ে বলে—গুড নাইট, হেডমাস্টার।

হেডমাস্টার প্রশ্ন করেন নানাভাবে—কী হ'ল ডাক্তার?

চুরুট টানতে টানতে ডাক্তার বলে—নাথিং হেডমাস্টার।

—বাড়ির খবর ভাল তো?

—ভাল। হুঁ—ভাল! গুড নাইট, হেডমাস্টার। ডাক্তার উঠে পড়ে।

হেডমাস্টার চিন্তিত হলেন। কয়েকদিনই ডাক্তার আসছেন না। নিজেই সেদিন গেলেন তিনি ডাক্তারের ওখানে। কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল না। ডাক্তার বেড়াতে বেরিয়েছে। প্রধান মশায় ছিলেন নিজের দোকানে। তিনি সসম্ভ্রমে মাস্টারকে বসতে দিলেন তাঁর দোকানের সবচেয়ে ভারী চেয়ারখানা। তামাক তামাক করে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মাস্টার বললেন—থাক। ব্যস্ত হবেন না, প্রধান মশায়। আমি তো রয়েছি। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা না করে যাচ্ছি না। ধীরে সুস্থে আসুক না তামাক।

প্রধান বললেন—আশ্চর্য কাণ্ড হয়ে গেল মাস্টার মশায়। ডাক্তার হয় ক্ষেপে গেছে, নয় ছ' মাসের বেশি বাঁচবে না। হঠাৎ আর এক রকম হয়ে গেল।

—বলেন কি!

—হ্যাঁ। গরিব-দুঃখীর কাছে—ফীজ নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, ওষুধও অনেককে বিনা পয়সায় দিচ্ছে। আবার কাউকে কাউকে পথ্যের জন্যে পয়সাও দিচ্ছে।

হেডমাস্টার হাঁপ ছাড়লেন। বরাবরই তাঁর সন্দেহ ছিল। মনে হ'ত এ কঠোরতাটা তার অস্বাভাবিক, ধার করা, ছদ্মবেশের মত। যাক, লোকটা তা' হলে স্বাভাবিক হয়েছে।

ডাক্তার ফিরল প্রায় রাত্রি নটার সময়। নিস্তব্ধ জনহীন পল্লীর পথ। ডাক্তার গান গাইতে গাইতে আসছিল; অবশ্য মৃদুস্বরে গান। হেডমাস্টারকে দেখে স্মিত-হাস্যে সে বললে—হেডমাস্টার?

—হ্যাঁ। হেডমাস্টার উঠে ডাক্তারের হাত চেপে ধরে বললে—আই এ্যাম্ ভেরি গ্ল্যাড - আই এ্যাম ভেরি গ্ল্যাড, ডক্টর। সব শুনলাম।

ডাক্তার একটু চুপ করে থেকে বললে – কি শুনলেন, হেডমাস্টার?

হেসে হেডমাস্টার বললেন—আপনার গান তো নিজে কানেই শুনলাম। তারপর শুনলাম আজকাল আপনার ছদ্মবেশ ফেলে দিয়েছেন। গরিব-দুঃখীদের বিনা পয়সায় দেখছেন—ওষুধও দিচ্ছেন অনেককে বিনা পয়সায়, কাউকে-কাউকে পথ্যের পয়সাও দিচ্ছেন।—আমার সন্দেহ বরাবরই ছিল, ডাক্তার।

ডাক্তার একটু চুপ করে থেকে বললে—এক কালে—প্রথম যৌবনে মাস্টার মশাই—আজ আর সে হেডমাস্টার বললে না—বললে—মাস্টারমশাই—আমি সেবাধর্মকে গ্রহণ করেছিলাম – জীবনের ব্রত হিসেবে। বিবাহ করিনি। সংকল্প ছিল এমনি ভাবেই জীবন কাটিয়ে দেব। সে কি আনন্দ, সে কি তৃপ্তি। কিন্তু—ডাক্তার চুপ করে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ডাক্তার বললে—কিন্তু উপকারের ঋণ বড় মারাত্মক ঋণ, মাস্টার মশাই। আর মানুষ বড় ভাল——অত্যন্ত ভাল, এ ঋণ শোধ করতে তারা—। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার বললে—জীবনও দিতে পারে মানুষ। ডাক্তার আবার চুপ করে গেল। এবার বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল—তারপর বললে—গুড নাইট, হেডমাস্টার।

পরের দিন হেডমাস্টার প্রত্যাশা করেছিলেন—ডাক্তার আজ আসবে, কিন্তু ডাক্তার এল না। তার পরের দিন সকালেই প্রধান এসে সংবাদ দিলে—ডাক্তার চলে গেছে কাল রাত্রে।

চলে গেছে! হেডমাস্টার চমকে উঠলেন। চলে গেছে? ব্যাপার কি?

ঘাড় নেড়ে প্রধান বললে—জানি না। যাবার সময় শুধু বলে গেল—তক্তপোশ চেয়ার এগুলো আপনি নেবেন, প্রধান মশায়। ওষুধ-পত্রগুলো সদর শহরের ডাক্তারখানায় দিলাম। চিঠি লিখে দিলাম একটা—তাদের লোক এলে

দিয়ে দেবেন। শেষ কথা বললে—দয়া-ধর্ম—একবার যখন করেছি—তখন আর এর জের মিটবে না। এ আর বন্ধ হবে না। সুতরাং এখানে আর থাকা চলবে না।

হেড মাস্টার স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

দীর্ঘকাল পরে হেডমাস্টার একখানা চিঠি পেলেন। ডাক্তার লিখেছে। মৃত্যু-শয্যায় লেখা চিঠি—ডাক্তারের মৃত্যুর পর একজন উকীল চিঠিখানা রেজিস্ট্রী করে পাঠিয়েছে—ডাক্তারের অভিপ্রায় অনুযায়ী। বৃদ্ধ হেডমাস্টার পুরু চশমাটা চোখে দিয়ে চিঠিখানা পড়ে গেলেন। সুদীর্ঘ চিঠি। লিখেছে: মাস্টার মশাই, যে কথা আপনার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের দিনে শেষ করে বলে আসতে পারিনি, আজ সেই কথা সম্পূর্ণ অকপট চিত্তে জানালাম সুসমাপ্ত করে। কথাটা—মানুষের পুণ্যের, আমার পাপের। মনে আছে আপনাকে বলেছিলাম—উপকারের ঋণ মারাত্মক ঋণ। আর মানুষ বড় ভাল—এ ঋণ শোধ করতে জীবন পর্যন্ত দিতে পারে।—এক বিন্দু অতিরঞ্জন করিনি।

মাস্টার মশাই—আমার তখন তরুণ বয়স, অফুরন্ত উদ্যম, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দীন-দুঃখী অনাথ-আতুরের সেবা করে বেড়াতাম। মানুষের দুঃখে সত্যিই বুক ফেটে যেত, চোখে জল আসত। বিশ্বাস করুন—একবিন্দু কপটতা ছিল না। প্রবলের অত্যাচার, জমিদারের জুলুম, পুলিশের অন্যায় শাসন, মহাজনের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করতাম তাদের। ভয় কাউকে করতাম না। তাদের স্নেহ করতাম সর্বান্তঃকরণে। মানুষেরও কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না—অকপট,—অপরিমেয় কৃতজ্ঞতা। দেবতার মত ভক্তি করত, আমার পায়ে কাঁটা ফুটলে তারা দাঁত দিয়ে তুলে দিত। ছেলেরা অসঙ্কোচে পরমাত্মীয়ের মত আমার কাছে এসে দাঁড়াত। যুবকেরা ক্রীতদাসের আনুগত্য নিয়ে আমার মুখের কথার অপেক্ষা করত। বৃদ্ধেরা এসে বসত—বলত—আমার পায়ের ধূলো পেলে তাদের সর্ব পাপ মোচন হবে, পরলোকে সদ্গতি হবে। পথ দিয়ে চলে যেতাম—কিশোরী, যুবতী, বৃদ্ধা, কন্যা, বধূ, মাতারা শ্রদ্ধা-দীপ্ত অসঙ্কোচ দৃষ্টি মেলে আমার দিকে চেয়ে থাকত। আমার মনে হ'ত মাস্টার মশাই—সত্যিই আমি নেমে এসেছি দেবলোক থেকে—তরুণ দেবতা আমি।

তারা অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় আমার কাছে নৈবেদ্যের মত নিয়ে আসত—তাদের দৈনন্দিন জীবনের শ্রেষ্ঠ আহরণগুলি। ফুল-ফল, দুধ-মাছ, মাস্টার মশাই

—শ্রেষ্ঠ বস্তু এনে তারা আমার দরজায় দাঁড়াত—দেবমন্দিরে যেমন ভাবে তারা দিয়ে আসে তাদের সর্ববস্তুর অগ্রভাগ।

মাস্টার মশাই—হঠাৎ সব বিষিয়ে উঠল। অনিবার্য পরিণতিই বলব এ'কে। জীবনসমুদ্র মন্থন করতে গেলে বিষ উঠবেই। আমার ছিল না নীলকণ্ঠের শক্তি। মাস্টার মশাই, এ ভাবে অমৃতের লোভে জীবনসমুদ্র মন্থন করবার অধিকারী আমি ছিলাম না। যাক—যা ঘটেছিল, তাই জানাই। সেবার রথযাত্রা উপলক্ষে যাত্রীদল গিয়েছিল শ্রীক্ষেত্র। তারা ফিরে এল কলেরা নিয়ে। একটি দরিদ্র পরিবার ছিল দলের মধ্যে। প্রৌঢ় বাপ—প্রৌঢ়া মা—আর বিধবা যুবতী কন্যা। বাপ পথে মারা গিয়েছিল, কন্যাটির রোগ সবে দেখা দিয়েছে—এমন সময় এসে পৌঁছুল তারা গ্রামে। কন্যাটি যায় যায়—মা আক্রান্ত হ'ল। দুটি রোগীর মাঝ-খানে বসে—রাত কাটালাম আমি। এতটুকু ত্রুটি করলাম না। পরিশ্রম সম্পূর্ণ সার্থক হল না, মা-টি মারা গেল। মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এল—কন্যাটি। অনাথা মেয়েটি রোগমুক্ত হয়ে—নিরুপায় হয়ে চলে গেল—তার মামার বাড়ি। মাস কয়েক পরে একদিন পথে যেতে হঠাৎ দেখা হল মেয়েটির সঙ্গে। স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে, বৈধব্যের নিরাভরণতার মধ্যে তার সকরুণ মূর্তিখানি বড় ভাল লাগল আমার। বললাম—এই যে চমৎকার শরীর সেরেছে তোমার। বাঃ—ভারি আনন্দ হল। ভারি ভাল লাগছে তোমাকে দেখে।

পরদিন সে এল—কয়েকটা গাছের ফল নিয়ে।

দুদিন পর সে আবার এল—তার নিজের হাতের তৈরী মিষ্টান্ন নিয়ে।

আবার একদিন সে এল কিছু ফুল নিয়ে। কয়েকটি দুর্লভ ফুল—সে ফুলের গাছ ওদের বাড়িতে ছিল। আমি অন্য কোথাও দেখিনি। মাস্টার মশাই—ওই ফুলের রূপ এবং গন্ধের মধ্যেই ছিল বিষ।

মন আমার বিষিয়ে উঠল। তার মনে কী ছিল জানি না। কিন্তু আমার মনে কামনার হলাহল যেন উথলে উঠল। সেই দিন রাত্রেই আমি গিয়ে দাঁড়ালাম তার জানালার নিচে। মৃদুস্বরে ডাকলাম। জানালা খুলে আমায় দেখে সে অবাক হয়ে গেল।

মাস্টার মশাই—সে প্রথমটা শিউরে উঠেছিল—আমার প্রস্তাবে। কিন্তু আমার মধ্যে তখন প্রবৃত্তির আলোড়ন জেগে উঠেছে—কালবৈশাখীর ঝড়ের মত। আমি বললাম—এই তোমার কৃতজ্ঞতা! সে খাতকের মতই দীন ভাবে

নিজেকে সমর্পণ করে দিলে আমার বুভুক্ষিত প্রবৃত্তির কাছে। সেই যে জাগল ক্রূর প্রবৃত্তি তার নিবৃত্তি আর হল না। শুধু তার আহুতি নিয়েই তৃপ্ত থাকতে পারলাম না। মানুষের সকৃতজ্ঞ চিত্তের আনুগত্যের সুযোগে—বহুভোগের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। আমার কর্মের মর্মরখণ্ড থেকে এই মানুষগুলি তাদের কৃতজ্ঞতার পরিকল্পনায় গ'ড়ে তুলেছিল যে দেবমূর্তি, আমার আত্ম-প্রসাদের পূজায় সে দেবতা জাগল ক্ষুধা নিয়ে। মাস্টার মশাই, শয়তান ক্ষুধার্ত হয়ে মানুষকে আক্রমণ করলে—মানুষ তার সঙ্গে লড়াই করতে সাহস পায়, মানুষ বহুক্ষেত্রে তাকে বধ করেছে—বহু দৃষ্টান্তই তার কাছে। কিন্তু দেবতার ক্ষুধার্ত আক্রমণের মুখে মানুষ কিন্তু অসহায়। সেখানে তার কোনক্রমেই নিস্তার নাই! আমার ক্ষুধার্ত দেব-রূপ অবাধ গতিতে আদায় আরম্ভ করলে—তার নৈবেদ্য—তার বলি!

আজ হয়তো আপনি মাস্টারি করেন না; যদি করেন—তবে অনুরোধ রইল—ছেলেদের দেবতা হবার উপদেশ দেবেন না। মানুষ—শুধু মানুষ হতে উপদেশ দেবেন। দেবতাকে পূজা করতেও উপদেশ দেবেন না। তার সঙ্গে লড়াই করবার মত সাহস দেবেন তাদের। তারা যেন···যাক এসব কথা।

এর পর প্রাণপণে নিজেকে সংযত করতে চাইলাম; রাত্রির পর রাত্রি কাঁদলাম, উপবাস করলাম, তবুও—তবুও সংযত হল না প্রবৃত্তি। অনুশোচনারও অন্ত ছিল না। একদা মনকে স্থির করে—সেবাব্রত ত্যাগ করে দেশে ফিরে এসে—বিবাহ করলাম। আমার স্ত্রী সুন্দরী, গুণবতী, কিন্তু আশ্চর্য, মাস্টার মশাই—তাকে ভালবাসতে পারলাম না। আমি জানি তাকে আমি ভালবাসিনি। তাই—তাদের কাছেও থাকতে পারিনি। প্রাকটিসের অজুহাতে একখান থেকে অন্যখানে ঘুরেছি। জীবনে রূঢ় হতে চেয়েছি, মানুষকে দূরে রাখতে চেয়েছি। কটু বলেছি নিষ্ঠুরের মত—কিছু আদায় করে পিশাচ হতে চেয়েছি—মানুষের কৃতজ্ঞতার ভয়ে। ক্রমে বহু পরিবর্তন হয়ে গেল জীবনে। আমার ভাষা ছিল মিষ্ট—হলাম রুক্ষভাষী, কথায় কথায় রাগ হতে আরম্ভ হল, তর্ক করা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেল—কিন্তু—আসল পরিবর্তন হল না; সাপের বিষের থলি শূন্য করে দিলেও—আবার সে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে; দংশনের প্রবৃত্তিও তার যায় না মাস্টার মশাই। বারবার ঠকলাম। একবার কাউকে কৃতজ্ঞ হবার সুযোগ দিলে—রক্ষা থাকত না। আমার অন্তরের সরীসৃপ জেগে

উঠত। সেই সুযোগে সে প্রবেশ করতে চাইত তার ঘরে। তাই প্রাণপণে —সংসারটাকে নিছক দেনা-পাওনার—হিসেবের খতিয়ানের খাতায় পরিণত করতে চেয়েছি। কিন্তু পারিনি। হঠাৎ একদা আর আত্মসংবরণ করতে পারতাম না। সেদিন সত্যই সৎপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই—করুণার—কর্তব্যের প্রেরণাতেই মানুষের দুঃখের ভাগ নিতাম। তারপর আর রক্ষা থাকত না। আরম্ভ হয়ে যেত আমার জীবনের জটিল খেলার নূতন দান।

আপনাদের ওখানে হঠাৎ একদিন স্কুল থেকে ফিরবার পথে দেখলাম একটি দরিদ্র তাঁতীর ঘরে—একটি ছোট ছেলের তড়কা হয়েছে। প্রায় শেষ অবস্থা। কান্নাকাটি পড়ে গেছে। আত্মসংবরণ করতে পারলাম না। অযাচিত ভাবে গিয়ে শিশুটির আসন্ন বিপদ কাটিয়ে দিলাম। মন ভরে উঠল প্রসন্নতায়। সেদিন আপনি আমায় গান গাইতে শুনেছিলেন। আপনি বলার পূর্ব পর্যন্ত নিজে গান গেয়েও—আমার সে সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল না। আমি সেদিন গাইছিলাম—"বহু যুগের ওপার থেকে আষাঢ় এল আমার মনে"। সেদিন হঠাৎ আপনার কথায় চেতনা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেয়েছিলাম —আমার ভবিষ্যৎ। ছেলেটির মাকে মনে পড়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। মনে পড়ে গিয়েছিল আসন্ন বিপদ আশঙ্কায় বিহ্বল মায়ের অসংবৃত বেশবাসের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিতে পড়া তার দেহের কথা।

মাস্টার মশাই—সমস্ত রাত্রি সমস্ত দিন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে জিতেছিলাম। অজগরকে ঝাঁপিতে পুরে ওখান থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম।

মৃত্যুর পরপার যদি থাকে—তবে সেখানে দাঁড়িয়ে ব্যাকুলভাবে আপনি আমার সম্বন্ধে কি বলেন শুনবার প্রতীক্ষা করব। বলবেন।

মাস্টার মশাই দুটি হাত তুলে আপন মনে বললেন—নমস্কার!

বোবা কান্না

—এক—

"চৈতে কুয়া, ভাদরে বান, নরমুণ্ড গড়াগড়ি যান।"—খনার বচনে আছে। তেরো শো পঞ্চাশ সালের কার্তিক মাস, লোকে ওই কথাটা নিয়েই আলোচনা করে প্রায় সারাদিন। গত চৈত্র মাসে কুয়াশা হয়েছিল কি না—এ কথায় কেউ বলে, ওরেঃ বাপ রে! একেবারে কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার মত চারিদিকে ঢেকে গিয়েছিল; মনে নাই? কেউ বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কেউ ভুরু কুঁচকে গভীর চিন্তা ক'রে মনে করতে চেষ্টা করে। কেউ ঘাড় নাড়ে, যার অর্থ—হ্যাঁ অথবা না দুই হতে পারে। কেউ বলে, উঁহু, নাঃ। তা ছাড়া চৈত্রে কুয়াশার সঙ্গে নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাওয়ার সম্বন্ধটা যে কোথায়, তা ঠিক ধরাও যায় না।

মিহির মুখুজ্জের কাঁচা বয়েস, তাজা রক্ত, তার উপর ডাক্তার মানুষ, সে ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলে, যে দেশে আকাশে অমাবস্থে লাগলে পায়ে বাত টাটায়, সেই দেশেই চৈতে কুয়াশা হ'লে আট মাস পরে নরমুণ্ড গড়াগড়ি যায়। মধ্যে মধ্যে চ'টেও ওঠে, বলে, মা চণ্ডী আছেন, শনিসত্যনারায়ণ আছেন, বিপত্তারিণী আছেন তোমাদের, তাঁদের কাছে যাও না। রাত-দুপুরে আমায় জ্বালাতে এস কেন? চরণোদক খাওয়াওগে রুগীকে, ওষুধ দেব না আমি। যা তোদের ওই চণ্ডীমায়ের পাণ্ডা ভটচাযের কাছে; যা, ভাগ্, ভাগ্ এখান থেকে।

মিহির ডাক্তারের ভয়ানক রাগ ওই ভট্টাচার্যের উপর। ত্রিপুরা ভট্টাচার্য—চণ্ডীমায়ের পূজক, প্রবীণ মানুষ, অকৃত্রিম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, আচারে আচরণে এতটুকু ফাঁকি নাই, চণ্ডীমায়ের সেবা করেন প্রাণ ঢেলে, চোখ বুজে ধ্যান করতে ব'সে চোখের কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে, মায়ের নাম করতে আবেগে প্রৌঢ়ের ঠোঁট দুটি কাঁপে। লোকে বলে, গভীর রাত্রে নির্জনে মায়ের সঙ্গে ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের কথাবার্তা হয়। পাথরের মূর্তি থেকে মা নাকি বেরিয়ে এসে ভট্টাচার্যের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। অদ্ভুত স্বাস্থ্য তাঁর—আজও পর্যন্ত কখনও ওষুধ খান নাই। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা—গায়ে কখনও জামা কি চাদর কিংবা আলোয়ান কিছু দেন না, মাথায় ছাতা নেন না, পায়ে জুতোর কথা এর

পর বলবার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। এ গাঁয়ের লোক—যারা অপর জায়গায় গিয়ে ভট্টাচার্যের গল্প করে—তারা অন্তত প্রয়োজন বোধ করে না। ভট্টাচার্য হাসেন ডাক্তারের কথা শুনে। বলেন, উইপোকার পক্ষোদ্গমের আস্ফালন। দুজনের মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা লড়াই চ'লে আসছে।

এই ঝগড়া চ'লে আসছে নেপথ্য-দ্বন্দ্বের মত। দু-চারবার মুখোমুখি ঝগড়াও হয়েছে। সেবার হঠাৎ একদিন মিহির ডাক্তারকে ডাকতে এল ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের ছেলে। তার ছেলের অর্থাৎ ভট্টাচার্যের নাতির জ্বর হয়েছে; সাত দিন কেটে গেছে, কিন্তু জ্বর কোনক্রমেই বাগ মানে নাই, দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে—পেটে বেদনা, মাথার যন্ত্রণা, জ্বর একবারের জায়গায় দিনে দুবার বাড়ছে, প্রবল জ্বরের সময় দু-চারটে ভুলও বকছে রোগী। ভট্টাচার্যের ছেলে ডাক্তারের হাত দুটি চেপে ধ'রে বলেছিল, ডাক্তারবাবু, খোকাকে আপনি বাঁচান।

ডাক্তার মনে মনে ভাবছিল, ত্রিপুরা ভট্টাচার্যকে নিয়ে একটু রহস্য করবে কি না; কিন্তু অকস্মাৎ ভট্টাচার্যের ছেলের কাকুতিতে সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, তার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার চমকে গেল। ভদ্রলোকের দু চোখের কোণ থেকে জলের দুটি ধারা গড়িয়ে পড়ছে। ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে দরদী পরমাত্মীয়ের মত বললে, এ কি! তার জন্যে আপনি কাঁদছেন কেন? জ্বর আর কার না হয়! চলুন, এখুনি আমি যাচ্ছি, ভয় কি? আমি বলছি, ছেলে ভাল হয়ে যাবে।

ভট্টাচার্যের ছেলের নাম গিরিজা; গিরিজা চোখের জল মুছে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, বাবা বলছেন ডাক্তারবাবু—। আর সে বলতে পারলে না, বুকের ভিতর থেকে কান্না ঠেলে উঠে তার গলার ভিতরটা যেন চেপে ধরলে, শুধু ঠোঁট দুটি থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল, ঝ'ড়ো হাওয়ার তাড়নায় অশ্বত্থের পাতার মত।

কি বলছেন আপনার বাবা?—রাগে বিরক্তিতে ডাক্তারের কপালের মসৃণ চামড়া কুঁচকে উঠল, গলার স্বর রূঢ় হয়ে উঠল।

অনেক কষ্টে গিরিজা আত্মসম্বরণ ক'রে বললে, বাবা বলছেন, ডাক্তার ডাকবি ডাক্, কিন্তু মায়ের ইচ্ছের ওপর কারু হাত নাই।

ডাক্তার আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, বললে, মা তো পাথরের, তার আবার ইচ্ছে-অনিচ্ছে কি?

গিরিজা শিউরে উঠল, কিন্তু প্রতিবাদ ক'রে ডাক্তারকে চটাতে সে সাহস করলে না।

মায়ের ইচ্ছার কথা ত্রিপুরা ভট্টাচার্য নিজেই বললেন ডাক্তারকে।

অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে ছেলেটিকে দেখে ডাক্তার চিন্তিত মুখেই বাইরে এসে কল-বক্স থেকে ওষুধ বের ক'রে নিজে হাতে মিকশ্চার তৈরি ক'রে দিলে, ইন্‌জেক্‌শন দিলে, একখানা কাগজে যথাসম্ভব সরল ভাষায় কখন কি করতে হবে লিখে দিলে। এতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা ভট্টাচার্য একটি কথাও বলেন নাই। এবার অদ্ভুত একটু হাসি হেসে বললেন, দেখলেন ?

দেখলাম। টাইফয়েড। দেখাতে একটু দেরি হয়ে গেছে।

ত্রিপুরা ভট্টাচার্য নীরবে আবার একটু হাসলেন।

ডাক্তার বললে, রোগ অনেকটা বেড়ে গেছে। তা যাক। ভয় নেই, সেরে যাবে।

ভট্টাচার্য ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়লেন। অর্থ তার সুস্পষ্ট।

ডাক্তার এবার ফেটে পড়ল। বললে, আপনি কি মানুষ ?

ভট্টাচার্য বললেন, মানুষ বড় অসহায় ডাক্তারবাবু, তার কোন হাত নাই।

কি বলছেন আপনি !

ও ছেলে বাঁচবে না।

ডাক্তার স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ভট্টাচার্য বললেন, সে কথা গিরিজাকে আমি বলেছি। তবে বাপের মন, যা করতে চায় করুক, আমি বাধা দেব না। কিন্তু—। কথা অসমাপ্ত রেখে ত্রিপুরা ভট্টাচার্য আবার হাসলেন।

ডাক্তার অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় কঠিন কণ্ঠে বললে, আপনি এসব বলবেন না ওঁদের কাছে। ওঁরা নার্ভাস হ'লে সেবা-যত্ন ঠিকমত হবে না, রোগীকে বাঁচানো সত্যিই কঠিন হবে।

ত্রিপুরা ভট্টাচার্য বললেন, মা আমাকে স্বপ্নে বলেছেন ডাক্তারবাবু, ও রোগ সহজও নয়, কঠিনও নয়, ও রোগ মৃত্যু-রোগ।

শুধু একদিন নয়, আটাশ দিন পর্যন্ত ছেলেটিকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলল ; এই আটাশ দিনের প্রথম সাত দিন বাদ দিয়ে একুশ দিনই ত্রিপুরা ভট্টাচার্য ওই একই কথা বলেছেন, একই হাসি হেসেছেন, একই স্থির শান্ত

ভাবে বাইরের দাওয়াটির উপর ব'সে ডাক্তারের রোগী দেখে বেরিয়ে আসার অপেক্ষা করেছেন। ডাক্তারেরও যেন জেদ চেপে গিয়েছিল, সে ফীয়ের কথা বলে নাই, ওষুধের দামের হিসাব রাখে নাই, নিজে থেকে প্রত্যহ দুবার ক'রে নিয়মিত রোগী দেখেছে, দরকার বুঝলে রাত্রে পর্যন্ত থেকেছে; আঠারো দিনের রাত্রে, একুশ দিনের রাত্রে, আটাশ দিনের রাত্রে—সে সমস্ত রাত্রি রোগীর বিছানার পাশে ঠায় জেগে ব'সে থেকেছে। আটাশ দিনের রাত্রে, তিনটার পর মিহির বেরিয়ে এল রোগীর ঘর থেকে।

ত্রিপুরা ভট্টাচার্য দাওয়ার উপর ব'সে ছিলেন, ডাক্তারকে বেরিয়ে আসতে দেখেই বললেন, তারা মা! তারপর সুস্পষ্ট একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

ডাক্তার রূঢ় স্বরে বললে, না। আপনার ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। আজকের ক্রাইসিস কেটে গেছে।

ভট্টাচার্য আজ চমকে উঠলেন।

ডাক্তার বললে, কাল থেকে রোগীর অবস্থা ভালর দিকেই চলবে মনে হচ্ছে। সবিস্ময়ে ভট্টাচার্য ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

ডাক্তারের অনুমান মিথ্যা হ'ল না, ছেলেটি এর পর ধীরে ধীরে সেরেই উঠল পঁয়তাল্লিশ দিনের পর সে অন্নপথ্য করলে।

আরও একবার হয়েছিল এমনই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ।

গ্রামের ধনী জমিদারের মাতৃহীন দৌহিত্র মাতামহ-মাতামহীর যাকে বলে চক্ষের মণি; দুরন্ত ছেলে চুরি ক'রে একটা সন্দেশ মুখে দিয়ে মেঝের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ল; তারপর ক্রমশ প্রচণ্ড আক্ষেপের সঙ্গে ধনুকের মত বেঁকতে আরম্ভ করলে। মিহির ডাক্তার লক্ষণ দেখে অনেক অনুসন্ধানে আবিষ্কার করলে, ঘোড়ার আস্তাবলে খেলতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে, পায়ের একটা আঙুলের নখ উঠেছে। কথাটা অনেক দিনের। তখন গত মহাযুদ্ধের আমল, ওষুধ এ দেশে তখন তেমন তৈরি হ'ত না, ভারত মহাসাগরে 'এম্‌ডেনে'র দৌরাত্ম্যে বিদেশ থেকেও মাল আসত না, মিহির ডাক্তারের যে ওষুধটির দরকার ছিল, সে কোনক্রমেই পাওয়া গেল না। বড়লোকের বাড়ি, মিহির ডাক্তার দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে না রেখে স্পষ্টই বললে, ওষুধ নেই, আমার কোন হাত নেই।

ওষুধের অভাবে কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার এলেন; দেবমন্দিরে পূজা গেল, স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হ'ল। কলকাতার ডাক্তার মিহির ডাক্তারের কথাই সমর্থন করেন, কোন আশা নেই।

মাতামহী মার্বেল পাথরের মেঝের উপর মাথা কুটতে আরম্ভ করলেন; তাঁর সে বুকফাটা কান্নায় বাড়িটা ভ'রে গেল শ্বাসরোধী শোকের আবেগে। ছেলেটি বিছানার উপর প'ড়ে আছে—নিথর, নিস্তব্ধ। শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে ব'লে পাঁজরের উপরটা শুধু নড়ছে; মধ্যে মধ্যে এক-একটা আক্ষেপ আসছে, আর সমস্ত লোক শ্বাস রুদ্ধ ক'রে স্থির দৃষ্টিতে রোগীর দিকে তাকিয়ে থাকছে—হয়তো হঠাৎ এখুনি সব স্থির হয়ে যাকে।

বাইরের ঘরে শেষকৃত্যের সমস্ত আয়োজন সংগৃহীত হ'ল। হাঁড়ি, কুঁচি, কড়ি, সোনা, রুপো, শববহনের খাট এবং আরও অনেক জিনিস। জনচারেক মজুর সন্ধ্যার পর শবদাহের কাঠ কাটতে আরম্ভ করলে।

এই সময় ত্রিপুরা ভট্টাচার্য এলেন। তিনি এসেছিলেন চণ্ডীমায়ের স্থানে ছেলের কল্যাণ-কামনায় যে পূজা করেছিলেন, সেই পূজার নির্মাল্য এবং দেবীর চরণোদক নিয়ে। ছেলের মাতামহী তাঁকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন, মা আমার এই করলেন?

পরিবারটির সত্যই প্রগাঢ় দেবভক্তি, বিশেষ ক'রে ওই মাতামহীটির।

ত্রিপুরা ভট্টাচার্য নির্মাল্য এবং চরণোদক নিয়ে এগিয়ে গেলেন, বললেন, ভয় কি মা? ছেলে বাঁচবে, মা আমাকে বলেছেন।

মিহির ডাক্তার বাইরে ব'সে ছিল, সে একটু হাসলে। হেসে, সে উঠল। বললে, থেকে কোন লাভ নেই। শরীরও খারাপ হয়েছে আমার। আমি বাড়ি যাই।

বাড়ির কর্তা তবু ছাড়লেন না। বাইরে নিরিবিলি বিছানার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন, বললেন, বাড়িতেও ঘুমুবেন এখানেও ঘুমুবেন। আমি ডবল ফী দেব।

মিহির ডাক্তার একটু ভেবে বললে, আমি থাকছি, কিন্তু আজ কোন ফী দিলে আমি নেব না—এই শর্তে থাকছি আমি।

রাত্রি তিনটের সময় তাঁর ঘরে ঘা দিয়ে কম্পাউণ্ডার ডাকলেন, ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু! ডাক্তার বিরক্ত হয়েই উঠল। কি করবে সে? কি করবার আছে?

কম্পাউণ্ডার বললে, আসুন একবার। রোগীর জ্ঞান হয়েছে, চোখ মেলে তাকাচ্ছে, কথা বলছে, চোয়াল ছেড়ে গেছে।

জ্ঞান হয়েছে? চোখ মেলে তাকাচ্ছে? চোয়াল ছেড়ে গেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই চরণামৃত দিচ্ছিলাম মধ্যে মধ্যে।

চরণামৃত? সিঁদুর-তেল বাতাসা-গোলা জল?

কম্পাউণ্ডার আমতা আমতা ক'রে বললে, আজ্ঞে, রাণীমা বললেন, ওষুধ যখন যাচ্ছে না, ডাক্তারেরা যখন হাল ছেড়েছে, তখন মধ্যে মধ্যে মায়ের চরণামৃত ছাড়া আর কিছু দিও না, তাই—। সে অপরাধীর মতই চুপ ক'রে গেল।

অসহিষ্ণু ডাক্তার বললে, তারপর?

সবই কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল, একবার বিরক্ত হয়েই মশাই, সত্যি বলছি আপনাকে, একটু বেশি ক'রে চরণামৃত দিলাম কষ ফাঁক ক'রে। গলা দিয়ে খানিকটা গেল। একটা হেঁচকি উঠল। আমি ভাবলাম, হ'ল এইবার, বুকে লাগল জল। ঠিক তারপরেই ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠল, দিদিমা!

ডাক্তার এসে রোগীর পাশে বসল। সত্যিই রোগী চোখ মেলে চেয়েছে। ডাক্তার সর্বাগ্রে তাকে একটু গরম দুধ দেবার ব্যবস্থা করলে। দুধ খেয়ে ছেলেটা কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে, আমার সন্দেশ? আমার সন্দেশ কি হ'ল? আমি সন্দেশ খাব। চেতনা হারাবার পূর্বমুহূর্তে সে যে সন্দেশ চুরি করেছিল সেই সন্দেশের কথা মনে পড়েছে তার। সমস্ত বাড়ির লোক হেসে উঠল।

প্রায় সেই মুহূর্তেই বাইরে শোনা গেল ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের কণ্ঠস্বর। 'সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। তুমি যা করাও মা, তাই করি, লোকে বলে করি আমি।' ঘরে ঢুকে সমস্ত শুনে তিনি বললেন, দাও, ওকে সন্দেশই খেতে দাও, মায়ের পুজোর থালায় প্রসাদী মিষ্টি আছে দেখ, তাই এনে দাও।

ডাক্তার উঠে পড়ল। স্টেথোস্কোপটা গুটিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কিন্তু কেউ বললে না, ডাক্তারবাবু, যাবেন না।

মিহির ডাক্তার অবিশ্বাস করলেও ত্রিপুরা ভট্টাচার্য চৈত্রে কুয়াশার ফলে নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাওয়ার প্রবচনে অবিশ্বাস করেন না। বলেন, ক্রোধের পূর্বে

কালের ভ্রূকুটি ওটা। কিন্তু তিনিও ঠিক স্মরণ করতে পারেন না, সেই ঘন কুয়াশাটা চৈত্র মাসে হয়েছিল কি না। তবে নরমুণ্ড যখন গড়াগড়ি যাচ্ছে, তখন হয়তো—। ভট্টাচার্য ভাবেন, চৈত্রে কুয়াশা হ'লে তো সেই সময়েই তিনি এই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের চেষ্টা করতেন; মায়ের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করতেন অসহায় মানুষের জন্য। মা যে মহাকালী, ভ্রূকুটিকুটিল মহাকালের সম্মুখে তিনি যদি মোহিনী বেশে দাঁড়াতেন, তবে মহাকালের ভ্রূকুটি যে মিলিয়ে যেত, প্রসন্নতায় তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত বৃষভবাহন বরবেশী শিবের মত।

... ...

চৈত্রে কুয়াশা নিয়ে মতদ্বৈধ যতই থাক, ভাদ্রে বন্যার কথা কথা নয়, কাহিনী নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তব। দামোদর, অজয়, কোপাই, বক্রেশ্বর, ময়ূরাক্ষী, গঙ্গায় যে ভীষণ বন্যা হয়ে গেল, শ্রাবণে আরম্ভ হয়ে ভাদ্র পর্যন্ত চারদিকে যে জলপ্লাবন ব'য়ে গেল, তার স্মৃতি এখনও মানুষের চোখের উপর ভাসছে। দামোদর-অজয়ের বাঁধ এখনও ভেঙে রয়েছে। ভাঙন দিয়ে এখনও জলস্রোত বইছে নদীর মত। সুজলা সুফলা 'আউয়ল' জমি দহ হয়ে গেছে; তার দু পাশে হাজার হাজার বিঘা জমির উপর বালি চেপে বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি ধু-ধু করছে। বালি এখন ভিজে রয়েছে, যখন জল শুকিয়ে যাবে তখন বাতাসে বালি উড়বে হু-হু ক'রে; খাঁ-খাঁ করবে মরুভূমির মত। লক্ষ্মীর আসনকে বন্যার স্রোত বোধ হয় চিরদিনের মত ভাসিয়ে নিয়ে গেল; ধানের চাষ আর কোনদিন বোধ হয় হবে না এসব জমিতে। অন্তত দু পুরুষের কালে আর নয়। বালি-চাপা জমিগুলোর মধ্যে মধ্যে গর্ত, গর্তগুলোয় জল জ'মে আছে। যত জল শুকিয়ে আসছে, তত সেখান থেকে পচা দুর্গন্ধ উঠছে। সকাল-সন্ধ্যেতে মানুষ গরু ও-পথে হাঁটলে পাগল হয়ে যায়; মৌমাছির চাকে খোঁচা দিলে ঝাঁক বেঁধে যেমন মৌমাছির দল যাকে পায় তাকেই আক্রমণ করে, তেমনই ভাবে মশা এবং মাছির ঝাঁক মানুষ-গরুকে ছেঁকে ধ'রে মাথার চারপাশে ঝাঁক বেঁধে ওড়ে। মাঠের মধ্য দিয়ে যে রাস্তাগুলো ছিল, তার চিহ্ন পর্যন্ত নাই। এত বড় বড় রাস্তা, বাদশাহী শড়ক গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, সে রাস্তা পর্যন্ত ভেঙে-চুরে খোয়া ইট পাটকেল পাথর সমস্ত উপড়ে দিয়ে কালভার্ট ভেঙে একেবারে 'জাওন গাড়ি' অর্থাৎ পঙ্কক্ষেত্র ক'রে দিয়ে গেছে। রাস্তা ছোট কথা, রেল-কোম্পানির এমন মজবুত লাইনের বাঁধ, সে পর্যন্ত ভেঙে ধুয়ে নিয়ে গেছে;

বোল্ট-নাটে আঁটা লোহার লাইন বেঁকে কোথাও ভেঙে গেছে, কোথাও ঝুলছে ত্রিশঙ্কুর মত। একটা ব্র্যাঞ্চ লাইনের মাঝারি আকারের একটা ব্রিজের দশটা পিলারের মধ্যে তিনটে পিলারের গোড়ায় মাটি এমন খুলে গেছে যে, সেখানে জলের গভীরতা পঁচিশ থেকে ত্রিশ ফুট, একটা পিলার মুচড়ে ভেঙে দুখানা হয়ে গেছে। এখনও অবশ্য উপরের রেললাইনের ভারে এবং লাইনের বাঁধনের টানে কোনমতে ত্রিভঙ্গ-মুরারির মত দাঁড়িয়ে আছে সেটা, এবং রেল-কোম্পানি সেটাকে মোটা রশা ও তারের রশি দিয়ে বেঁধেছে চারপাশে, বড় বড় মজবুত শালের ঠেকাও দিয়েছে। সেটার উপর দিয়েই পিঁপড়ের মত সুড়সুড় ক'রে এখন ট্রেন পার হয়। প্যাসেঞ্জারদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে; হঠাৎ কেউ হয়তো ভয়ে আতঙ্কে চীৎকার ক'রে ওঠে, হরিবোল! সঙ্গে সঙ্গে হরিধ্বনির রোল উঠে যায়। মুসলমানেরা এসব অঞ্চলে সংখ্যায় কম। তাদের কখনও ধ্বনি তুলতে শোনা যায় না, কিন্তু উৎকণ্ঠায় সমান স্থির হয়ে ব'সে থাকে। মিহির ডাক্তারও মধ্যে মধ্যে যায় আসে এই পথে। সে জানে, বহুদর্শী বিচক্ষণ এঞ্জিনীয়ার বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে অনেক বিবেচনার পর নিরাপত্তার বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হয়ে তবে ট্রেন চলাচল করতে দিয়েছে, তবুও তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায় এই সময়টায়। সেও অপরাপর যাত্রীদের মত স্থির আড়ষ্ট হয়ে ব'সে থাকে। ত্রিপুরা ভট্টাচার্যও মধ্যে মধ্যে যান এই পথে গঙ্গাস্নানে; নিয়তিরহস্যকে তিনি—রসসাহিত্যকে রসিকজনের গ্রহণ করার মত—নির্বিকারভাবে গ্রহণ করেছেন বা গ্রহণ করতে চেষ্টা করেন, তিনি পর্যন্ত এই সময়ে স্থির শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চেয়ে নিস্পন্দ হয়ে ব'সে থাকেন, হৃৎস্পন্দন তাঁরও বাড়ে।

এই সমস্ত প্রত্যক্ষ ধ্বংসলীলা বাদেও যে কোন স্থানের মাটিতে পা দিলেই মনে পড়ে ভাদ্রের বন্যার কথা। মাটি এখনও ভিজে, রাত্রি একটু গাঢ় হ'লেই মাটিতে পা দিলে মনে হয়, স্যাঁতসেঁতে নদীকূল দিয়ে চলেছি। মিহির ডাক্তার এবং ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের গ্রাম ফুল্লরাপুর যে এমন শুকনো খটখটে গ্রাম, যে গ্রাম সম্বন্ধে লোকে চিরকাল ব'লে আসছে 'দুনিয়া ডুবলে এক হাঁটু জল', সে গ্রামে পর্যন্ত এবার বানের জলের ঠেলা এসে পৌঁছেছিল। গ্রামের মাটি পর্যন্ত এখনও শুকোয় নাই। কার্তিক মাসে সন্ধ্যার পর ঠাণ্ডা অবশ্য চিরকালই পড়ে, কোন কোন বার ভোর-রাত্রে গায়ে কাপড়ও দিতে হয়, এবার কিন্তু কার্তিকের প্রথমেই লেপ পাড়তে হয়েছে, সন্ধ্যার পর

থেকেই মেঝেতে পর্যন্ত যেন হিম ওঠে। ভাদ্রের বন্যাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না এবং সেই বন্যার ফলে যে নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাবে বা যাচ্ছে তাতেও কারও কোন মতদ্বৈধ নাই। ত্রিপুরা ভট্টাচার্যেরও না, মিহির ডাক্তারেরও না। তবু কিন্তু দুজনের মনের বিরোধ মেটে নাই। ভট্টাচার্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

মিহির ডাক্তার নিষ্ঠুর অবজ্ঞায় হেসে বলে, অতএব তোমরা মায়ের রুষ্ট ইচ্ছাকে তুষ্ট করবার জন্যে পূজো দাও, মানত কর, প্রণামী দাও।—ব'লে বক্রহাসি হেসে স্পিরিটে ভেজানো তুলো দিয়ে ইঞ্জেক্‌টিং সিরিঞ্জের সূচটা মুছে নেয়, তারপর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জেলে সামান্য এক টুকরো ওই তুলো জ্বালিয়ে সূচটাকে পরিশোধন ক'রে নেয়।

ডাক্তারখানার বাইরের দাওয়ায় ব'সে শশী ডোম বলে, ডাক্তারবাবু!

কে? শশী?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কি? কুইনিন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

রোগীতে কুইনিন পাচ্ছে না, তোকে কোত্থেকে দেব রে?

শশী বললে, আজ্ঞে, তা হ'লে যে আমি ম'রে যাব বাবু, রোগ ধরলে—। শশী চুপ ক'রে যায়। ডাক্তার একটু হাসে। বলে, কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যাবে। এই ধান-চালের বাজার, তার ওপর তোর আবার রাত্রের কাজ! কি রে? ডাক্তার এবার হা-হা ক'রে হাসে।

শশী মাটির দিকে মুখ নামিয়ে চুপ ক'রে থাকে। সেও মুচকে মুচকে হাসে, এবং সে হাসিটুকু অপরের কাছে লুকোবার জন্যই সে মুখ নামায়।

—দুই—

শশী ডোম এ অঞ্চলে সর্বজনপরিচিত ব্যক্তি। সরকারী মহল থেকে ভিখিরী-নিকিরি, এমন কি এখানকার কুকুরগুলো পর্যন্ত তাকে চেনে। সে হিসেবে শশীর খ্যাতিকে অস্বীকার করা চলে না; তবে বিখ্যাত নয়, কুখ্যাত শশী এখানকার পাকা দাগী চোর। শশী ম্যালেরিয়ার সময়টায় কুইনিন খায়। শুধু এবার এই নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাবার বছরেই নয়, বরাবরই

সে খায়। 'কার্তিকের সাত অঘ্রানের আট, ভাতার পুতকে যতনে রাখ, হাঁড়ি তুলে শুধাবি ভাত।' এ সময়টায় পেট পুরে খেতে দিতে পর্যন্ত বারণ আছে। শশী সেও পালন করে। কুইনিন খাওয়ার উপকারিতা সে বুঝে এসেছে জেলে। সে অনেক দিন আগে, শশীর তখন কাঁচা বয়েস, জেল বোধ হয় দ্বিতীয় বারের জেল, বর্ধমান জেলে কয়েদীদের মধ্যে কম্পজ্বর দেখা দিয়েছিল। সেই সময় সপ্তাহে দু দিন কি তিন দিন কয়েদীদের ফাইলবন্দী অর্থাৎ সারিবন্দী দাঁড় করিয়ে জেল-ডাক্তার প্রত্যেকের হাতে দিত এক-একটা কুইনিনের বড়ি; তারপর জমাদার হাঁকত, স—র—কা—র—

কয়েদীরা সেলাম দিয়ে টপাটপ মুখে ফেলে দিত কুইনিনের বড়ি। এর ফলে শশী ওই কম্পজ্বরের লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যেও মহাবীরের মত অকম্পিত শরীরে দিন দিন উত্তরোত্তর শক্তি-সামর্থ্য লাভ করেছিল; সঙ্গে সঙ্গে সে উপলব্ধি করেছিল 'কুনিয়ানে'র উপকারিতা। অবশ্য আরও একটা বল তার ছিল, ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের দেওয়া মা চণ্ডীর আশীর্বাদী দিয়ে তৈরী করা মাদুলি। 'কুনিয়ান্' খাওয়ার সঙ্গে মাদুলিটা ধুয়েও সে নিয়মিত জল খেত। ডাক্তারেরা বলেন, ব্র্যাণ্ডি সহযোগে কুইনিনের কার্যকরী শক্তি বেড়ে যায়; শশীর ধারণা, ভট্টাচার্যের মা-চণ্ডীর মাদুলি ধোয়া জল সহযোগে ডাক্তারী 'কুনিয়ান' অব্যর্থ। ম্যালেরিয়ার বাবারও সাধ্যি নেই যে, কাছে আসে। শশী তার সহচর-অনুচরদের বহুবার এ কথা বলেছে। কিন্তু তারা তেতো ব'লে আর কান ভোঁ-ভোঁ করে ব'লে 'কুনিয়ান' কিছুতেই বরদাস্ত ক'রে উঠতে পারে না।

শশী মিহির ডাক্তারের দোকান থেকে ম্যালেরিয়ার সময় নিয়মিত কুইনিন কিনে খায়; চণ্ডীতলায় যায়, কোনদিন দুটো কলা, কোনদিন দুটো শশা, কোন দিন বা গণ্ডাখানেক উচ্ছে মায়ের উঠনে ঢেলে দিয়ে প্রণাম করে, ভট্টাচার্য মশাইকে বলে, একটুকুন চন্নামেত্য দেবেন বাবা।

ভট্টাচার্য প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিতে পারেন না, শশীর হাতে চরণামৃত দিয়ে বলেন, তোর ভক্তি তো অগাধ রে শশী, কিন্তু মা তোকে সুমতি কেন দেন না, সেইটে বুঝি না।

শশী চরণামৃতটুকু সুপ ক'রে মুখে টেনে নিয়ে হাতখানি মাথায় বুলোতে বুলোতে দাঁত মেলে হাসে।

মিহির ডাক্তারের কুইনিন এবং ভট্টাচার্য মশাইয়ের চরণামৃতের বলে

বলীয়ান হয়ে সে গভীর রাত্রে বর্ষার ঝিপিঝিপি জলে ভিজে, হিমেল বাতাস গায়ে লাগিয়ে চুরি ক'রে বেড়ায়।

মিহির ডাক্তার এবং ত্রিপুরা ভট্টাচার্য দুজনেরই উপর সমান ভক্তিমান শশী। ডাক্তার এবং ভট্টাচার্য দুজনেই এই নিষ্ঠার জন্য চোর শশীকে না ভালবেসে পারেন না।

ডাক্তারের কথা শুনে শশী একটু চিন্তিত হ'ল। ডাক্তার বললেন, সত্যিই কুইনিন আজ পাবি না। শশীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। 'কুনিয়ান' পাওয়া যাবে না?

দূরে আকাশে কোথায় গোঁ-গোঁ শব্দ উঠেছে। রাস্তার লোকজন মধ্যে মধ্যে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। ছোট ছেলেগুলোর হাড়-পাঁজরাসার অবস্থা; কেউ দু দিন, কেউবা চার দিন মাত্র জ্বর থেকে উঠেছে, এই অবস্থাতেও সব ছুটে বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে। উড়ো-জাহাজ! উড়ো-জাহাজ!

শশী একবার আকাশের দিকে তাকালে, উড়ো-জাহাজটা এখনও নজরে পড়ার মত কাছে আসে নাই; দেখা যাচ্ছে না। দেখতেও ইচ্ছে হয় না। এক তো দেখে দেখে অরুচি ধরেছে প্রায়। সকাল থেকে রাত্রি দু পহর তিন পহর পর্যন্ত ওগুলোর যাওয়া-আসার বিরাম নাই; গোঙাতে গোঙাতে যাচ্ছে আসছে, আসছে যাচ্ছে। কখনও একখানা, কখনও দুখানা চারখানা একসঙ্গে মধ্যে মধ্যে প্রাবার দশ-বিশখানা—পাখীর দলের মত ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়। তার উপর, ওগুলোর উপর শশীর ভয়ানক রাগ। তার ধারণা, ওইগুলোর ধাক্কা লাগাতেই এবার বর্ষার মেঘ ছিরকুটে গিয়ে এমন ধারার সর্বনাশা জল ঢেলেছে, তাতেই ভাদ্রে এমন প্রলয়-বান হয়েছিল।

ওগুলো নাকি যুদ্ধ করতে যায়। যুদ্ধ! কথাটা মনে ক'রে শশী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। এখানকার লোকে বলে, কাল-যুদ্ধ! ত্রিশ টাকা, পঁয়ত্রিশ টাকা মণ চাল! দশ টাকা বিশ টাকা জোড়া কাপড়, চিনি নাই, কেরাসিন তেল আনতে হয় ইউনিয়ন বোর্ডের টিকিট দেখিয়ে, সাগুর সের চার টাকা; ওসব দূরের কথা, ভাঙা দরজা মেরামত করবার জন্য একটা পেরেকের দরকার হয়েছিল শশীর, একটা পেরেকের দাম নিয়েছে চার পয়সা!

শশী দোকানীর উপর ভয়ানক চ'টে গিয়েছিল, একটা পেরেকের দাম চার পয়সা?

দোকানী হেসে বলেছিল, এর পরে চার আনা দিলেও আর পাবি না।

পেরেকটা নিয়ে আমার বুকে ঠুকে বসিয়ে দাও, আরও চারটে পয়সা দেব।—ব'লে রাগ ক'রে শশী একটা আনি ফেলে দিয়ে পেরেকটা নিয়ে এসেছিল, এবং সেই দিন রাত্রে দোকানীর গোলা থেকে দুটি বস্তা ধান চুরি ক'রে এর শোধ দিয়েছিল। শোধ বলা চলে না, সাজা দিয়েছিল বলতে হয়; কারণ দুটো বস্তায় অন্তত এক মণ হিসেবে দু মণ ধানের দাম আঠারো টাকা দরে ছত্রিশ টাকা। শশী অবশ্য পেয়েছে পনেরো টাকা। চার পয়সার বদলে পনেরো টাকা—নরুনের বদলে নাকের চেয়েও বেশি।

ধান-চালের দরের দিক দিয়ে হিসাব করলে শশীর এখন চরম সুসময়, এবং সত্যিই শশীর আর্থিক অবস্থা এখন ভাল। মধ্যে তার স্ত্রী একদিন একখানা পাঁচ টাকার নোট এক টাকার নোট ভ্রম ক'রে হাটে বাজার করতে বের করেছিল, খোদ দারোগা হাটে ছিল, সে পর্যন্ত দেখেছে। কিন্তু তবু শশী ধান-চালের এই বাজারের জন্য হায়-হায় করে। বৈশাখের শেষ থেকে ধান চালের অভাবে মানুষের সে হাহাকার, না খেতে পেয়ে মানুষের মরণের কথা মনে হ'লে আজও শশী মদের মুখে বলে, ভগমান, কানে কালা ক'রে দাও, চোখে কানা ক'রে দাও। না হয়তো একেবারে জানে মেরে দাও বাবা।

নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাবার সেই গৌরচন্দ্রিকা, অর্থাৎ আরম্ভ। আষাঢ় শ্রাবণে লোকে খেতে পেলে না, তারপর ভাদ্রে হ'ল বান!

আকালের পর বান, বানের পর মড়ক। নরমুণ্ড গড়াগড়ি কথার কথা নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তব, সত্য সত্যই গড়াগড়ি যাচ্ছে। গ্রামে কাক নাই, কুকুর নাই, অন্নহীন গ্রাম ছেড়ে নরমাংস-লোভে তারা শ্মশানে গিয়ে পড়েছে। গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শ্মশান, ও-দিকটার আকাশে প্রায় অহরহই শকুনের পাল পাক খেয়ে উড়ছে দেখা যায়। শরীর শিউরে ওঠে। শ্মশানের মড়া পোড়াতে গেলে পাঁচটা দশটা মড়ার মাথা বাঁশ দিয়ে গড়িয়ে নদীতে না ফেলে চিতা সাজানো যায় না।

শশী সেদিন তার জ্ঞাতি-ভাইকে পোড়াতে শ্মশানে গিয়েছিল। কাঁচা বয়স, শূর বীরের মত, চেহারা, বুকের ছাতিখানা দেখে মনে হ'ত যেন পাকা তালগাছের গোড়া। আকালের বাজারে খেতে না পেয়ে হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে হয়েছিল যেন শুকনো খেজুরগাছ। তারপর ধরল জ্বরে, জ্বরের পরই হাত-পা ফুলতে শুরু হ'ল। দিন পনরো পর ঘরের চালের ফুটোয় তালপাতা দিয়ে ঢাকতে উঠে হঠাৎ 'কি হ'ল' ব'লে চাল থেকে নেমে মাটিতে পা দিয়েই কাটা

গাছের মত মাটির উপর আছোড় খেয়ে প'ড়ে গেল। তাকে পোড়াতে গিয়ে শশী খানিকটা দূরে বসল। শরীর তার শিউরে উঠেছিল। চারিদিকে মড়ার মাথা আর হাড়। ভাইপোর চিতা সাজাতে চার-চারটে মড়ার মাথা ছুঁড়ে ফেলতে হ'ল নদীর জলে। হরন্দ অর্থাৎ হরেন্দ্র চিতা সাজাচ্ছিল, সে-ই বললে, উটা তাঁতী-বউয়ের মাথা, উইটা হ'ল ঘোষেদের ছোটকার, আর উইটা লাগছে যেন মিচ্ছিরীদের ঝিউড়ী মেয়েটার।

হবে। তার আর আশ্চর্য কি। হরেন্দ্র এ বাজারে মড়া পোড়াবার কাঠ কেটে দেওয়ার কাজ করতে আরম্ভ করেছে। প্রায় প্রতি মড়ার সঙ্গেই সে শ্মশানে আসে।

একজন বলেছিল, বাকিগুলান ?

হরেন্দ্র এবার চুপ ক'রে গিয়েছিল। চারদিকেই মড়ার মাথা, চোখ-নাকে শূন্য গহ্বর, দু পাটি প্রকট দাঁত বের ক'রে সমস্ত মাথাগুলো একই রকম বীভৎস চেহারা নিয়ে ছড়িয়ে প'ড়ে আছে; জোর বাতাস দিলে গড়িয়ে কোন্‌টা কার জায়গায় গিয়ে ঠেকে, কে তার হিসাব রাখে। মড়ার মাথার আশ্চর্য কিছু নাই, কেবল মরণ হয়েছে আশ্চর্যের। প্রথমে জ্বর, তারপর পা মুখ ফোলা, তারপর হঠাৎ কারও কারও হচ্ছে কলেরার মত ভেদবমি, তাতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে; কারও আর একটা পাল্টা জ্বর; অধিকাংশ লোকের কিন্তু মরণ আচম্বিতে, ভেদ-বমি জ্বর ওসব কিছুই না, আচম্বিতে মরছে। যে মরছে, সেও জানতে পারছে না, অন্য লোকেও বুঝতে পারছে না, কখন কি হ'ল!

শশী সেদিন অনেক ভেবে-চিন্তে বলেছিল, ভাদর মাসে পাকা তাল পড়ছে যেন। শশী উপমাটি হাস্যকর অথবা গ্রাম্য হ'লেও যারা ভাদ্র মাসে পাকা তাল পড়া দেখেছে, তাদের কাছে ওর মূল্য আছে।

তাঁতী-বউয়ের মাথার কথা হরেন্দ্র বলছিল। তাঁতী-বউয়ের জ্বর হয়ে হাত পা ফুলেছিল, সামান্য, বেশি নয়। সেদিন সে সকালে উঠেছে, ঘরের কাজকর্ম করছে, হাট-বার ছিল, স্বামীকে হাটে পাঠিয়েছে, বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছে, হিন্দুস্থানী আমসত্ত্ব-আচারওয়ালারা যদি আসে, তবে একটুকুন আমসত্ত্ব নিয়ে এস। দাস অর্থাৎ তন্তুবায় মশাই হাট থেকে ফিরে এসে দেখে, দাওয়ার উপর আয়না চিরুনি, সিঁদুরকৌটো তেলের বাটি রেখে বউ শুয়ে আছে পাশেই। শুয়ে নয়, ম'রে প'ড়ে আছে।

দত্তদের সেজো দত্ত রাত্রে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে সকালে আর উঠল না। দিব্যি

ঘুমন্তের মতই শুয়ে আছে, দেহ কাঠের মত শক্ত, বরফের মত ঠাণ্ডা, মুখের পাশে খানিকটা গেঁজলা জ'মে আছে, আর তারই চারিপাশে লেগেছে অজস্র কাঠপিঁপড়ে।

মিছরী মানে মিশ্র-বাড়ির আট-দশজন লোকের মধ্যে থাকল শুধু দেড়জন—একটা বউ, আর ছোট একটা ছেলে, সেটাকে ধরতে হ'লে আধখানার বেশি ধরা চলে না। আট-দশজনের মরণ ঠিক ওই ভাদ্র মাসের পাকা তাল পড়ার মত। মাস খানেকের মধ্যে বাড়িটা ফাঁক হয়ে গেল। তিন ভাইয়ের বড় ভাই গাঁজা খেয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ফিকফিক ক'রে হাসছিল, একেবারে হঠাৎ একবার আঁ শব্দ ক'রেই চুপ ক'রে পড়ল মাটিতে মুখ গুঁজে। মেজো জন গিয়েছিল কুটুম্ব-বাড়ি কালীপূজার দিন, বেচারা কুটুম্ব-বাড়ির পূজায় মাংস খাবার লোভে যাচ্ছিল। কি যে হয়েছিল, কেমন ভাবে যে মরল, সে কেউ দেখে নাই; তবে দেখা গেল, পথের ধারে একটা গাছতলায় গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ম'রে প'ড়ে আছে। ছোট জন অবশ্য মাসখানেক ভুগে মরেছে। ছোট জনকে পুড়িয়ে এসে শ্মশান-বন্ধুরা হাঁকলে, মুড়ি কই, নিমপাতা কই? এটুকুও ঠিক ক'রে রাখতে পার নি বাপু?

সামনের ঘরের দরজার সামনে একপাটি কপাটে মাথা রেখে মিশ্রগিন্নী তিন সন্তানের শোকে কাতর হয়ে ব'সে ছিল। উত্তর দিতে পারলে না সে।

রূঢ়স্বরে শ্মশান-বন্ধুদের একজন বললে, আমরা তোমাদের চাকর নই। আমাদেরও মরণের ভয় আছে। ছেলে মরেছে, শোক হয়েছে জানি, সইতে না পার, আমাদের মুড়ি-নিমপাতা দাও, দিয়ে বরং পার তো গলায় দড়ি দিও, জল আছে ডুবে ম'রো, যা খুশি ক'রো।

মিশ্রগিন্নী তবু নড়ল না। এবার একজন এগিয়ে এসে গা ঠেলে বললে, শুনছ গো! অ—! তার মুখের কথা সে শেষ করতে পারলে না, চোখ বিস্ফারিত ক'রে বললে, এ কি, এ যে—এ যে—! ততক্ষণে তার হাতের নাড়া যেটুকু পেয়েছিল, তারই ফলে মিশ্রগিন্নীর দেহখানা শক্ত কাঠের মত গড়িয়ে প'ড়ে গেল।

কদিন পরেই মরল মিশ্রদের ঝিউড়ী মেয়েটা। সেও ম'রে প'ড়ে ছিল, হাতের কাছে তেঁতুলের আচারের একটা পাতা, হাতে মুখে আচারের দাগ, বোধ হয় খেতে খেতেই মরেছে।

রজনী সরকারের বউ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছিল, একটু তাড়াতাড়িই উঠছিল, হঠাৎ সিঁড়ির মাথায় বুকে হাত দিয়ে ব'সে পড়ল, তারপর গড়াতে গড়াতে এসে পড়ল একেবারে নীচে।

মানুষের মরণের বৃত্তান্ত মনে করতে করতে শশীর হাত-পা যেন হিম হয়ে আসে। শরীর আনচান ক'রে ওঠে। শশী অস্থির হয়ে নিজেকে নাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কুইনিন না হ'লে তার চলবে কি ক'রে? জ্বর যদি হয়? তারপর যদি হাত-পা ফোলে? রাত্রে ধান-বোঝাই বস্তা মাথায় ক'রে চলবার সময় কি পথের উপর প'ড়ে ম'রে থাকবে?

কুনিয়ান আমার চাই ডাক্তারবাবু। দাম যা লেন, দোব আমি। কুনিয়ান আমার চাই।

শশীর রূঢ় কণ্ঠস্বর ও কথার ভঙ্গীতে ডাক্তার চমকে উঠল।

মিহির ডাক্তারও বড় রোখা লোক। সে অন্যায় চোখরাঙানি কারও সহ্য করে না, সে রাজা-রাজড়াই হোক আর শেঠ-মহাজনই হোক কিংবা দারোগা-জমাদারই হোক। ডাক্তার ভ্রূ কুঁচকে ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে বললে, না। তারপর আপনার কাজ করতে আরম্ভ করলে। একটু পর আবার বললে, যারা রোগে ভুগছে, তাদের না দিয়ে ও ওষুধ তোকে দিতে পারব না। আর বেশি দাম নিয়ে ওষুধ আমি বেচি না।

শশী দ'মে গেল। আস্তে আস্তে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আর এক উপায় আছে। ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার। সে দিতে পারে। বেশি দাম নেয় ব'লেই শশী আজও তার কাছে কুইনিন কেনে নাই। এইবার তাকেই ধরতে হবে। শশী রাস্তার উপর নেমে এসে দাঁড়াল। ডাক্তারের সামনে কম্পাউণ্ডারকে কুইনিনের জন্য বলা যে উচিত নয়, এ জ্ঞান শশীর টনটনে। ডাক্তারের পাশের ঘরে কম্পাউণ্ডার চিনেমাটির সাদা খলটায় খটখট ক'রে ওষুধ মাড়ছে। এদিকে তাকালেই শশী স্ফুট ক'রে তাকে দুটি আঙুলের নাড়া দিয়ে ডাকবে।

কম্পাউণ্ডার তাকিয়েছে; শশী হাত তুললে, কিন্তু ডাকা হ'ল না। সে, কম্পাউণ্ডার, ডাক্তার, অন্য রোগী যারা ছিল, তারা সবাই চকিত হয়ে উঠল। থানার সামনে রাস্তাটা যেখানে পশ্চিম মুখ থেকে বেঁকে একেবারে দক্ষিণ মুখে ফিরেছে, সেইখান থেকে রোল উঠল—বল—হ—রি—, হরি—বো—ল!

কেউ গেল আর কি!

কে? ডাক্তার ভেবে দেখছিল, কে হতে পারে। কিন্তু ডাক্তারও ভেবে ঠিক করতে পারে না। চণ্ডীদাস দত্ত? হাফিজ সেখ? নিশি ময়রার পরিবার? মহাদেবের মা? আরও অনেক নাম মনে পড়ল। যে কেউ হতে পারে—যে কেউ। হঠাৎ মনে হ'ল, হতে পারে না কেবল হাফিজ সেখ। ওটা তার ভুল হয়েছে। হরিবোল তুলে হাফিজের যাবার কথা নয়।

মরণের আশ্চর্য কিছু নাই, এ বাজারে বাঁচাই আশ্চর্য, কিন্তু তবুও সবাই রাস্তার ওইদিকটায় চেয়ে রইল। শশীও চেয়ে রইল। চারটে লোক অতি কষ্টে মড়া ব'য়ে আনছে; মধ্যে মধ্যে দাঁড়াচ্ছে। সঙ্গে দুটি মেয়ে—একটি বউমানুষ ব'লে মনে হচ্ছে। এতখানি ঘোমটা।

বল—হ—রি—

কে? কে মারা গেল? ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাওয়ার উপর দাঁড়াল।

আনু—আনু - আনু ঠাকুর। ওই যে কেষ্টদীঘির পাড়ে থাকত।

আমার অনিরুদ্ধ, ডাক্তারবাবু, আমার সোনার অনিরুদ্ধ বাবা। চীৎকার ক'রে উঠল একটি প্রৌঢ়া বিধবা, অনিরুদ্ধের মা।—ওরে বাবা আনু রে—! ব'লে সে সেই পথের ধূলার উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। পিছনে একটি অবগুণ্ঠনবতী মেয়ে। কোলে একটি বছর দুয়েকের ছেলে। ছেলেটিকে জড়িয়ে বেরিয়ে আছে দুখানি হাত, আর মাটির উপর দেখা যাচ্ছে দুখানি পায়ের পাতা। সমস্ত লোকের দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ হ'ল আপনা থেকে; কাঁচা সোনার মত রঙ; কোমল লাবণ্য যেন ঝ'রে পড়ছে ওই হাত দুখানি থেকে। দুগাছি রঙ-চটা সাদা শাঁখা ছাড়া কোন গয়না ছিল না। কিন্তু ওতেই কি শোভা হয়েছে সে হাতের! আহা-হা!

শশীও চেয়ে দেখছিল ওই হাত দুখানি। আনুর মা বুক ফাটিয়ে আর্তনাদ করছিল, কিন্তু সমস্ত লোকগুলি সকরুণ অন্তরে আক্ষেপ ক'রে ভাবছিল ওই সোনার প্রতিমার মত মেয়েটির দুর্ভাগ্যের কথা।

ডাক্তার রুমাল দিয়ে চোখ মুছলে।

আঃ! হায়—হায়—হায়! মা! এ কি করলি মা! বক্তার কণ্ঠস্বর শুনে সকলে কিন্তু এবার সোনার প্রতিমার দিক থেকেও চকিত হয়ে দৃষ্টি ফেরালে। পূজার ফুলের সাজি হাতে নিয়ে কখন সকলের পিছনে এসে

দাঁড়িয়েছেন ত্রিপুরা ভট্টাচার্য। তাঁর ঠোট দুটি কাঁপছে; চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে আসছে; বেদনাকাতর নিষ্পলক দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে আছেন ওই বধূটির দিকে।

ভট্টাচার্যের চোখের জল দেখে অকস্মাৎ শশীর চোখ দুটিও করকর ক'রে উঠল। শশীও কেঁদে ফেললে। আঃ! হায়—হায়—হায়! হে ভগমান! কয়েক মুহূর্ত পরেই সে কিন্তু নিজেই অবাক হয়ে গেল। আহু ঠাকুর মরেছে, তাতে তো তার কাঁদবার কথা নয়! শবটা বহন ক'রে তখন বাহকেরা খানিকটা এগিয়ে গেছে। শশী চোখের জল মুছে ফেললে। তার অন্তরের মধ্যে প্রতিশোধমূলক আক্রোশ জেগে উঠল। আহু ঠাকুর পুলিসের গুপ্তচর, সাক্ষাৎ সয়তান, বদমাস, পাজীর একশেষ ছিল আহু ঠাকুর। কিন্তু আহুর বউ এত সুন্দর! শশী আশ্চর্য হয়ে যায়।

—তিন—

আহু ঠাকুর সত্যিই পুলিসের চর ছিল। এখানকার লোক সে নয়, পুলিসের দারোগাই তাকে এনে এখানে রেখেছিল। আহুর গ্রাম থেকে আহুর সমবয়সী জনকয়েক ছেলে ধরা পড়েছিল—একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মামলায়। আহুর সমবয়সী হ'লেও আহুর বন্ধু কোন কালেই তারা ছিল না। তারা ছিল কলেজের ছাত্র, আহু ছিল গ্রাম্য ঠাকুর, অর্থাৎ ভুল সংস্কৃত মন্ত্র আউড়ে পূজা ক'রে বেড়াত। সেই মামলায় সে নির্জলা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে পুলিসের সুনজরে পড়ে। সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আহু নিজের গ্রামে সার্বভৌমত্ব অর্জনের জন্য এমন ক্রিয়াকলাপ অনেক করেছিল, যার ফলে গ্রামে বাস করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। সর্বশেষে আহু নিজের একখানা গোয়াল-ঘরে নিজে আগুন দিয়ে পুলিসকে জানালে, গ্রামের লোকে তাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। পুলিস সমস্ত বুঝে আহুকে গোপনে শাসিয়ে দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে গেল যে, আহুর এ ভাবের অন্যায়কে তারা সমর্থন করতে পারবে না, ভবিষ্যতে বাধ্য হয়ে তাকে সাজা দিতে হবে; এবং সৎপরামর্শ হিসাবে দারোগা তাকে জানালে, এ গ্রাম ছেড়ে ফুল্লরাপুরে গিয়ে বাস করাই তার উচিত। বাজারপ্রধান জায়গা। কাজকর্ম জুটবে। থানার গোপন কাজকর্ম করলে তাতেও কিছু কিছু উপার্জন হবে। আর এখানে থাকলে

আন্নুর বিপদ অনিবার্য। আন্নু সেই থেকে এসে এখানে বাস করছিল। আন্নুর মা লোকের বাড়িতে দেবসেবার ভোগ রান্না করত, আন্নু পূজা করত। অন্য সময়ে আন্নু এখানে ওখানে ঘুরে যে সব খবর সংগ্রহ করত, জানিয়ে আসত থানায়। আন্নুর জন্যই শশী ধরা পড়েছে তিনবার। আন্নুর জন্যই ডাক্তারের ফেরারী এক খুড়তুতো ভাই ধরা পড়ল সেদিন। গত আগস্ট মুভমেণ্টের সময় থেকে ডাক্তারের ভাইকে পুলিস খুঁজছিল।

শুধু শশীই নয়, ডাক্তারই নয়, ত্রিপুরা ভট্টাচার্যও আন্নুর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। চণ্ডীমায়ের ওই পূজক পদটির প্রতি আন্নুর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল। ভট্টাচার্যের পূজাপদ্ধতির ভুল অবহেলা প্রভৃতির প্রতি চতুর চরসুলভ দৃষ্টি সজাগ রেখে ঘোরাফেরা সে অনেক করেছে; না পেয়ে, ভট্টাচার্যের নামে রটনা আরম্ভ করেছিল—ত্রিপুরা ভট্টাচার্য চণ্ডীতলা লুটে খাচ্ছে। হাতে-নাতে প্রমাণ বাবা, সন্ধ্যের সময় ভটচায্যি যখন বাড়ি যায়, তখন তার পোঁটলাটা দেখো।

চণ্ডীমাকে যে যা পূজা দেয়, তার একটা অংশ ভট্টাচার্যের বিধিমত পাওনা। দেবস্থানের অংশটা ভট্টাচার্য মশায়ই ভাগ ক'রে দেবভাণ্ডারে জমা রাখেন। আন্নু বলত, বেড়ালে মাছ ভাগ করলে গেরস্থতে কি পায়? এখানকার লোকেরা কানা—কানা—কানা।

তাতেও যখন কিছু হ'ল না, তখন আন্নু দারোগাকে বলেছিল, চণ্ডীতলায় ফেরারী আসামীরা সন্ন্যেসী সেজে আসে। আমি নিজে দেখেছি, অল্প বয়েস, গাঁজা খায় না, ইংরেজী বই পড়ে।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়, একজন অল্পবয়সী লেখাপড়া-জানা সন্ন্যাসী এসে-ছিলেন চণ্ডীতলায়; বৃদ্ধ ভট্টাচার্যের ভারি ভাল লেগেছিল সন্ন্যাসীটিকে। যত্ন ক'রে তিনি খাওয়াতেন, যেতে চাইলে আরও দুদিন থেকে যেতে অনুরোধ করতেন। দারোগা একদিন এসে সন্ন্যাসীকে জেরা আরম্ভ করলেন, আপনার নাম কি? বাড়ি কোথায়?

সন্ন্যাসী হেসে বলেছিলেন, সে বলব না, বলবার নিয়ম নয়।

দারোগা তল্লাস করলে সন্ন্যাসীর জিনিসপত্র। কয়েকখানা চিঠিপত্র প'ড়েই দারোগা থতমত খেয়ে গেল। রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট রায় বাহাদুর কেদার গাঙুলীর চিঠি—প্রাণাধিকেষু, মাই ডিয়ার সান ব'লে পাঠ, ঘরে ফিরে সংসারী হবার জন্য অনুরোধ মিনতি! দারোগার বুদ্ধি যতই বাঁকা হোক, এ ক্ষেত্রে

সোজা জিনিসটা বুঝতে তার বিলম্ব হ'ল না। সে ক্ষমা চেয়ে বললে, যখন যা অসুবিধে হবে আমাকে জানাবেন। মানে, যা দরকার হবে আপনার। মানে, প্রয়োজন হ'লেই জানাবেন আপনি।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চারিপাশ ঘুরে দেখে, কাকে বললেন জানি না, হারামজাদা বামুন কোথায় গেল? আনু, সেই আনুটা?

সেই আনু ভট্টাচার্য আজ মরল।

যারা আনুর শবযাত্রা দেখে নাই, তাদের প্রতিটি জন বললে, একটা আপদ গেল। আনুর উপর কেউই সন্তুষ্ট ছিল না।

শশী এসে আপনার দাওয়ার উপর বসল, বার বার ভাবতে চেষ্টা করলে, আনু মরেছে, বেশ হয়েছে। কিন্তু বার বারই তার মনে হ'ল, নরম সোনায় গড়া সুডৌল দুখানি হাতের কথা। রঙ-উঠে-যাওয়া সাদা দুগাছি শাঁখায় সে হাত দুখানি কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল! সেই হাত দুখানিকে নিরাভরণ কল্পনা করতে গিয়ে বার বারই তার চোখে জল এল।

শশীর স্ত্রী ঘরের ভিতর কাজ করছিল। শশীর পায়ের শব্দ সে চেনে। গভীর রাত্রে শশী যখন দ্রুত এবং প্রায়-শব্দহীন পদক্ষেপে বাড়ি ফেরে, তখন সে জেগে কান পেতে ব'সে থাকে এবং শশীর পদক্ষেপ প্রায়-শব্দহীন হ'লেও ওই অতিক্ষীণ শব্দের মধ্য থেকে বুঝতে পারে যে, শশী ফিরছে। সে দরজা খুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার পাশে। শশীর পায়ের শব্দ শুনেই সে জল-পরিপূর্ণ ঝকঝকে তকতকে একটি কাঁসার বাটি এনে তার পাশে নামিয়ে দিলে। শশী কুনিয়ান খেয়েছে, এইবার মাদুলিধোয়া জল খাবে। বাটিটার দিকে একবার চেয়ে দেখে শশী চোখ ফিরিয়ে নিলে।

বউ বললে, খাও।

শশী তার দিকে ফিরে চেয়ে বললে, উঁ?

মায়ের মাদুলি ধুয়ে জল খাও। ওই দেখ, জল দিয়েছি।

হুঁ।

বউ চ'লে যাচ্ছিল। শশী ডেকে বললে, বোতলটা দে তো।

বোতল? শশীর বউ আশ্চর্য হয়ে গেল।

হ্যাঁ। আবার শশী বউয়ের দিকে ফিরে চাইলে। বউ আতঙ্কিত হয়ে উঠল; এই ফিরে চাওয়ার মানেই হ'ল, শশী এইবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে উঠে এসে তার চুলের মুঠি ধ'রে মাটির উপর আছড়ে ফেলে দুটি

লাথি মেরে বলবে, হ্যাঁ, বোতল। শুনতে পাও না হারামজাদী? শশী উঠল। বউটা ভয়ে চোখ বুজে ঘাড় পিঠ সংকুচিত ক'রে হাত দুটি মাথার উপরে তুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। শশী কিন্তু বউকে মারলে না, সে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে বোতলটা বার ক'রে খানিকটা নির্জলা মদ খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার মনে হ'ল, বুকের ভিতরটা যেন হু-হু করছে, মাথার তালু থেকে সমস্ত কপালটা কেমন ঝিমঝিম করছে। গায়ে যেন বল নাই, পা যেন টলছে। এতটুকু মদে এতখানি নেশা শশীর কখনও হয় না।

ঘুরতে ঘুরতে সে এসে দাঁড়াল লা-ঘাটার ঘাটে। সামনে নদী দেখে তার খেয়াল হ'ল। ঘাটের পূব দিকে শ্মশান। সে নিজেই চমকে উঠল। শ্মশানে তিনটে চিতা জ্বলছে। শশীর দেহ থেকে বল যেন নিঃশেষে চ'লে গিয়েছে, তার হাত-পা নাড়বারও যেন ক্ষমতা নাই, তার মুখটা পর্যন্ত হাঁ হয়ে গেল, হাঁ ক'রে সে চেয়ে রইল ওই তিনটে জ্বলন্ত চিতার দিকে। মরণকে শশীর বড় ভয়।

ও-পার থেকে খেয়া-ডোঙাটা এসে এ-পারে লাগল। যাত্রী নাই। অকারণেই ডোঙাটা নিয়ে এসে এ-পারে লাগালে নোটন মুচি—ডোঙার খেয়া-মাঝি। চারিদিকে রোগ আর রোগ, লোকের পথ হাঁটবার উৎসাহ কোথায়? তবু নোটন ব'সে থাকে ডোঙা নিয়ে; পেটের দায়, বিশ টাকা মণ চাল, সে চাল আসবে কোথা থেকে? যে দু-চারজন কি দশজন আসে, তাদের পার করলেও কুড়ি পয়সা হবে। সে ডোঙার উপর ব'সে থাকে আর শ্মশানের চিতার সংখ্যা গণনা ক'রে যায়। ওতে নোটনের সময় কাটে। শশী নোটনের একজন বড় মক্কেল। বন্যার সময় দু-একদিন রাত্রে শশী নোটনকে ডাকে। নোটন তাকে পার ক'রে দেয়। তার জন্য শশী যা দেয়, আজকালকার রোজকারের অনুপাতে সে নোটনের দশ-বিশ দিনের রোজকার!

শশী!

অ্যাঁ? নিতান্ত বোকার মত শশী উত্তর দিলে।

কিছু বলছিস নাকি? মৃদুস্বরে নোটন প্রশ্ন করলে, আজ রাত্রে ডোঙা চাই নাকি?

শশী উদাস কণ্ঠে বললে, আন্নু ঠাকুর আজ ম'লো।

নোটন অবাক হয়ে গেল। আন্নু মরেছে, তাতে শশী এমন মনমরা হয়ে গেল কেন? শশী বললে, পোড়াতে এসেছে আন্নুকে।

নোটন কথাটা জানে, সে এই ঘাটেই ব'সে আছে,—ডোঙার উপর ব'সে চোখ মিটমিট ক'রে দেখছে, কে কে এল শ্মশানে। এই তো এখন তার একমাত্র কাজ হয়েছে। আজ সকাল থেকে এসেছে আটজন। ভোরবেলায় একদল তার আসবার আগেই চ'লে গেছে। তারপর সকাল থেকে আটজনের মধ্যে আকুনিয়া গ্রামের দুজন, কৃষ্ণপুরের একজন, ফুল্লরাপুরের পাঁচজন—ছিদেম বাউড়ীর বউ, হরিশের নাতি, কণ্ঠর মা, গোকুল ডোম, সব শেষে এসেছে আহ্নু ঠাকুর।

নোটন বললে, হ্যাঁ। ওই সব চান ক'রে উঠছে ঘাট থেকে।

শশী ব্যগ্র দৃষ্টিতে শ্মশানের ঘাটের দিকে তাকালে। নোটন নদীর বুকে ডোঙার উপর ব'সে আছে, সে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে শশী কিছু দেখতে পেলে না। নদীর খাড়া উঁচু পাড় এবং পাড়ের উপরে কাদা-জামের ঝাঁকড়া গাছগুলাতে ঘাট আড়াল পড়েছে।

শশী এক-পা এক পা ক'রে এগিয়ে চলল।

নোটন আশ্চর্য হয়ে গেল। মরণকে শশীর বড় ভয়, নেহাত দায়ে না পড়লে সে শ্মশানে আসে না। সে ডাকলে, শশী!

শশী এগিয়ে গেল, কথার উত্তর দিলে না।

আহা, মেয়েটি তো নয়, সত্যিই ননীর পুতুল!

স্নান ক'রে উঠে গা-মোছা হয়নি, কাপড় নিঙড়ে ফেলতে পারে নি, ভিজে কাপড় সর্বাঙ্গে লেপ্টে লেগে গেছে। ভিজে ময়লা কাপড়খানার উপরেও গায়ের চাঁপাফুলের মত রঙ ফুটে বেরিয়েছে। কালো চামরের মত কসকসে কালো রুখু চুলের রাশির প্রান্তভাগটা কাপড়ের প্রসার ছাড়িয়ে ঝুলে পড়েছে। চুলের ডগাগুলি বেয়ে জল পড়ছে, রোদের ছটায় টলমলে মুক্তোর মত টোপা টোপা জলবিন্দু। শশী দেখতে চেয়েছিল সেই সুন্দর হাত দুখানি। শাঁখা দুগাছা ভেঙে দিয়েছে, লোহা খুলে ফেলে দিয়েছে;—ননীতে গড়া সেই সুন্দর হাত দুখানিকে খালি নিরাভরণ দেখে মনে সে দুঃখ পেতে চেয়েছিল। কিন্তু তার হাত দুখানি কাপড়ের মধ্যে ঢাকা পড়েছে। সে তাকালে পায়ের দিকে। ইটে ঘ'ষে আলতার দাগ তুলে দিয়েছে, পা দুখানি দেখে শশীর কান্না পেল। আঃ—আঃ—হায়—হায় রে!

ঠিক সেই মুহূর্তেই বের হ'ল বউটির হাত দুখানি। আহ্নুর মায়ের কোলে ছিল দু বছরের খোকা। নিরাভরণ হাত দুখানি বের ক'রে বউটি ছেলেটিকে নিজের কোলে নিতে চাইলে।

আন্নুর মা ব'লে উঠল, থাক, থাক, আমার কোলেই থাক। কিন্তু মেয়েটি শুনলে না, মানলে না, জোর ক'রে টেনে ছেলেটিকে নিয়ে আপনার বুকে ফেলে জড়িয়ে ধরলে।

শশী দেখছিল সেই শূন্য দুখানি হাত।

ননী দিয়ে গড়া চাঁপার বরণ হাত দুখানিকে আগের চেয়ে লম্বা দেখাচ্ছে; খাঁ-খাঁ করছে হাত দুখানি, ওই হাত দুখানির দিকে চেয়ে শশীর মন খাঁ-খাঁ করছে। বউটির আশপাশ, চারিদিকের মাঠ-ঘাট সমস্ত খাঁ-খাঁ করছে, যেন বউটি তার ওই খাঁ-খাঁ করা খালি হাত বুলিয়ে দিয়েছে সমস্ত কিছুর উপর।

ব—ল—হ—রি হরি—বো—ল! শ্মশানবন্ধুরা ধ্বনি দিয়ে উঠল।

সামনেই চণ্ডীতলা। সকলে গিয়ে উঠল চণ্ডীতলায়। এখানকার নিয়ম এই। শ্মশান থেকে ফিরবার পথে চণ্ডীতলায় প্রণাম ক'রে তবে গ্রামে প্রবেশ করে। মায়ের আশীর্বাদী পুষ্প নেয়, চরণোদক খায়, চণ্ডীতলার মৃত্তিকা গায়ে মাখে। শ্মশানের অকল্যাণ দূরে যায়। শশীও গিয়ে ঢুকল চণ্ডীতলায়।

ত্রিপুরা ভট্টাচার্য দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আন্নুর মা কেঁদে উঠল, চণ্ডীমায়ের উঠানে সে মাথা কুটতে আরম্ভ করলে, কি করলে মা গো? কি দোষ করেছিলাম গো?

ভট্টাচার্য বললেন, কেঁদো না, কেঁদো না। ওঠ, ওঠ। ভট্টাচার্যের কথা বলার ভঙ্গী সেই চিরকেলে আশ্চর্য ভঙ্গী। সুখও নাই, দুঃখও নাই, অদ্ভুত! বললেন, নাও, চরণোদক নাও। পুষ্প নাও।

আন্নুর মা উঠল। ভট্টাচার্যের কথা বলার এই ভঙ্গীর এমনিই গুণ। শুধু আন্নুর মা নয়, সব মানুষকেই উঠতে হয়, চোখ মুছতে মুছতে চরণোদক-পুষ্প নিতে হয়। যতক্ষণ এখানে থাকে, ততক্ষণ সে আর কাঁদতে পারে না। ভট্টাচার্য হাসেন, যে হাসি তিনি পৌত্রের অসুখে হেসেছিলেন, বাবুর দৌহিত্রের শিয়রে ব'সে হেসেছিলেন; বলেন, মাকে নিষ্ঠুর ব'লো না মা। সংসারে কত দুঃখ, কত কষ্ট, কত পাপ। তা থেকে মুক্তি দিয়ে ধুলো ঝেড়ে তিনি তাকে আপন বুকে তুলে নিয়েছেন। এ তো মুক্তি! নিজের মুক্তি কামনা কর। যারা শোনে, তারা উদাস হয়ে চেয়ে থাকে, চোখের জল যেন থমকে যায়।

আন্নুর মা চোখ মুছে চারিদিক চেয়ে বললে, বউমা কোথায় গেল? বউমা! অ বউমা! আঃ কি বিপদেই আমি পড়েছি মা!

বউটি দাঁড়িয়ে ছিল নাটমন্দিরের একটি থামের আড়ালে। এদিক ওদিক দেখে আন্নুর মা তাকে টেনে নিয়ে এল।—দিন্ বাবা, খোকাকে চরণোদক-পুষ্প দিন। ওই খুদকুঁড়োটুকুই আমার সম্বল—আমার আন্নুর—

কণ্ঠস্বর তার রুদ্ধ হয়ে এল। আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে আন্নুর মা বউয়ের ঘোমটার ফাঁকে মুখ রেখে বললে, হাত পাত, চরণোদক নাও, পুষ্প নাও, খোকাকে দাও, নিজে খাও। হাত পাত।

বউটি মুখ তুললে, মুখের ঘোমটা একটু সরিয়ে সে চাইলে শাশুড়ীর দিকে।

আন্নুর মা বললে, বিরক্ত হয়েই উচ্চকণ্ঠে বললে, আমার মাথা খেয়ে হাত পাত। চরণোদক নাও। খোকাকে দাও, নিজে খাও। হাত পা—ত।

এবার সে হাত বাড়ালে। তারুণ্যের অপরূপ লাবণ্যে ভরা সুগৌর সুডৌল দুখানি হাত বৈধব্যের নিরাভরণ দীনতায় কাঙাল হয়ে গেছে। আন্নুর দেহ যখন নিয়ে যায়, তখনও হাত দুখানিতে রঙ চটা পুরানো সাদা শাঁখা দুগাছিতে যে শোভা ছিল, সে শোভা ত্রিপুরা ভট্টাচার্য দেখেছিলেন। চরণোদক দিতে দিতে তিনি ব'লে উঠলেন, তারা—তারা—মা!

তারা-নাম ভট্টাচার্য প্রায়ই উচ্চারণ করেন। নাম উচ্চারণের জন্য নয়, তাঁর কণ্ঠস্বরের জন্য সকলেই ঈষৎ চকিত হয়ে উঠল। সকলেই তাঁর মুখের দিকে তাকালে। তাকালে না শুধু মেয়েটি। ছেলেটিকে এক হাতে কোলে চেপে ধ'রে একটি হাত বাড়িয়ে সে তেমনই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

ভট্টাচার্যের চোয়ালের হাড় দুটি অস্বাভাবিক চাপে উঁচু হয়ে উঠেছে, নীচের ঠোঁট উপরের ঠোঁটের উপর ঠেলে উঠেছে; যেন মৃদু দ্রুত কম্পনে কাঁপছে মনে হয়।

ভট্টাচার্যের বুকের ভিতর সত্যই একটা আবেগ জেগে উঠেছিল। বহুকাল, বোধ হয় ত্রিশ বৎসর পূর্বে তাঁর একমাত্র কন্যা চোদ্দ বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল, তাঁর মনে প'ড়ে গেল সেই স্মৃতি। কিন্তু তাঁর কন্যার নিরাভরণ হাত দুখানিতে এমন কাঙাল ভাব ফুটে ওঠে নাই। প্রাণপণে আত্মসম্বরণ ক'রে ভট্টাচার্য বললেন, আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার ছেলে শতায়ু হবে, মানুষের মত মানুষ হবে। ও-ই তোমার দুঃখ ঘোচাবে।

আন্নুর মা আবার হাউহাউ ক'রে উঠল। শুধু আন্নুর মা নয়, শ্মশানবন্ধুরা সকলেই চোখ মুছলে। কিন্তু অবগুণ্ঠনাবৃতা ওই মেয়েটির কোন স্পন্দন-চিহ্ন

বুঝা গেল না। ভিজে কাপড় তখনও প্রায় গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে লেগে ছিল, তবুও কিছু বুঝা গেল না।

চরণোদক দিয়ে ভট্টাচার্য তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে চ'লে গেলেন। ঘাটে কে বসে রয়েছে! উবু হয়ে ব'সে হাতের ছাঁদের মধ্যে মাথা গুঁজে ব'সে ছিল শশী। ভট্টাচার্য বিরক্ত হয়েই বললেন, কে?

শশী মুখ তুললে। সে ব'সে ব'সে কাঁদছিল।

কি রে শশী, কাঁদছিস কেন?

শশী হাউহাউ ক'রে কেঁদে উঠল। বললে, আঃ, বাবাঠাকুর, আমার মরণ কেনে হয় না?

কি হ'ল তোর?

আঃ, ওই সব কচি কচি মেয়ে বিধবা হচ্ছে বাবাঠাকুর, কত লোক ম'রে যেছে, এ যে আর দেখতে লারছি বাবা!

আশ্চর্য ঘটনা ঘ'টে গেল। ভট্টাচার্য অকস্মাৎ ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন।

আন্নর মা পৃথিবীতে অনেক কাল এসেছে। কোপার ঘা খেয়ে ছাদ যখন জ'মে যায়, তখন মুষলধারার বর্ষণেও যেমন গলে না, তেমনই ভাবেই আন্নর মায়ের বুকের ভিতরটা জ'মে গেছে। সংসারের নিষ্ঠুর অভাব-অনটনের বর্ষণের মধ্যে মাঝে মাঝে এক-একটা বজ্রাঘাত হয়, তাতে ছাদের মত জমাট বুকটায় এক-একটা চিড় খায়, সে ফাটল দিয়ে অল্পস্বল্প জল ভিতরে যায়; কিন্তু অধিকাংশই পিছলে বেরিয়ে যায়। সে চণ্ডীতলাতেই ব'সে ছিল চারটি প্রসাদের জন্য। ভট্টাচার্যের ঠোঁটের কম্পন তার চোখ এড়ায় নাই। সে সেই সুযোগ আঁকড়ে ধরেছে। একটা থামে ঠেস দিয়ে ব'সে সে ঢুলছিল।

হঠাৎ বউটি তার হাত ধ'রে টানলে।

আঃ, ছাড়। কি?

উত্তর না দিয়ে বউটি তবু টানছে। আন্নর মা অভ্যাসমত বিরক্তিপূর্ণ উচ্চকণ্ঠে বললে, কি? আমার মাথা খাও তুমি। কি, হ'ল কি?

বউ তার হাতখানা টেনে কোলের ঘুমন্ত ছেলেটির কপালের উপর রাখলে।

আন্নর মা এবার ঈষৎ চঞ্চল হ'ল, ভাল ক'রে নিজে ছেলেটির কপালের উপর হাত দিয়ে দেখে বললে, ছ্যাকছ্যাক করছে যেন মনে হচ্ছে। হুঁ।

তারপর সে বললে, ও তোমার কিছু নয়। রোদ লেগেছে। রোদ থেকে স'রে ব'স। কথাটা ব'লে যেন তার তৃপ্তি হ'ল না, বউয়ের হাত ধ'রে টেনে সরিয়ে এনে বললে, স'রে ব'স।

শশী উবু হয়ে ব'সে ছিল, তার আর সহ্য হ'ল না, সে রূঢ়স্বরে বললে, কি রকম মানুষ তুমি ঠাকরুন? যেমন বেটা ছিল তোমার, তেমনই তুমি? এইখানেই তুমি নড়া ধ'রে হিঁচড়ে টানছ, ঘরে গিয়ে তা হ'লে তো মারবা তুমি ধ'রে!

শশী জাতিতে ডোম, ও অঞ্চলে ছোটলোক বলে, কিন্তু সে দাগী চোর, সেই কারণে লোকে তাকে ভয় করে। আন্নুর মা তার ক্রুদ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে আত্মসম্বরণ ক'রে বললে, ছেলেটার গা ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে বাবা, তাই বলছি, রোদ্দুর থেকে স'রে ব'স। তা কানের মাথা খেয়ে কথা কানে নেয় না আবাগী, তাই সরিয়ে দিলাম টেনে। আমারও তো বাবা মানুষের শরীর।

শশী এত সব কথা শুনছিল না, সে দেখছিল, বউটি ওই ননীর মত হাত দুখানি দিয়ে ছেলেটির গলা জড়িয়ে ধরেছে। ছেলের কপাল নিজের গালে ঠেকিয়ে গায়ের উত্তাপ অনুভব করছে।

শশী বললে, জ্বর হয়েছে? ঠাকরুন, দেরি ক'রো না। ডাক্তার দেখাও আজই।

ডাক্তার?

হ্যাঁ। আর বাবাঠাকুর যে পুষ্প দিলেন, গলায় বেঁধে দাও।

আন্নুর মা হাসলে; বললে, ডাক্তার দেখাবার পয়সা কোথা পাব বল?

যাও কেনে ডাক্তারবাবুর কাছে। ডাক্তারবাবু তো মানুষ বটে, না, পাথর? ওই কচি মেয়ের একটি ছেলে, মায়া হবে না ডাক্তারের?

আন্নুর মা শশীর মুখের দিকে চেয়ে নীরবে ব'সে রইল। সে চাউনির সম্মুখে শশী যেন কেমন অস্বস্তি অনুভব করলে। তাকিয়ে আছে দেখ দেখি! ঠায় একদৃষ্টে, পলক পড়ে না!

আন্নুর মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সকরুণ কণ্ঠে বললে, ওই কচি বউ, কোলে দুধের ছেলে, আমি ওদের মুখে কি দেব বাবা শশী? আমার পোড়া পেটের কথা ছেড়েই দিলাম, ওদের আমি বাঁচাব কি ক'রে? আঃ, আমার সোনার পুতুল বউ!

শশীর চোখ দিয়েও জল পড়তে আরম্ভ হ'ল।

—চার—

পরদিন সকালবেলা। ডাক্তারের ডাক্তারখানায় রোগীরা এসে ব'সে আছে। সংখ্যায় ষাটজনের কম হবে না—কঙ্কালসার শরীর, ফুলো ফুলো মুখ, হাত-পাও ফুলেছে, হলুদ চোখ, রুগ্ণ গায়ের কাপড়-চোপড়ের গন্ধে বাতাস পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। ঘরের মধ্যে কম্পাউণ্ডার চিনেমাটির বড় খলটায় খটখট শব্দে ওষুধ মাড়ছে। ডাক্তার নাই, কলে বেরিয়েছে। টাকা দিয়ে যারা ডাক্তারকে ডাকে, ডাক্তার তাদের বাড়িগুলো প্রথমেই সেরে আসে।

রোগে যারা বেশি কাতর, তারা কাতরাচ্ছে।

যারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ তারা আলোচনা করছে, কে কে মরেছে গত রাত্রে। বদি দত্তর বউ, মহাদেবের সদ্যোবিবাহিতা কন্যা, ঘোষেদের মেয়ে সরলা। সত্যরাম বাউড়ী মরেছে মাঠে; আউশ ধান কাটতে গিয়েছিল জ্বর নিয়ে। বিকেল পর্যন্ত ফিরল না দেখে খোঁজ ক'রে সত্যরামকে ধানের উপর মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকতে দেখতে পেয়েছে।

ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারির পাশেই ধ্বজু সিঙের দোকান। ধ্বজুর আড়তের সঙ্গে কন্‌ট্রোলের দোকান আছে—কেরোসিন তেল, চিনি বিক্রি হয়। তার সঙ্গে আছে সরকারী ভিক্ষে দেওয়ার ব্যবস্থা। ওখানে একটা জনতা জ'মে গেছে। চাল ফুরিয়ে গেছে, বিলি হচ্ছে ঘাসের বীজের মত এক রকম জিনিস, নাম বলছে—বাজরা। তাই নিতেই ভিড়ের অন্ত নাই। নিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগও করছে।

আন্নুর মাও এসে দাঁড়িয়েছে ওদের মধ্যে। বাজরা নিয়ে সেগুলি নেড়ে চেড়ে বললে, এ কি-ক'রে খাবে মানুষে?

ধ্বজু বললে, এও আর বড় জোর আসছে সপ্তা। তার পরই ফুরুবে, আর নাই।

একটি লোক হেসে বললে, আজ্ঞে, তা চলবে।

চলবে! ওই দেখ্, কটা বস্তা আর পুঁজি? আর লোক দেখছিস তো?

আজ্ঞে, এ খেলে সাত দিনেই লোক অনেক পাতলা প'ড়ে যাবে।

আন্নুর মা ভাবছিল, নাতিকে আর বউটাকে এই একটু বেশি ক'রে খেতে দেবে। তা হ'লেই সে খালাস। ঝাড়া হাত-পা। পরক্ষণেই সে শিউরে উঠল। বউটাই তো ভরসা। কালই সে কথা আন্নুর মা খুব ভালভাবে বুঝে নিয়েছে।

ভট্টাচার্য কেঁদেছে সে দেখেছে, এবং সে যে ওই বউটার প্রতি মমতায়, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শুধু কান্নাই নয়, কাল ভট্টাচার্য তাদের যে পরিমাণে প্রসাদ দিয়েছে, সে আন্নুর মা আশাই করে নাই। শশীর কান্নাও তার মনে পড়ল, সেও ওই বউটার উপর মমতায়। শশীই তাকে কথাটা বুঝিয়ে দিয়েছে। সে যে বলেছিল, ওই কচি মেয়ের একটি ছেলে, ডাক্তারের মায়া হবে না!

চণ্ডীতলা থেকে বাড়ি ফিরবার পথে শশীর কথাটা আন্নুর মা পরখ ক'রেও দেখেছে। শশীর কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ডাক্তারের মায়া হয়েছিল। ত্বপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে ডাক্তার কারও নয়, ওই সময়টায় সে খানিকটা বিশ্রাম করে, লাখ টাকা দিলেও ওঠে না। ডাক্তার শুয়ে ছিল। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আন্নুর মা ভাবছিল, ডাক্তারকে ডাকবে কি না! ছেলেটার জ্বর সত্যিই বেশি। বোশেখ মাসের ত্বপুরের কচি লতার মত নেতিয়ে পড়েছিল। জানালাটা খানিকটা ফাঁক হয়ে ছিল, সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে আন্নুর মা বার ত্বয়েক চেয়ে দেখে হতাশ হয়ে ফিরেই যাচ্ছিল। হঠাৎ জানালাটা সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে ডাক্তার দেখা দিলে, কে? কি?

আন্নুর মা সভয়ে বলেছিল, আজ্ঞে ডাক্তারবাবু, বউমার খোকাটির বড় জ্বর। হতভাগী আজই হাতের শাঁখা ভাঙলে, সিঁথের সিঁত্বর মুছলে, আবার ওই ছেলেটুকু, তার—। আন্নুর মায়ের চোখ ফেটে হু-হু ক'রে জল বেরিয়ে আসছিল—তার আন্নু, আঃ, তার সোনার আন্নু! কিন্তু তার জন্যে সে কাঁদলে লোকে তাকে মায়া করবে না। আন্নুর মা দাঁতে দাঁত টিপে বার বার আঁচল দিয়ে চোখ মুছেছিল।

ডাক্তার বেরিয়ে এসে ছেলেটির কপালে হাত দিয়ে গম্ভীরভাবে বলেছিল, হুঁ। এ যে অনেকখানি জ্বর। কখন জ্বর এল?

শ্মশান থেকেই বোধ হয়।

ডাক্তার যত্ন ক'রে দেখে ওষুধ দিয়েছে। পয়সার কথা মুখেও আনে নাই। বরং বাড়ির ভিতর থেকে একটা পুরিয়া ক'রে খানিকটা সাগুদানা এনে দিয়ে বলেছিল, এই সাগু ক'রে দিও। সাগুদানা বাজারে নাই, থাকলেও চার টাকা সের।

আন্নুর মা সাগুর পুরিয়াটা নিজে হাতে নেয় নাই। অবগুণ্ঠনবতী বউয়ের কানের কাছে ডেকে বলেছিল, নাও বউমা, সাগুর পুরিয়াটা নাও। ওগো,

হাত পাত! আঃ, কি আবাং মেয়ে গো তুমি! হাত—হাত—হাত পা—ত।

ডাক্তার বলেছিল, বকবেন না ওঁকে। ছেলেমানুষ, তার ওপর এত বড় একটা আঘাত—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল ডাক্তার।

আন্নুর মায়ের মুখে ফুটে উঠেছিল অতি ক্ষীণ—কিন্তু অতি বক্র একটি হাসির রেখা। কিন্তু তার শীর্ণ রেখাঙ্কিত মুখের অজস্র রেখার মধ্যে সে হাসি চোখে পড়বার মত নয়।

ধ্বজু সিঙের দোকানে সরকারী ভিক্ষা আড়াই সের বাজরা আঁচলে নিয়ে আন্নুর মা এসে দাঁড়াল ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারির সামনে। ছেলেটার আবার ওষুধ চাই। সমস্ত রাত ছেলেটা জ্বরে ধুঁকেছে। ডাক্তার সাগুদানা দিয়েছিল, সে সাগুদানা তেমনিই আছে। মায়ের দুধই খেতে চায় নাই, তো সাগুর জল।

ডিস্‌পেন্সারির দিকে পা বাড়াতে কিন্তু আন্নুর মায়ের দ্বিধা হচ্ছিল। ভাবছিল, ডাক্তারের সামনে সে গিয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু ডাক্তার যদি বলে, ওষুধের দাম এনেছ? তার চেয়ে বাগদী বুড়ীকে সঙ্গে দিয়ে বউটাকে পাঠিয়ে দিলে ওই ফ্যাসাদের মধ্যে আর আন্নুর মাকে পড়তে হবে না। আজ সে ব'লে দেবে বউটাকে, যাকে বলে—কানে কিল মেরে ব'লে দেবে, এতখানি ঘোমটার আদিখ্যেতায় কাজ নাই। ঘোমটাটা একটুখানি কম কর। মুখের দিকে চাইলে মানুষের মায়া হবে। মনে মনে এত সব ভেবেও কিন্তু আন্নুর মা গলা বাড়িয়ে ডিস্‌পেন্সারির ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলে। নাঃ, ডাক্তার নাই।

রতন হাড়ী বললে, দশটার পরে ঠাকরুন, দশটার পরে। কম্পানডারবাবু বলছে, দশ বাড়িতে ডাক আছে। তা ছাড়া আমরা সব আগাম এসে ব'সে আছি।

আগাম এসেছিস, তোরা সব আগাম মর।—মনে মনে এই অভিসম্পাত দিয়ে আন্নুর মা খুশি হয়ে বাড়ির পথ ধরলে। শুধু গাল দিয়ে নয়, ডাক্তারের সামনে ভিক্ষার জন্য হাত পাতার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছে ব'লেই সে খুশি হয়েছে বেশি।

প্রতিদিনের মত আকাশে উড়ো-জাহাজের দল আসছে। গোঙানি শোনা যাচ্ছে। আন্নুর মা আকাশের দিকে চেয়ে পথ চলছিল। শুধু সে নয়, সব লোক, সবাই চেয়ে আছে।

এই যে আপনি!

আন্থর মা চমকে উঠল। ডাক্তার! ডাক্তার তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

এই যে, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

আন্থর মা ঘোমটাটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আঁচলের বাজরা হাত দিয়ে নেড়ে বলতে গেল, পোড়া পেটের—

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললে, চলুন আপনার নাতিকে দেখে যাই।

আন্থর মা অবাক হ'ল না। ডাক্তার নিজেই কৈফিয়ৎ দিয়ে বললে, এই এদের বাড়িতে ডাক ছিল, আপনার বাড়ির পাশে এসে মনে হ'ল ছেলেটির কথা। তা বাড়িতে কেউ নাই। বউ ছেলেমানুষ, ঘোমটা টেনে ব'সে আছে, কথা বলে না—

আন্থর মা হাউমাউ ক'রে উঠল, কপাল, আমার পোড়া কপাল বাবা, কি বলব লজ্জার কথা, বল! ও মানুষ নয় বাবা, ও মানুষ নয়, গরু-ভেড়ার সঙ্গে কোন তফাত নাই। শুধু ওই চেহারা! বলতে বলতেই আন্থর মা প্রায় ছুটছিল, ডাক্তারের অনুগ্রহে সে যে কৃতকৃতার্থ হয়ে গেছে, তাই প্রকাশের জন্য আপনার অজ্ঞাতসারেই সে আকুল হয়ে উঠেছিল। সে কৃতকৃতার্থতা এতখানি যে, তার ঘা-খাওয়া শক্ত মনের অতি-বাস্তবসচেতনতাও এই সময়টিতে সাময়িক ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

ডাক্তার পর্যন্ত একটু ব্যস্ত এবং লজ্জিত হয়ে পড়ল আন্থর মায়ের আচরণে। সে বললে, থাক, থাক, এতখানি ব্যস্ত হবেন না, এতখানি—। আর ডাক্তারের মুখ দিয়ে কথা বের হ'ল না, এই মুহূর্তে আন্থর মা যা করলে, তাতে ডাক্তার স্তম্ভিত হয়ে গেল। আন্থর মা পুত্রবধূর মাথার ঘোমটা টেনে খুলে দিয়ে বললে, দেখ বাবা, দেখ, এই হতভাগীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি, আর আমার বুক হু-হু ক'রে জ্ব'লে ওঠে। এর পর যদি ছেলেটার কিছু হয়—! আন্থর মা ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললে।

ডাক্তারের চোখ ফেটে জল এল।

অপূর্ব সুন্দর মুখ। রুক্ষ ঘন চুল। অদ্ভুত বড় দুটি চোখ—হ্যাঁ, অদ্ভুত, এতবড় চোখে একটি ছাড়া কোন ভাষা নাই; ডাক্তার বুঝতে পারলে না তার অর্থ—বিস্ময় অথবা ভয়! ফ্যালফ্যাল ক'রে সে চেয়ে আছে ডাক্তারের দিকে। নারীসুলভ লজ্জাতেও সে দৃষ্টি নত হয় না। ডাক্তারের স্নায়ুমণ্ডলীতে একটা

প্রবাহ ব'য়ে গেল, মনের মধ্যে জেগে উঠল প্রবল মমতার আবেগ। আহা, এমন সুন্দর মেয়ে, এর ওই শিশুটির যদি কিছু হয় তবে সত্যই মেয়েটির অবস্থা কি যে হবে, সে কল্পনা করা যায় না। মেয়েটির যা হবে হবে, ডাক্তারেরই যে আক্ষেপের সীমা থাকবে না।

মিহিরবাবু তবুও ডাক্তার। আত্মসম্বরণ ক'রে সে বললে, ভয় কি? কিছু ভয় করবেন না, ছেলে সেরে যাবে।

মেয়েটিরও এতক্ষণে সম্বিত হয়েছে। সে ধীরে ধীরে ঘোমটা টেনে দিলে।

পিছনে কে ব'লে উঠল, তারা! তারা!

ডাক্তার, আন্নুর মা মুখ ফিরিয়ে দেখলে, কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন ত্রিপুরা ভট্টাচার্য, হাতে আঁকশি আর ফুলের সাজি। মিহির ডাক্তার মনে মনে অত্যন্ত রূঢ় হয়ে উঠল। ভট্টাচার্যকে সে জানে। মনে পড়ল, ভট্টাচার্যের নিজের পৌত্রের অসুখের কথা; নিষ্ঠুরতম কথা বলতে ভট্টাচার্যের বাধে না। ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে ডাক্তার ভট্টাচার্যের দিকে চাইলে। কিন্তু ভট্টাচার্য চেয়ে ছিলেন রুগ্ণ শিশু এবং তার মায়ের দিকে। অত্যন্ত করুণ দৃষ্টি ভট্টাচার্যের চোখে। ডাক্তারের ভয় হ'ল। ভট্টাচার্যের করুণার অর্থ অতি বিচিত্র।

ভট্টাচার্য কিন্তু বললেন, কোন ভয় নেই। ডাক্তার ঠিক বলেছেন; কোন ভয় নেই।

আন্নুর মা বললে, বলুন বাবা, তাই বলুন, আশীর্বাদ করুন।

ভট্টাচার্য বললেন, আশীর্বাদ তো কালই করেছি মা। তোমরা চ'লে এলে, দেখলাম খোকার জ্বর এল, মন খারাপ হয়ে গেল আমার। সমস্ত দিন মনের মধ্যে ওই কথাই ঘুরল আর ফিরল। সন্ধ্যেতে জপে বসলাম, মনে মনে বললাম, মা, আমার এ কথা যদি মিথ্যে হয়, তবে বল্, তার আগে আমি মরি, ম'রে লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই। আর আমার হাতের পূজো যদি নিস, তবে বল্, আশীর্বাদী দে, যাতে দুঃখিনীর ধনের কল্যাণ হয়, রোগ ভাল হয়, দীর্ঘজীবী হয়ে সে বেঁচে থাকে। বলব কি মা, ঠিক সেই মুহূর্তে মায়ের মাথা থেকে খ'সে পড়ল এই জবাফুল!

ডাক্তারের শরীর পর্যন্ত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। আন্নুর মা অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। চোখ দিয়ে অনর্গল জল ঝ'রে পড়ছিল। কিন্তু অদ্ভুত ওই তরুণী মা-টি, স্থির হয়ে ব'সে আছে পাথরের মত।

ভট্টাচার্য বলছিলেন, কাল রাত্রেই ভাবলাম, যাই, দিয়ে আসি মায়ের

আশীর্বাদী, তা বুড়ো মানুষ, চোখের নজর তো আর ভাল নাই। আর বেরুতে পারলাম না। নাও, ধর আশীর্বাদী।

আশীর্বাদী দিয়েও ভট্টাচার্য দাঁড়িয়ে রইলেন। ডাক্তার অত্যন্ত ধীরভাবে ছেলেটিকে পরীক্ষা ক'রে দেখছিল। পরীক্ষা শেষ ক'রে ডাক্তার ইন্‌জেক্‌শনের সরঞ্জাম বের করলেন। আন্নুর মা উৎকণ্ঠিত হয়ে ব'লে উঠল, ডাক্তারবাবু!

ব্যাগ থেকে দেখে দেখে একটি ইন্‌জেক্‌শনের ওষুধের অ্যাম্পিউল বার ক'রে ডাক্তার বললে, ভয় নেই। ম্যালেরিয়া জ্বর।

তবে ইন্‌জেক্‌শন দেবেন কেন? রোগ কঠিন না হ'লে?

কঠিনে যাতে না দাঁড়ায় তারই ব্যবস্থা করছি। কুইনিন ইন্‌জেক্‌শন দেব। অ্যাম্পিউলটির মাথায় তুলো জড়িয়ে সুকৌশলে আঙুলের চাপে মুট ক'রে মাথার দিকটা ভেঙে ফেলে ডাক্তার সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে নিলে ওষুধটাকে। তারপর আন্নুর মায়ের দিকে চেয়ে হেসে বললে, এই দেখুন, আপনি মুখে দিয়ে দেখুন না এক ফোঁটা—কুইনিন, কি আর কিছু! ব'লে সে অ্যাম্পিউলটি উপুড় ক'রে ধরলে আন্নুর মায়ের হাতের উপর। ফোঁটাখানেক ওষুধ ঝ'রে পড়ল। ডাক্তার হেসে বললে, দেখুন না!

আন্নুর মা জিব দিয়ে চেটে বিস্মিতভাবে মুখ নেড়ে কয়েকবার আস্বাদন অনুভব করবার চেষ্টা ক'রে বললে, কুনিয়ান তো তেতো ডাক্তারবাবু।

চকিতে বিস্ময় ফুটে উঠল ডাক্তারের দৃষ্টিতে। আন্নুর মায়ের দিকে চেয়ে সে বললে, হ্যাঁ, তেতোই তো।

তেতো নয়! ডাক্তার ভাঙা অ্যাম্পিউলটা তুলে ধ'রে দেখলে, তারপর সিরিঞ্জ থেকে এক ফোঁটা নিজের হাতে নিয়ে চেটে দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। শুধু স্পিরিটের গন্ধযুক্ত খানিকটা জল। ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল খানিকক্ষণ। তারপর সিরিঞ্জের ওষুধটুকু পিস্টন ঠেলে মাটির উপর ফেলে দিয়ে বললে, যাক, ও-বেলা এসে আমি ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে যাব। এ-বেলা ওষুধ দেব একটা। কেউ গিয়ে—

আন্নুর মা বললে, আমি যাব বাবা।

ডাক্তার উঠে আবার বললে, কোন ভয় নাই। দরকার হবে না, তবে দরকার হ'লে তখনই খবর দেবেন আমাকে।

ভট্টাচার্য দাঁড়িয়েই ছিলেন। তিনি বললেন, শুনলে মা, ডাক্তার বললেন, কোন ভয় নাই। বলছি যে, আমার মা বলেছেন।

প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

ডাক্তারের সঙ্গেই তিনি বেরিয়ে এলেন। পথে দুজনে একসঙ্গেই চলেছিলেন। ঘটনাটা নূতন। কিছুক্ষণ পর ভট্টাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, কোন ভয় নাই ব'লেই মনে হয়, কি বলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার বললেন, আপাতত ভয় তো কিছু দেখলাম না। ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া যদি হয়—। ডাক্তার চুপ করলে। ভট্টাচার্য তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

ডাক্তার নীরবেই পথ চলতে লাগল। ডাক্তারের নীরবতায় উৎকণ্ঠিত হয়ে ভট্টাচার্য উদাস কণ্ঠস্বরে ব'লে উঠলেন, তারা, তারা মা!

ডাক্তার ডিস্‌পেন্সারিতে এসে কুইনিনের অ্যাম্পিউলগুলি প্রত্যেকটি ভেঙে নিজে আস্বাদ ক'রে দেখে ফেলে দিলে। নিজের মনেই বললে, স্কাউণ্ড্রেল! আন্নুর মা অ্যাম্পিউলের ভিতরের তরল পদার্থের আস্বাদ নিয়ে বলেছিল, তেতো নয়। সে তার ভ্রম নয়, অ্যাম্পিউলের ভিতরে কুইনিন নাই। শুধু জল।

—পাঁচ—

শশী এসে দাঁড়াল। ডাক্তারের বিরক্তির আর সীমা রইল না। রূঢ়স্বরেই সে বললে, তোকে না আমি কাল ব'লে দিয়েছি শশী, কুইনিন রোগীতে পাচ্ছে না, তোকে দিতে আমি পারব না। শিউলীর পাতা ছেঁচে খেগে, বেলপাতা ছেঁচে খেগে, ছাতিমের ছাল সেদ্ধ ক'রে খেগে যা।

আজ্ঞে না। সে জন্যে নয়; ওই—ওই আন্নু ঠাকুরের—

অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ডাক্তার বললে, কি? কি? আন্নু ঠাকুরের ছেলে কেমন আছে? এই তো দেখে আসছি আমি।

আজ্ঞে, তেমুনি আছে ছেলে। আমি ওষুধ নিতে এসেছি।

ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে গেল। আন্নুর জন্য শশী তিনবার ধরা পড়েছে পুলিসের হাতে, আর সেই শশী এসেছে—

ডাক্তারের বিস্মিত দৃষ্টি অত্যন্ত স্পষ্ট, শশী মাথা নীচু ক'রে ঈষৎ লজ্জিত ভাবেই বললে, ওই পানে আসছিলাম, তা আন্নু ঠাকুরের মা বললে, আমার নাতির ওষুধটা যদি এনে দাও বাবা শশী!

কথাটা ব'লেও তার মনে হ'ল, বলাটা তার সম্পূর্ণ হয় নাই, ডাক্তারের

সবিস্ময় প্রশ্নের জবাবও এ নয়। তাই সে আবার বললে, কাল শ্মশান থেকে এল মাশায়, ওই কচি বউটিকে দেখে বড় মায়া হ'ল। আ-হা-হা—মাশায়—ভগমানের—। শশীর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। সে চুপ ক'রে গেল।

ডাক্তারও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, ব'স্, দিচ্ছি ওষুধ। ডাক্তার নিজেই উঠল ওষুধ তৈরি করতে। কম্পাউণ্ডারটি তাঁর পাকা, গুঁড়ো কুইনিনের সঙ্গে ময়দা মিশিয়ে সে কুইনিন সরিয়ে ফেলে।

শশী আপন মনেই বললে, কাল সারারাত ঘুমুই নাই ডাক্তারবাবু। এক-একবার মনে হচ্ছিল, আনু ঠাকুর মরেছে, বেশ হয়েছে। কিন্তুক ওই বউটির কথা মনে হয়েছে, আর হায়-হায় করেছি। শশী চুপ করলে।

নিবিষ্ট মনে ডাক্তার নিক্তির দিকে তাকিয়ে ওষুধ ওজন করছিল, সেও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। শশীর কথাগুলির সঙ্গে তার মনের তার এক সুরে বাজছে। এর মধ্যে এতটুকু কিছু অসঙ্গত দেখতে পেলে না।

বাইরে রোগীরা কাতরাচ্ছে।

কম্পাউণ্ডার একটা বড় বোতল থেকে শিশিতে ওষুধ ঢেলে দিচ্ছে।

শশীর প্রাণ যেন কেমন হাঁপিয়ে উঠছে এদের মধ্যে ব'সে। মানুষের মরণ দেখে তার বড় ভয় হয়। কিন্তু জীর্ণশীর্ণ রোগা মানুষকে দেখে তার মন নাড়া খেত না। এক-একজনের কাতরানি দেখে তার হাসি পেত। মড়াকান্না শুনে তার রাগ হ'ত। আপন মনেই সে বলত, আদিখ্যেতা! তোর কি একা মরেছে রে বাপু? কিন্তু কাল সন্ধ্যাবেলা থেকে তার সব যেন ওলটপালট হয়ে গেছে। বউটির বৈধব্য দেখে তার মন সেই যে হায়-হায় করতে শুরু করেছে, সে হায়-হায়-এর আর বিরাম নাই। রোগা মানুষের কাতরানি শুনে তার বুকটা কেমন ক'রে উঠেছে, শোকাতুর মানুষের কান্না শুনে সে মনে মনে হায়-হায় ক'রে সারা হয়েছে। এমন কি কাল রাত্রে চুরি করতে বেরিয়ে ঘোষেদের কানাচের গলি দিয়ে যাবার সময় ঘোষ-বুড়ীর গুনগুন স্বরে কান্না শুনে তার সর্বাঙ্গ থরথর ক'রে কেঁপে উঠেছিল। মাথার বস্তাটা প'ড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ঘোষ-বুড়ীর মেয়ে সরলা কাল মরেছে। নিস্তব্ধ রাত্রে সবাই ঘুমিয়েছে, বুড়ী কেঁদে চলেছে। আগের দিন হ'লেও শশীর মনে হ'ত, এই বস্তাটা বুড়ীর বুকে চাপিয়ে দেয়; বুড়ীর ওই বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না চিরদিনের মত বন্ধ ক'রে দেয়; যে পথে গিয়েছে তার সরলা, সেই পথেই বুড়ীকে রওনা ক'রে দেয়। কিন্তু আর তা মনে হয় নাই। দাঁতে দাঁত টিপে সে কোনমতে

গলি থেকে বেরিয়ে যখন আন্নুর মায়ের বাড়ির কানাচে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন তার বুকটা যেন ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছিল। পরিশ্রমের হাঁপানির সঙ্গে একটা শোকাতুর আবেগে তার ফুসফুস ফেটে যেতে চাচ্ছিল যেন। আন্নুর মায়ের ভাঙা খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে বাড়ির একটা নিরালা কোণে কুমড়ো-লতার জঙ্গলের মধ্যে বস্তাটা নামিয়ে দিয়ে সেইখানেই সে বুকে হাত দিয়ে দীর্ঘক্ষণ ব'সে ছিল।

চণ্ডীতলায় আন্নুর মা যে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল, ওই কচি বউ, কোলে দুধের ছেলে, আমি ওদের মুখে কি দেব বাবা শশী? সে কথাটা শশী ভুলতে পারে নাই। আন্নুর মায়ের দুঃখের জন্য নয়। ওই কচি বউ আর তার কোলের দুধের ছেলেটার জন্য সেও ভেবে সারা হয়েছে সমস্ত দিন। সত্যই তো, কি খাবে ওরা?

না খেতে পেয়ে শুকিয়ে ছেলেটা প্যাঁকাটির মত হয়ে যাবে, পাখীর ছানার মত চিঁ-চিঁ ক'রে চেঁচাবে। বউটির ওই সোনার মত রঙের উপর ময়লার ছাপ পড়বে, ছেঁড়া কাপড়ে তার মাথার রুখু চুলের অর্ধেকটা বেরিয়ে পড়বে, পিঠের গোটাটাই হয়তো দেখা যাবে; একটা মাটির খোলা হাতে ক'রে ফিরবে।— শশীর বুকের ভিতরটা অস্থির হয়ে উঠেছিল। সে বেরিয়ে পড়েছিল বস্তা হাতে। তার স্ত্রী বলেছিল, আজ আবার কি করতে যাবা? এইতো পরশু—

বাধা দিয়ে শশী হিংস্রভাবে তর্জন ক'রে উঠেছিল।

শশীর স্ত্রী আর কিছু বলতে সাহস করে নাই।

সমস্ত সকালটা শশী আন্নুর মায়ের খিড়কির ধারে ঘুরেছে। আন্নুর মা যখন বাজরা আনতে এসেছিল, তখন থেকে ঘুরেছে। কিন্তু বউটি অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে ব'সে ছিল মাটির পুতুলের মত, তার ওই মুখের দিকে চেয়ে বাড়িতে সে কিছুতেই ঢুকতে পারে নাই। সে একটা ঝোপের আড়ালে ব'সে ঘাসের ডাঁটি তুলে তার নরম দিকটা চিবিয়েছে আর বউটির মুখের দিকে চেয়ে থেকেছে। তারপর এল আন্নুর মা, সঙ্গে ডাক্তার, একটু পরেই এল ভট্টাচার্য মশায়। ভট্টাচার্য, ডাক্তার বেরিয়ে যাবার পর শশী বাড়ি ঢুকেছিল। ধানের বস্তাটা দেখিয়ে দিতেই আন্নুর মা কৃতকৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। বউটি কিন্তু একটি কথাও বলে নাই। সেই তেমনই ভাবে ব'সে ছিল। আন্নুর মা বলেছিল, তুমি একটু বসবে বাবা শশী, আমি তা হ'লে দশ সের ধান বেচে দুটি চাল ডাল নিয়ে আসি।

শশী আপত্তি করে নাই। কিন্তু আন্নুর মা চ'লে যাবার কিছুক্ষণ পরেই সে দারুণ অস্বস্তি অনুভব করতে আরম্ভ করেছিল। ঘোমটা দিয়ে বউটি ব'সে আছে একভাবে সেই পুতুলের মত; খালি হাত দুখানি বেরিয়ে আছে, কোলের কাছে ছেলেটা শুয়ে আছে নিস্তেজ হয়ে। চুপ ক'রে ব'সে শশীর মনে হয়েছিল, তার টুঁটিটা যেন কে চেপে ধরেছে, বুকের উপর একটা পাথর চাপিয়ে দিয়েছে। জীবনে অনেকবার পুলিশে তাকে হাজতে পুরে রেখেছে, অন্ধকার রাত্রে ছোট ঘরটায় সে একা ব'সে থেকেছে, শিক-ঘেরা দরজার ওপাশে কন্‌স্টেব্‌ল ঘুরেছে, তার চলন্ত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে শশীর রাত কাটাতে এতটুকু কষ্ট হয় নাই। কিন্তু আজকের এই ব'সে থাকার উদ্বেগজনক কষ্টকর অনুভূতি কখনও সে ভোগ করে নাই। তাই দোকান থেকে ফিরে এসে আন্নুর মা যখন তাকে বলেছিল, আর একটু যদি কষ্ট ক'রে ব'স বাবা শশী, তবে আমি ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ওষুধটা নিয়ে আসি, শশী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, তুমি ব'স ঠাকরুন, তুমি ব'স। আমি যেছি।

ডাক্তারের এখানে এই রোগা লোকগুলির মধ্যে ব'সে তাদের কাতরানি শুনে তার প্রাণ আবার হাঁপিয়ে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছে, উঠে ছুটে পালিয়ে যায় সে, কিন্তু সেই হাতখানি তাকে যেন ডাকছে, কই, আমার খোকার ওষুধ?

... ...

আট দিন পর।

ডাক্তার চুপ ক'রে ব'সে ছিল তার ডিস্‌পেন্সারির সামনের খোলা দাওয়ার উপর। রাত্রি আটটা বাজে। কার্তিক মাসের শেষ, এবার এরই মধ্যে কনকনে ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। ভাদ্রের বন্যার জলের ঠাণ্ডা উঠছে মাটি থেকে। গ্রামখানার এই দিকটাকেই বলে—বাজারপাড়া। এ পাড়ায় মানুষের সাড়া সাড়ে দশটা এগারোটার কমে কখনও স্তব্ধ হয় না। দোকানে দোকানে আলো জ্বলে। লটকোনের দোকানে খাতা মেলায়, তহবিলের টাকা গুনতি হয়। ময়রাদের দোকানে ভিয়েন চলে, বাতাসা কাটে, কদমা কাটে, রসের সন্দেশ পাক করে—সারা রাত রসে ভিজতে পায়। কাটা কাপড়ের দোকানে খটো-খটো শব্দ ক'রে কল চলে। কাপড়ের দোকানে কাপড়ের নম্বর দেখে থাকে থাকে সাজানো চলতে থাকে। দু-পাশের দোকানের মাঝখান দিয়ে যে পাকা রাস্তাটা চ'লে গেছে এক দিকে মুরশিদাবাদ অন্য দিকে বেহার, সেই পথে ক্যাঁ-ক্যাঁ শব্দ

তুলে গরুর গাড়ি যায় আসে ;—বেহারের দিক থেকে আসে শালকাঠ, শালপাতা ; মুরশিদাবাদের দিক থেকে আসে কলাই, কুমড়ো, পেঁয়াজ, লঙ্কা ; নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে আসে ধান। ওদিক থেকে সাঁওতালেরা আসে মজুরির সন্ধানে ; এদিক থেকে আসে স্থানীয় লোকজন, পূর্বের অঞ্চলের সাত-আট ক্রোশের মধ্যের গ্রামগুলির এইটিই নিকটস্থ রেল-স্টেশন। এবার কিন্তু এরই মধ্যে সব স্তব্ধ, অন্ধকার। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, রাস্তাটা খাঁ-খাঁ করছে। ডাক্তার পথের দিকে চেয়ে ব'সে ছিল।

ডাক্তারের মেয়ে ডেকে বললে, বাবা, ঘরে এসে বসুন, মা বলছেন, হিম পড়ছে যে।

যাচ্ছি।

খাবার করবেন ? মা জিজ্ঞাসা করলেন।

না। শশী ফিরবে, মতিপুর গেছে। তারপর ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে এসে খাব।

শশী গেছে মতিপুরের বাজার। মতিপুরের বাজার এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বাজার, বিশেষ ক'রে ওষুধের এমন স্টক জেলার সদর-শহরেও নাই। 'প্রণ্টোসিল' আর কয়েকটা ইন্‌জেক্‌শন আনতে গেছে শশী। ইন্‌জেক্‌শনের চেয়েও জরুরি দরকার প্রণ্টোসিল পিলের। পাওয়া না গেলে—সে কথা ভাবতে ডাক্তার অধীর চঞ্চল হয়ে ওঠে। আনু ঠাকুরের ছেলেটির ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া হয় নাই, হয়েছে মেনিন্‌জাইটিস। ম্যালেরিয়া, বেরিবেরি, টাইফয়েড —এগুলোর আনুষঙ্গিক হিসেবে এতদিন ছিল শুধু নিউমোনিয়া, এবার মেনিন্‌জাইটিসও এসে জুটল। কলেরাও চলছে এখানে ওখানে। কোন্‌টা কলেরা, কোন্‌টা ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া, কোন্‌টা বেরিবেরি সব সময়ে বুঝতে পারা যায় না। মানুষ মরছে।

আকাশের নৈঋত কোণে গোঁ-গোঁ শব্দ উঠছে। ডাক্তার সেই দিকে তাকালে। লাল নীল সাদা তিনটে আলোকবিন্দু—উল্কার মত দ্রুতবেগে চলেছে। প্লেন যাচ্ছে। দিন রাত্রি—কোন সময়েই বিরাম নাই। আকাশে প্লেন চলছে, পথের উপর আজকাল দিনের বেলা যায় মিলিটারি লরি ; গ্রামের পায়ে-চলা পথ ধ'রে চলছে মড়া-কাঁধে রোগা মানুষ। আট দিনে ডাক্তারের হাতের রোগীর মধ্যে সাঁইত্রিশটা রোগী মরেছে। আজ রাত্রেই বোধ হয় আরও চারটে যাবে। মিহির ডাক্তার বরাবরই ধীর চিকিৎসক ; ধীরতার সঙ্গে সে

চিকিৎসা করে, ভাল মন্দ দুইই সে গ্রহণও করে ধীরতার সঙ্গে। মৃত রোগীর হাতখানি ধীরে ধীরে তার বুকের উপর অথবা পাশে নামিয়ে দিয়ে শান্ত ধীর পদক্ষেপে উঠে আসে। বুঝতে পারলে, আগে থেকেই রোগীর আত্মীয়স্বজনকে শান্তভাবে সহৃদয়তার সঙ্গে ব'লেও দেয় সে কথা। এবার তার শান্ত ধীরতা —এই হিমানীশীতল মৃত্যু-ঝড়ের স্পর্শে জলের মত জ'মে কঠিন হয়ে উঠেছে।

চারটে হয়তো আজই যাবে, তা ছাড়া আজ হোক কাল হোক, দু দিন চার দিন পরে হোক, যাবেই, মৃত্যু নিশ্চিত, এমন রোগী—নসুরামের স্ত্রী, ব্যোমকেশ মুখুজ্জে, হরিধনের কন্যা, চণ্ডীর মা, রামচরণের ভাই, পাঁচজন। পাঁচজন কেন, প্রণ্টোসিল আর ইন্‌জেক্‌শনগুলো না পেলে—; শীতপ্রধান দেশের নদীর উপরের কঠিন বরফের স্তরের তলদেশের জল চঞ্চল হয়ে উঠল যেন; ডাক্তারের মন ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। তার মনের মধ্যে ভেসে উঠল সেই অদ্ভুত মেয়েটির কথা। অচঞ্চল স্তব্ধ মেয়েটিকে সেই প্রথম দিন থেকেই একভাবেই দেখে আসছে। অবগুণ্ঠনে সর্বাঙ্গ ঢেকে এক পাশে ব'সে থাকে, দেখা যায় শুধু দুখানি নিরাভরণতায় সকরুণ সুকোমল লাবণ্যভরা হাত, এই হাত দুখানি দেখলেই মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীই যেন কাঙাল হয়ে গিয়েছে। আর দেখা যায় অতি শুভ্র দুখানি পা; মধ্যে মধ্যে কদাচিৎ চোখে পড়ে তার মুখ, তাতে সেই এক অভিব্যক্তি, যার অর্থ ডাক্তার আজও বুঝতে পারে নাই। মধ্যে মধ্যে ডাক্তারের সন্দেহ হয়, মেয়েটি বোধ হয় পাগল অথবা—। ডাক্তারের মন অকস্মাৎ অন্য দিকে ফিরল, একটা সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণাগ্র কিছু তার মনকে অতর্কিতে স্পর্শ করেছে।

কান্নার রোল উঠছে। বেশি দূরে নয়। নসুরামের বাড়ি থেকে উঠছে। নসুর স্ত্রীই মারা গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাক্তার একটু হাসলে। আজই মরবে এমন কথা ডাক্তার ভাবে নাই। মরেছে, তাতেও সে বিস্মিত হয় নাই। হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্র স্তব্ধ হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু!

কে?

আমি।

ডাক্তার টর্চটা জ্বাললে। ত্রিপুরা ভট্টাচার্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ডাক্তার উঠে এগিয়ে এল।—আপনি কি ওখান থেকে আসছেন?

হ্যাঁ। একবার চলুন আপনি।

ডাক্তারের পায়ের নখের ডগা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা উৎকণ্ঠিত অনুভূতি বিদ্যুৎবেগে খেলে গেল। গিয়ে কি করবে সে? কি করতে পারে? মিনিটখানেক সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

ডাক্তারবাবু!

দৃঢ়সঙ্কল্পের একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলে ডাক্তার সোজা হয়ে দাঁড়াল। হ্যাঁ, তাইই করবে সে। লাম্বার পাংচারই করবে। তার বিদ্যার দুঃসাহসিক চেষ্টাই সে করবে। লাম্বার পাংচার পল্লীগ্রামে দুঃসাহসিক চেষ্টা। কলেজে সে দেখেছে, সেখানে বোধ হয় চার-পাঁচটা কেস নিজে হাতে করেছে, কিন্তু তারপর আর করে নাই। তা হোক। এ ছাড়া উপায় নাই।

সে সযত্নে পরীক্ষা ক'রে দেখে স্বচ বেছে নিয়ে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়ল।

ত্রিপুরা ভট্টাচার্য আর আন্থর মা স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখছিল ডাক্তারের কার্যকলাপ। থরথর ক'রে কাঁপছিল তারা।

মেরুদণ্ডের ভিতর থেকে ডাক্তার স্বচটা সযত্নে বার ক'রে নিয়ে নিশ্বাস ফেললে। এতক্ষণে তার অন্য দিকে তাকাবার অবকাশ হ'ল। সামনেই লণ্ঠন জলছে। উপরে মেয়েটি ব'সে আছে। তার মুখের অবগুণ্ঠন খ'সে গেছে। সেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ডাক্তারের স্বচটির দিকে। ডাক্তারের হাত থেকে সিরিঞ্জটা খ'সে প'ড়ে গেল। সে কেঁপে উঠেছে।

চকিত হয়ে ভট্টাচার্য প্রশ্ন করলেন, ডাক্তারবাবু?

আন্থর মা ঝুঁকে পড়ল রুগ্‌ণ নাতির উপর, অনুভব ক'রে দেখছে সে।

ডাক্তার শান্তস্বরে বললে, রোগী ঘুমুচ্ছে।

ভট্টাচার্য বললেন, মায়ের চরণোদক একটু—

ডাক্তার বললে, দিন।

ও-পাশে বাইরের দরজার মুখে দীর্ঘাকৃতি কে এসে দাঁড়িয়েছে।

ডাক্তার বললে, কে, শশী?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ছেলে কেমন আছে?—কণ্ঠস্বরে তার অপরিসীম উদ্বেগ।

এখন একটু ভাল। কিন্তু তুই ওষুধ পেয়েছিস?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বার বার ঘাড় নেড়ে শশী বললে, আজ্ঞে না।

ডাক্তার সযত্নে ভাঙা সিরিঞ্জের কাচগুলি কুড়িয়ে নিয়ে উঠল। আন্নুর মাকে ডেকে বললে, দেখুন—

আন্নুর মা কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে, ডাক্তারবাবু!

ভট্টাচার্য এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। শশীও এগিয়ে এল। ডাক্তার বললে, দেখুন, আমার—। ব'লেই সে ওই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেমে গেল।

আন্নুর মা ডাক্তারের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দেখে ব'লে উঠল, আপনি বলুন ডাক্তারবাবু, আপনি বলুন। ও হতভাগী কালা—বোবা।

সকলের মুখে ফুটে উঠল অদ্ভুত অভিব্যক্তি, বিস্ময়, করুণা, হয়তো কিছুখানি তাচ্ছিল্যও আছে তার মধ্যে। ডাক্তারের মুখে তার প্রকাশ সবচেয়ে কম। এ সন্দেহ তার হয়েছিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাক্তার বললে, আমার শেষ চেষ্টা আমি করলাম। যদি ভাল থাকে, কাল সকালে খবর দেবেন।

ডাক্তার মাথা নত ক'রে অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হ'ল আপনার বাড়ির দিকে।

ভট্টাচার্যও ডাক্তারের পিছনে পিছনে বেরিয়ে গেলেন। উদাস দৃষ্টিতে অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে পথ চলছিলেন ভট্টাচার্য।

শশী এখনও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেই দিকে চেয়ে; লণ্ঠনের আলোর ও-পাশে মেয়েটির দিকে চেয়ে। আবছা অন্ধকারের মধ্যে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে—সে কাঁপছে। আন্নুর মায়ের কথা কয়টির মধ্যে সে যেন গভীর আতঙ্ককর কিছুর সন্ধান পেয়েছে।

—ছয়—

বোবা মেয়ে কাঁদছিল। রাত্রি প্রায় তিনটে। ছেলেটি মারা গেছে। শশী আর থাকতে পারলে না। সে ছুটে বেরিয়ে গেল আন্নুর বাড়ি থেকে।

কালা বোবা বউটি, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ব'সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আন্নুর মা নাতির মুখের দিকে চেয়ে ব'সে ছিল। মধ্যরাত্রি থেকে আবার তার আক্ষেপ শুরু হয়েছিল; চীৎকার ক'রে উঠছিল সে আগের মত। কালা বউটির সেসব কিছুই কিন্তু কানে যায় নাই। ছেলেকে ঘুমুতে দেখে সেও দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। একে কালা, তার উপর ঘুমন্ত অবস্থা, চীৎকার তাকে স্পর্শই করে নাই।

শশী কিন্তু সেই সন্ধ্যা থেকেই ছিল, যায় নাই। কেউ অনুরোধ করে নাই, তবু সে গভীর উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে ব'সে ছিল। গলার ভিতর কিছু যেন মধ্যে মধ্যে আটকে যাচ্ছে; মনে হয়েছে, কাঁধের উপর থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত একটা মৃদু অথচ অত্যন্ত অস্বস্তিকর যন্ত্রণা অনুভব করছে; বুকের ভিতরে ঢেঁকির আঘাত পড়ছে এমনই ভাবে হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে, তবু সে যেতে পারে নাই। ভগবানকে ডাকে নাই। ডাক্তারের ওই সূচ ফুটিয়ে চিকিৎসায় ফল হবে এমন আশা করে নাই, ব'সে ছিল কখন ছেলেটার হয়ে যাবে এই প্রতীক্ষা ক'রে। এক-একবার ছেলেটা নড়েছে, আর শশী চমকে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে, তার টুঁটিটা কে চেপে ধরলে যেন। যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে তার জল পড়েছে বহুবার।

আন্নর মা ব্যস্ত হয়ে উঠল, ঝুঁকে পড়ল নাতির উপর। শশী উপুড় হয়েই জানোয়ারের মত এগিয়ে গেল খানিকটা।

চীৎকার ক'রে কেঁদে আন্নর মা শিশুটির বুকের উপর আছড়ে পড়ল। শশী কাঁপতে আরম্ভ করলে, মনে হ'ল, তার দম বুঝি বন্ধ হয়ে গেল। বউটি অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। মুখের ঘোমটা খ'সে গেছে। শশী অকস্মাৎ চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল, ওঃ—ওঃ—ওঃ! ওই চীৎকারে জাগল বউটি। তার বধির কানের নিদ্রাস্তব্ধ স্নায়ুতন্ত্রীতেও ঘা দিয়েছে শশীর চীৎকার। বউটি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখলে, শাশুড়ী শিশুর উপর উপুড় হয়ে পড়েছে। কুৎসিত শশীর কান্নায়-ভাঙা বিকৃত মুখ তার চোখে পড়ল; কানেও যাচ্ছিল এই চীৎকারের স্পর্শ, অন্ধকার গভীর গুহার মধ্যে গুহা-মুখের শব্দধ্বনির মত। সেও উপুড় হয়ে পড়ল ছেলের উপর, হাত দিয়ে নেড়ে স্পর্শের মাধ্যমে বুঝলে, স্থির দৃষ্টিতে ছেলের নিস্পন্দ দেহের দিকে মুখের দিকে :চেয়ে বুঝলে, তারপর—ছেলের দেহটা ছিনিয়ে নিলে একটা চীৎকার ক'রে। বোবার শোকার্ত চীৎকার; তার মধ্যে কথা নাই, শুধু একটানা লম্বা বেদনায় তরঙ্গায়িত একখানি, হ্যাঁ, একখানি কণ্ঠস্বর। কার্তিক মাসের আকাশে উল্কাপাত হয় বেশি; শশীর মনে পড়ল সেই তারা খ'সে পড়ার কথা, হঠাৎ আকাশ চিরে ছুটে যায় নীল আলো, কিছুদূর গিয়ে নিবে যায়। চোখ সইতে পারে না, মন প্রাণ কেমন ক'রে ওঠে, কিন্তু এমন আলোর ছটা আর হয় না। ঠিক তেমনই। এমন কান্না আর হয় না। সে কখনও শোনে নাই।

শশীর আর সহ্য হ'ল না। সে ছুটে বেরিয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে সে ছুটে চলেছিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। অমাবস্যার কাছাকাছি বোধ হয়। রাস্তার দু পাশে ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে নিরেট মাটির ঢিবির মত। হঠাৎ চোখে পড়ল সরু লম্বা এক টুকরো আলো। জানালার মুখের ফাঁক দিয়ে ঘরের আলো বেরিয়ে আসছে। শশী দাঁড়াল। ডাকলে, ডাক্তারবাবু!

ডাক্তারেরই বাড়ি; শশীর ভুল হয় নাই। জানালা খুলে গেল।—কে? শশী? ডাক্তারেরও চিনতে ভুল হয় নাই। অনেক রোগীরই মরবার আশঙ্কা আছে, তাদেরও আপনার জনেরা আসতে পারে, কিন্তু ডাক্তার এই ডাকটিরই প্রতীক্ষা ক'রে বিনিদ্র ব'সে ছিল। আরও সে জানত, শশীই আসবে ডাকতে।

একবার আসুন।—ম'রে গেছে জেনেও শশী ডাকলে।

ডাক্তার বেরিয়ে এল। শশীকে প্রশ্ন করলে না, কেমন অবস্থা!

শশী বললে, আপনি যান, আমি ভটচায মশায়ের কাছ থেকে মায়ের পুষ্প নিয়ে আসি।

ডাক্তার বললে, যা, ছুটে যা।

শশী আবার ছুটল।

ভট্টাচার্য বাড়িতে নাই। মায়ের মন্দির থেকে ফেরেন নাই আজ। শশী আবার ছুটল। চারপাশে ঘন জঙ্গল, থমথম করছে চারদিক, চিঁ-চিঁ ঝিঁ-ঝিঁ ক'রে ডাকছে ঝিঁঝিঁপোকা আর কত কীটপতঙ্গ, চ্যাঁ-চ্যাঁ শব্দে ডাকছে প্যাঁচা। রাত্রি তিন পহর হয়ে গেল। শশী ঢুকল চণ্ডীতলায়। মন্দিরের অন্ধকার বারান্দায় ভট্টাচার্য ব'সে আছেন স্থির হয়ে। শশী ডাকলে, ভটচায মাশায়! ঠাকুর মাশায়!

তারা, তারা মা! ভট্টাচার্য চঞ্চল হয়ে উঠলেন, কে? শশী?

আজ্ঞে, মায়ের পুষ্প নিয়ে চলুন একবার।

ভট্টাচার্য উঠলেন, পুষ্প নিলেন। তাঁর বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে উঠল। জীবনে বোধ হয় এমন কষ্ট কখনও হয় নাই। তবু বলতে চাইলেন, ভয় কি? কোন ভয় নাই। কিন্তু মুখ দিয়ে সে কথা বের হ'ল না। অন্ধকার ঘুমন্ত পল্লীর মধ্য দিয়ে চারখানি পায়ের শব্দ দ্রুততালে বেজে এগিয়ে চলল। আরও একটি ক'রে শব্দ দুজনেরই কানে আসছিল, বুকের ভিতরে ধকধক শব্দ উঠছে।

বোবা মেয়ে কাঁদছে।

ডাক্তার বেরিয়ে এল। ভট্টাচার্য বেরিয়ে এলেন। শশীও বেরিয়ে এল। আন্নুর মা ডাক্তারকে কিছু বললে না, ভট্টাচার্যকে ডাকলে না, ডাকলে, বাবা শশী!

তিনজনেই দাঁড়াল।

আন্নুর মা বললে, খোকার গতির কি হবে বাবা? তুমি—

শশী পাথরের মত দাঁড়িয়ে গেল।

ডাক্তার বললে, তুই যা শশী, তা ভিন্ন—

ভট্টাচার্যের গলা দিয়ে বের হ'ল—অদ্ভুত একটা স্বর।

এদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুকে দাহ করে না, মাটির মধ্যে পুঁতে দেয়।

আন্নুর মা বললে, নিয়ে আমি যাব। কিন্তু গর্ত করতে আমি তো পারব না।

ভট্টাচার্য দাঁড়ালেন, এগিয়ে চললেন দ্রুতপদে। ঘাড় হেঁট করে যেতে যেতে হাতের মুঠার মধ্যে তিনি কচলে পিষ্ট করছিলেন একটা জবাফুল, দু তিনটে বেলপাতা।

ডাক্তার ডাকলে, দাঁড়ান ভটচায মশায়। সেও দ্রুতপদে এগিয়ে চলল।

ভট্টাচার্য দাঁড়ালেন না। ডাক্তর গতি দ্রুততর করলে।

রাত্রিশেষে হিমতীক্ষ্ণ বাতাস বইতে শুরু করেছে। পাশেই একটা বাড়িতে কেউ বিনিয়ে বিনিয়ে মৃদুস্বরে কাঁদছে। ঘুম ভেঙে গেছে, সুপ্তিমগ্ন অন্ধকারের মধ্যে মনে পড়েছে মৃত প্রিয়জনকে। দূরে কোথায় কতকগুলা কুকুর এক-সঙ্গে চীৎকার ক'রে কাঁদছে। হ্যাঁ, কাঁদছে। কুকুর কাঁদে। ডাক্তার আরও দ্রুত চলতে চেষ্টা করলে। এগুলা তাকে তত পীড়িত করছে না, কিন্তু এখনও শোনা যাচ্ছে ওই বোবা মেয়ের কান্না!

ভট্টাচার্য পিছন থেকে ডাকলে, দাঁড়ান ডাক্তারবাবু। যুবক ডাক্তার, ভট্টাচার্যকে অতিক্রম ক'রে গেছে। ডাক্তার দাঁড়ালে না।

সে অস্থিরভাবে টানছিল স্টেথোস্কোপের রবারের নল দুটো। একটা নল ছিঁড়ে গেল। বেশ হয়েছে। কি হবে ডাক্তারি ক'রে? বোবা মেয়ের কান্না এখনও শোনা যাচ্ছে। সমস্ত পৃথিবীময় যেন ছড়িয়ে পড়েছে ওর কান্না। ডাক্তারের মনে হ'ল, ও কান্না··যেন কখনও থামবে·না। চারদিকে

কান্না। মানুষ মরছে। মরবে। আর বোধ হয় তাদের নিষ্কৃতি নাই। এই তেরো শো পঞ্চাশেই সব ধুয়ে মুছে যাবে। চীৎকার করতে ইচ্ছে হ'ল ডাক্তারের—ভুয়ো, ভুয়ো, সব ভুয়ো। সে ছুটে গিয়ে উঠল আপনার ডিস্-পেন্সারির দাওয়ায়।

ঘরের মধ্যে ঢুকে অন্ধকারের মধ্যেই সে চেয়ারে ব'সে পড়ল।

চমকে উঠল ডাক্তার। বোবা মেয়ের কান্না শোনা যাচ্ছে। দেওয়ালের কোণ চিরে আসছে সে কান্না।

কান্না না, ঝিঁঝিঁর ডাক।

ডাক্তার টর্চ জ্বাললে; পোকাটা দেখা যায় না। আলোর ছটাও গিয়ে দেওয়ালে পড়ছে না, পড়েছে আলমারির উপর। পয়জ্‌ন! বিষ! সাবধান!

ডাক্তার অগ্রসর হ'ল আলমারির দিকে।

ডাক্তারবাবু!

ভট্টাচার্য ডাকছেন রাস্তা থেকে। ডাক্তার উত্তর দিলে না। টর্চটা নিবিয়ে দিলে।

ভট্টাচার্য আবার ডাকলেন। কিন্তু উত্তর এল না। ভট্টাচার্য একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে এগিয়ে চললেন। এগিয়ে চললেন চণ্ডীতলার পথে।

দরজা খুলে দেবীর সম্মুখে দাঁড়ালেন। ভিতরে প্রবেশ করলেন কিছুক্ষণ ভেবে, নেড়ে দেখলেন দেবীপ্রতিমা। শীতার্ত শেষরাত্রিতে মূর্তি থেকে হিম বের হচ্ছে। কঠিন। কঠিন মানুষের শবও এত কঠিন হয় না।

ভট্টাচার্য যেন পাগল হয়ে গেলেন।

হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল, বলির খাঁড়াখানা নিয়ে—। শিউরে উঠলেন ভট্টাচার্য। তারপর দাঁতে দাঁত টিপে খাঁড়াখানা আরও শক্ত ক'রে ধরলেন, নিজের গলাতেই—

আন্নুর মা বললে, শশী!

শশী নির্বাক হয়ে বোবা মেয়ের কান্না শুনছিল, বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিল মেয়েটির শোকার্ত অসম্বৃত রূপ। সে কোন উত্তর দিলে না।

আন্নুর মা বললে, চল বাবা।

শশী শুধু বললে, হুঁ।

আন্নুর মা অদ্ভুত, শশীর ওই 'হুঁ' শোনবামাত্র ঘর থেকে একখানা

কোদাল বের ক'রে দিলে, এগিয়ে গিয়ে টেনে ছিনিয়ে নিলে মরা ছেলেটাকে মায়ের কোল থেকে। এবার যে চীৎকার করলে বোবা মেয়েটা, তাতে শশীর মনে হ'ল,: তার মাথার ভিতরে কে যেন একটা গরম লোহার সুচ ফুটিয়ে দিলে। সে যেন পাগল হয়ে গেল। মনে হ'ল, নিজের কণ্ঠনালীটাই তার লোহার মত হাতের মুঠোয় চেপে ধরে, তা'হলে ওই চীৎকার আর তাকে শুনতে হবে না।

আন্নুর মা হনহন ক'রে চলেছে নাতির দেহটা নিয়ে। তার অনন্ত দুঃখ। তবু তার অনন্ত ভাবনা। বাঁচবে কি ক'রে? খাবে কি? বেচবে? বোবা বউটাকে বেচবে?

শশী পিছনে চলতে চলতে ভাবছিল। কি ভাবছিল ঠিক বুঝতে পারছিল না। একবার মনে হ'ল, পিছন থেকে এগিয়ে গিয়ে এই কোদালখানা বসিয়ে দেয় আন্নুর মায়ের মাথায়।

আবার মনে হ'ল, ফিরে গিয়ে ওই বোবা মেয়েটার গলায় এক কোপ মেরে ওকে চুপ করিয়ে দেয়।

আবার মনে হ'ল, নিজের মাথায় মারে কোদালখানা।

হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠল। সাপ! লাফ দিয়ে স'রে গিয়ে সে কোদালখানা তুললে, মারবে সাপটাকে এক কোপ। পরমুহূর্তে কি খেয়াল হ'ল, আবার লাফ দিয়ে পড়ল সাপটার উপর। নে, দে কামড়ে, দে।

মরা সাপ! না। দড়ি একগাছা।

আন্নুর মা হঠাৎ অনুভব করেছিল, শশী পিছনে নাই। সে ফিরে দাঁড়িয়ে ডাকলে, শশী!

শশী দাঁতে দাঁতে ঘষছিল।

পিছন থেকে এখনও ভেসে আসছে বোবা মেয়ের কান্না। শশীর ইচ্ছে হচ্ছে, দুনিয়াসুদ্ধ লোককে খুন করতে—ডাক্তারকে, ত্রিপুরা ভট্টাচার্যকে, আন্নুর মাকে, বোবা মেয়েকে।

শশী! ও বাবা!

হুঁ।

পরদিন সকালবেলা।

ডাক্তার ধীরে ধীরে এসে চেয়ারে বসলে। উঃ, কি রাত্রিই গেছে কাল!

এখনও বিষের আলমারির দরজাটা খোলা রয়েছে। মাথায় হাত দিয়ে বসল সে। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।

রোগী অনেকে এসে ব'সে আছে। অনেকে আসছে। প্রতিদিনের মত আজও গত রাত্রে কে কে মরেছে, তারই হিসেব হচ্ছে। তিনজন মরেছে গত রাত্রে। নস্বরামের স্ত্রী, পঞ্চ বাউড়ী, গোবিন্দ বৈরাগী।

আহু ঠাকুরের ছেলেটিও মরেছে কাল।—একজন বললে।

ডাক্তার আবার অস্থির হয়ে উঠল। রাত্রি-জাগরণের অবসাদে অবসন্ন ডাক্তারের কানের স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্যে এখনও যেন মধ্যে মধ্যে বেজে উঠছে বোবা মেয়ের কান্না। সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন দৃষ্টির সম্মুখে মনের উদাসীনতার সুযোগে ভেসে উঠছে সেই ছবি।

ডাক্তারবাবু!

ব্যোমকেশবাবুর ভাইপো। কুড়িটি টাকা টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে সে বললে, ওষুধের দাম। আর—

ডাক্তার অবসন্ন দৃষ্টি তুলে চাইলে তার দিকে।

এ বেলা যাবেন বারোটার পর।

বারোটার পর?

হ্যাঁ। আজ স্বস্ত্যয়ন করাচ্ছি। হয়ে যাক স্বস্ত্যয়নটা।

ডাক্তার চুপ ক'রে ব'সে রইল।

ব্যোমকেশবাবুর ভাইপো মৃদুস্বরে বললে, চণ্ডীতলায় পূজো দিলাম, বলি দিলাম, খানিকটা প্রসাদী মাংস আছে। বাড়ির ভেতর পাঠিয়ে দিই?

বোমকেশের ভাইপো আবার বললে, কেমন গণ্ডগোল দেখুন না; ভটচায মশায়, মানে ত্রিপুরা ভট্টাচার্য মশায় আজ থেকে পূজো ছেড়ে দিলেন।

ছেড়ে দিলেন!

হ্যাঁ। আজ থেকে ওঁর ছেলে পূজো করবে।

ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল, চোখে জল এল। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে চোখ বুজল। চোখের পাতার চাপে কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দুটি জলধারা। ব্যোমকেশের ভাই অবাক হয়ে গেল।

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাক্তার রুমাল বের ক'রে চোখের জল মুছে ফেললে। তারও ইচ্ছা হ'ল, ওই ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের মত সেও তার

কাজ ছেড়ে দেয়। তার ওষুধপত্র যন্ত্রপাতি সব ভেঙে চুরমার ক'রে দেয়, তার বই খাতা সব ছিঁড়ে আগুনে গুঁজে দেয়।

তার কানের পাশে এখনও বাজছে সেই বোবা মেয়ের কান্না। ওই কান্নার মধ্যে থেকে সে শুনতে পাচ্ছে পৃথিবী-মায়ের কান্না। তার চিকিৎসক-জীবনে অনেক মায়ের অনেক শিশুকে সে মরতে দেখেছে, তাদের কান্নাও সে শুনেছে, কিন্তু এমন কান্না সে কখনও শোনে নাই; কোন কান্না এমন ভাবে পৃথিবীর বুক থেকে আকাশলোক পর্যন্ত পূর্ণ ক'রে দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক সুদূর অতীত কাল থেকে প্রবহমাণ শোক-প্রবাহের অবিচ্ছিন্ন ফল্গুধারার সন্ধান তাকে দেয় নাই। ডাক্তারি পড়বার সময় হাসপাতালে অনেক মৃত্যু সে দেখেছে, স্বাভাবিক অস্বাভাবিক মৃত্যু, বিচিত্র রোগে মৃত্যু। মৃত্যুর সঙ্গে বিরোধিতা করেছে চিকিৎসক হিসেবে। কিন্তু আজ মৃত্যুর একটা অদ্ভুত রূপ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

ডাক্তারবাবু!—ব্যোমকেশের ভাইপো ডাকলে।

ডাক্তার উত্তর দিলে না। তার চোয়ালের হাড় দুটা উঁচু হয়ে উঠল। ডাক্তার দাঁতে দাঁতে চেপে ধরেছে—ক্ষুব্ধ আক্রোশে।

এ মৃত্যু সে মৃত্যু নয়। মৃত্যুকে মানুষ আপনার স্বার্থের জন্য ব্যবহার করছে। যেমন ভাবে চিতাবাঘ পুষে, মানুষ তাকে হরিণের পালের উপর লেলিয়ে দেয়, তেমনই ভাবে লেলিয়ে দিচ্ছে। যুদ্ধ সৃষ্টি করলে, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করলে, দলে দলে মানুষ মরল; মহামারী এল, মহামারীতে দেশ শ্মশান হয়ে গেল। প্রতিকারের পথ রুদ্ধ। বিজ্ঞান পঙ্গু।

কি করবে? এ অবস্থায় সে কি করবে?—ও কি! বোবা মেয়ের কান্না, এমন উচ্চ হয়ে উঠল যে! ডাক্তার অস্থির হয়ে উঠল।

কান্না নয়, আকাশে গোঁ-গোঁ শব্দ উঠছে।

ছেলেরা চীৎকার ক'রে উঠল, ওরে বাবা রে, কত রে! কত রে!

ব্যোমকেশের ভাইপোর স্তব্ধতা আর সহ্য হ'ল না। সে উঠল, বললে, ও বেলাতেই দেখে ওষুধ দেবেন।

কান্না নয়, এরোপ্লেনের শব্দ। ডাক্তার আশ্বস্ত হ'ল।

ব্যোমকেশের ভাইপো যাবার সময় বললে, টাকাটা দেখে নিন ডাক্তারবাবু। কুড়ি টাকা।

ডাক্তার সচেতন হ'ল। সে টাকা কয়টা গুনে নিলে। বাইরে রোগী

প্রায় কাতারে কাতারে বললেও চলে। ওদের দেখতে হবে। প্রেসক্রিপ্শন লিখবার জন্য সে কলম তুলে নিলে।

এরোপ্লেনের ঝাঁক এগিয়ে আসছে। গর্জন বাড়ছে। সেই শব্দ ছাপিয়ে উঠল কান্নার শব্দ—তারস্বরে কাঁদছে, স্ত্রীলোকের কণ্ঠের কান্না।

কে? কে রে? কে গেল? বাইরে রোগীরা গবেষণা করছে।

ডাক্তার লিখেই চলেছে। ও কান্না তাকে বিচলিত করে না। যে কান্না কাল রাত্রে শুনেছে, তার পর।

কান্না এগিয়ে আসছে।

কে? কে? শশীর বউ? শশী ডোমের বউ? কি হ'ল রে? অ ডোম-বউ?

ওগো, আমার মরদ।

কে, শশী?

হ্যাঁ গো। গাঁয়ের বাইরে গাছের ডালে গলায় দড়ি লাগিয়ে। থানায় খবর দিতে যেছি গো।

শশীর স্ত্রীও থেমে গেল, আকাশের দিকে চেয়ে দেখছে। একদল—বিশ-পঁচিশখানা উড়ো-জাহাজ চলেছে।

ডাক্তারের কলম থেমে গেছে।

শশী আত্মহত্যা করেছে? এরোপ্লেনের শব্দের মধ্যে বোবা মেয়ের কান্না শুনতে পাচ্ছে ডাক্তার।

শেষ কথা

লাট ভরতপুর, পরগনে পূর্বচক, সম্পত্তিটা খুব বড় সম্পত্তি। সবাই বলে, সোনার সম্পত্তি। গাছের পাতা কুলোর মত, ডাল ঢেঁকির মত; যবা হরিচন্দনের মত মোলাম মাটি—গায়ে মাখলে গা জুড়িয়ে যায়, ফসলের বীজ পড়বার অপেক্ষা—দেখতে দেখতে ফসলে ভ'রে যায় মাঠ; তা ছাড়া ভরতপুরে না পাওয়া যায় কি? সোনার সম্পত্তি কথাটাও কথার কথা নয়। আগে লোকে নদীর বালি থেকে সোনার দানা বের করত। মাটির তলায় সত্যিই সোনা আছে। প্রজারা সব বেকুবের দল। চাষ ক'রে খায়, মার খেয়ে হাসে, বলে, তুমি কি আমার পর? তারপর সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করে, হাতে লাগে

নাই তো মারতে গিয়ে! পরনে ঠেঁটি কাপড়, কপালে তিলক-ফোঁটা, গলায় তুলসীমালার কণ্ঠী, কালো রঙ। এ থেকেই বেকুবত্ব প্রমাণ হয়ে যায়। চাষ ক'রে খায়—চাষীর দল সব। জমিদার-পক্ষ বলে, চাষা। আগে খেতে-দেত, চাষ করত, তামাক টানত, পূজা-অর্চনা করত, ঘুমুত। এখন আর সে কাল নাই, কলি বোধ হয় চার পো পূরা হয়ে উঠছে, তারই ফলে আজকাল আধপেটা খায়, রোগে হাঁপায়, কোন রকমে চাষ করে, ভগবানকে কেউ ডাকে, কেউ ডাকে না, অর্থাৎ কেউ কাঁদে, কেউ ব'সে ব'সে দাঁত খিঁচোয়।

পদ্মাপারের সাউ মশায়েরা এখন ভরতপুরের জমিদার। আগে ছিল মঙ্গল-কোটের মিঞাদের জমিদারি। সাউ মশায়েরা তখন এখানে ব্যবসা করতে এসেছিলেন। মিঞাদের ঘরোয়া ঝগড়া বাধলে, এক পক্ষ সাউদের কাছে কিছু টাকা ধার করে নিয়েছিলেন। ধার সহস্র ধারায় যখন বাড়ে, তখন কি আর রক্ষা থাকে? তার উপর এই যে চাষী প্রজাদের মাতব্বর, তারাও সেকালে মামলায় প্রায় সবাই সাক্ষী দিয়েছিল—এই সাউদের তরফে।

যাক ওসব কথা। তবে এখন ওরা নিজের গালে—; ও কথাও যাক, কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নাই। বিস্তারিত বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। একেবারে হালের কথাই ভাল। পদ্মাপারের সাউ মশায়েরা এখন জমিদার। গাঁয়ে গাঁয়ে কাছারি, কাছারিতে কাছারিতে নায়েব; এ ছাড়া পদ্মাপার নিজের দেশ থেকে আমদানি করা পাইকের দল এনে পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছেন সাউ মহাশয়েরা। এছাড়াও সাউ মশায়দের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর অনেকে এসে বহু দোকানদানি খুলে ফলাও ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। অনেক কল-কারখানাও বসিয়েছেন, এখানকার অনেক লোক আজকাল কলেও খাটে। এই সব লোকরাও কেউ বা দাঁত খিঁচোয়—কেউ বা কাঁদে। তা কাঁদুক আর দাঁত খিঁচোক—দিন চলছিল ভালয় মন্দতে। জমিদারের কর্মচারীদের সঙ্গে গাছের মালিকানি নিয়ে ঝগড়া ক'রে, জমির স্বত্ব নিয়ে আপত্তি জানিয়ে, পাইকদের খোরাকী রোজ প্রভৃতি নিয়ে 'না না' ক'রে, সাউ দোকানদারদের সঙ্গে নুনের দর, তেলের দর, কাপড়ের দর নিয়ে বাক্‌চাতুরি ক'রে, কলকারখানার মজুরি নিয়ে বিসম্বাদ ক'রে নানা টক-ঝকের মধ্যে দিয়ে দিন চলছিল এক রকম ক'রে। ঘানির চারপাশে চোখঢাকা বলদের শিঙ নেড়ে পাক খাওয়ার মত সবই চলছিল। তেলও বের হচ্ছিল—সে নিচ্ছিল কলু, আর খোলও হচ্ছিল—তা খাচ্ছিল বলদে।

হঠাৎ ভূমিকম্পে ন'ড়ে ওঠার মত সব ন'ড়ে উঠল। ভয়ানক কাণ্ড বেধে গেল। জমিদার মশায়দের সঙ্গে হলদীবাড়ির সাঁই জমিদারদের সীমানা নিয়ে ফৌজদারী বেধে গেল। বেমক্কা ফৌজদারি, বলা নাই কওয়া নাই নোটিশ নাই পত্র নাই, সাঁইবাবুদের পাইকদের দল হঠাৎ বন-বাদাড় ভেঙে লাঠি সোঁটা সড়কি বল্লম নিয়ে ভরতপুরের পাশের লাট—লাট ধর্মপুরে চড়াও হ'ল। কাছারিতে ঢুকে—মারধর খুনজখম ক'রে দখল ক'রে নিলে সব। সাউবাবুদের দল এসে ভরতপুরের কাছারিতে ঢুকল। শুধু তাই নয়, সাঁইদের লোকজনদের ব্যাপার দেখে ভরতপুর সম্বন্ধেও চিন্তার কারণ ঘ'টে গেল। লাঠি-সোঁটায় তেল মাখিয়ে তলোয়ারে শান দিয়ে এমন তোড়জোড় আরম্ভ করলে যে, ভরতপুরে ঢুকেও যে তারা শেষ পর্যন্ত একটা হাঙ্গামা বাধাতে পারে, এতে আর কারও সন্দেহ রইল না। চারিদিকে হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। ভরতপুরের কাছারিতে কাছারিতে সাজ সাজ রব উঠল।

চাষীর দল সব চমকে উঠল। দুই লড়ায়ে ষাঁড়ের পায়ের তলায় উলুঘাসের মত দশা তাদের। তারা সব চঞ্চল হয়ে উঠল।

বুড়া লালমোহন পাণ্ডে ভরতপুরের চাষীদের চাঁই। খাটো ক'রে চুল ছাঁটা, দাঁতগুলি সব প'ড়ে গেছে, আস্তে আস্তে কথা বলে, মিষ্টি মিষ্টি হাসে, বুড়া ভাবনায় মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

দলে দলে ভরতপুর লাটের লোকেরা এসে বুড়াকে ঘিরে বসল।

সসম্মানে হাত জোড় ক'রে বুড়া ফোকলা দাঁতে, মায়ের কোলের শিশুরা যে হাসি হাসে আপনার বাপ খুড়া ভাই বোনদের দেখে, সেই হাসি হেসে বললে, আসুন পঞ্চ।

সকলে ব'সে গেল। তারপর বললে শুধু একটি কথা, কর্তা! ওই একটি কথাতেই সব ওদের বলা হয়ে গেল। কর্তাও সব বুঝে নিলে।

বুড়ার সুখেও হাসি, দুখেও হাসি, ভাবনাতেও হাসি, বুড়া ভাবতে ভাবতে হাসতে লাগল।

গৌরপুরের একজনা বললে, সাউবাবুরা আমাদের জমির মালিকানি মানছে নাই। আমরা কেনে ছাড়ব সুবিধে? সাউয়েরাও জমিদার, সাঁইয়েরাও জমিদার—তা সাঁইয়েরা যদি আমাদের জমির মালিকানি মানে, তবে উয়াদের হয়েই সাক্ষী দাও না কত্তা।

বুড়া ঘাড় নাড়তে লাগল, উ-হু। পাপ হবে।

একজনা বললে, তবে আমরাও জুটে পুটে লাগাই কৌজদারি, এস।

বুড়া ঘাড় নাড়লে, উঁ-হু।

কেনে, ভয় লাগছে নাকি?—ছোকরা রুখে উঠল।

বুড়া হাসলে। সে হাসির সামনে ছোকরা এতটুকু হয়ে গেল। বুড়া হেসে বললে, ভয় নয় রে ভাই, পাপ হবে।

তবে? তবে কি করবে বল? কিসে পাপ হয় না, তাই বল?

হুঁ। দাঁড়া রে ভাই। মনকে শুধাই। মন শুধাক ভগবানকে। তবে তো!

রতনলাল বললে, যা হয়, চটপট ঠিক ক'রে ফেল কত্তা। তুমি যা বলবে, তাই করব আমি।

বুড়া হাসলে; রতনের উপর তার অনেক ভরসা। ভারি ভাল ছোকরা। আর তেমনই কি সাহস!

ঠুকঠুক ক'রে বুড়া কাছারিতে এসে উঠল, রাম রাম গো নায়েব মশায়!

কে, লালমোহন? এস এস।

হ্যাঁ, এলম একবার।

এলম-টেলম নয়। লেগে যাও, সব কোমর বেঁধে লেগে যাও একবার। শাই-বেটাদের একবার মেরে বেচপাট ক'রে দিতে হবে, একধার থেকে কেটে ফেলতে হবে।

বুড়া হাসলে। কি যে বলেন নায়েব মশায়!

কেন?

ওই! কেটে ফেললে রক্ত পড়বে যে গো! ম'রে যাবে যে লোকগুলান! পাপ হবে যে! বুড়ার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

নায়েবের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ'লে গেল বুড়ার এই ভণ্ডামি দেখে। তবু ও লোকটা খাতিরের লোক, তাই রাগ ক'রেও ভদ্রভাবে বললে, হুঁ, বুঝেছি। ওদের রক্ত দেখে তোমাদের চোখে জল আসছে! বুঝতে পারছি সব! ব'লে খসখস ক'রে কয়েক ছত্র লিখে আবার বলেন, আর আমাদের পাইকদের যে খুন-জখম করেছে, রক্তে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে, তার বেলায়—

বুড়ার ঠোঁট থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল, চোখের জল দ্বিগুণ হয়ে গেল, হে ভগবান! সে কথা শুনে ইস্তক কাঁদছি নায়েববাবু, আঃ—হায় হায় হায়!

কত লাগল তাদের ভাবেন, দেখি? চোটগুলান, মনে হয় আমারই বুকে পড়ল গো।

নায়েব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। লোকটা ভণ্ড পাষণ্ড, না না সত্যাই সাধু? ভেড়ার শিঙে ধাক্কা লাগলে নাকি হীরের ধারও ভেঙে যায়, ঠিক তেমনই নায়েবের ইস্পাতের ভ্রমরের পাক দেওয়া শক্ত ধারালো বুদ্ধিও বুড়ার ভোঁতা বুদ্ধির ঘরের দরজায় ঠিক গর্ত করতে পারছে না। অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে নায়েব বললে, তা হ'লে? তা হ'লে কি করতে হবে শুনি?

তাই তো বুলছি গো আপনকাকে। চোখের জলের মধ্যেই আবার বুড়ার হাসি ফুটে উঠল।

কি বলছ?

বুলছি, আমাদের জমির মালিকানিটি মেনে লাও তুমরা, সব পাইক বরকন্দাজ নিয়ে তফাত হয়ে থাক, সেখ সাঁইদের আমরা রুখে দি।

রুখে দেবে? ফৌজদারির কি বোঝ তোমরা? চাষ কর, খাও। লাঠি ধরতে জান? সড়কি চালাতে জান?

বুড়া হাসলে।

হাসছ যে?

আপনকার কথা শুনে হাসছি গো। আমরা লাঠি সড়কি ধরবই নাই যে।

তা হ'লে কি ক'রে রুখবে?

উয়ারা আসবে, আমরা পিঠ পেতে দাঁড়াব, লাও, মার লাঠি। বুক পেতে দিব, চালাও সড়কি। আমাদের রক্ত পড়বে, মাটি লাল হয়ে যাবে, আমরা মরব। তখন উয়াদের আক্কেল হবে, বুকগুলান টনটন করবে, চোখে জল আসবে। ভগবান জ্ঞান দিবে। উয়ারা লাজ মেনে ফিরে যাবে।

নায়েব হা-হা ক'রে হেসে উঠল, এই তোমার বুদ্ধি!

বুড়া কিন্তু আশ্চর্য। সে এতটুকু অপ্রতিভ হ'ল না। তারও দন্তহীন মুখে সেই আশ্চর্য ছেলেমানুষী হাসি ফুটে উঠল। হয় গো, হয়। আমার মন শুধালে যে ভগবানকে! ভগবান যে বুললে গো! আপনকাদের মন যে ভগবানকে কিছু শুধায় না গো! না হলি বুঝতি পারতে আমার কথা।

যেমন দেবা, তেমনই দেবী; বুড়ার বুড়ীটি ঠিক ক্যাপার ক্ষেপীর মত।

সমস্ত শুনে সে ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়ল। চিন্তাটা তার বুড়ার মতই

সাউ নায়েবের জন্য চিন্তা। এ তো সহজ কথা, সোজা কথা। উয়ারা কেনে বুঝতে লারছে? হ্যাঁ গো বুড়া?

সেই তো গো বুড়ী।

তবে কি হবে? কি করবে তুমি?

আমি? অনেক ভেবে বুড়া হাসলে, হাঁ, হয়েছে। ঠিক হয়েছে।

কি?

আমি মরব।

মরবে?

হ্যাঁ, আমি মরব। আমি যদি মরি, তবে তখন উয়ারা মনে দুখ পাবে। ভগবান জ্ঞান দিবে। তখন আমাদের কথা ঠিক উয়াদের সমঝে আসবে।

বুড়ী কিছুক্ষণ ভাবলে। ভেবে সে খুশি হয়ে উঠল। হেসে বার বার ঘাড় নেড়ে বললে, হাঁ, ঠিক বুলেছ তুমি।

বুলি নাই? হেসে বুড়া বুড়ীর দিকে তাকালে।

হাঁ। তাই কর তুমি। মর। ম'রে উয়াদিগে বুঝায়ে দাও।

বাইরে থেকে ডাকলে রতনলাল, কত্তা!

বেটা! আয় রে বেটা, আয়। লালমোহনের মুখ হাসিতে ভ'রে উঠল।

রতনলাল এসে দাঁড়াল হাসিমুখে। বললে, সব এসে দাঁড়িয়ে আছে কত্তা। কি হ'ল, কি করব তাই বল। রতন যেন আগুনের শিখার মত জ্বলছে।

বুড়া বাইরে এসে জোড়হাত ক'রে বললে, নমো পঞ্চ।

তার আগেই কিন্তু একটা গণ্ডগোল ঘ'টে গেল। সাউবাবুদের পাইক বরকন্দাজ এসে সব ঘিরে দাঁড়াল। সাউবাবুদের সদর-নায়েব চারু শীল, জাঁদরেল নায়েব। সে কারও তোয়াক্কা রাখে না, সে এখানকার নায়েবকে হুকুম পাঠিয়েছে, পাগলাটাকে পাকড়ে' আটকে' রাখ। শুধু পাগলা নয়, রতনলাল-টতনলাল চেলাচামুণ্ডা তামাম আদমি আটক কর—বিলকুল।

বুড়া হেসে বললে, চলো। রতনলাল প্রভৃতি চেলাদের দিকেও চেয়ে বললে, চলো বেটালোক।

বুড়ী একগাল হেসে এগিয়ে এসে বললে, আমি?

সাউবাবুদের লোক বললে, হাঁ হাঁ, সে হুকুমও আছে।

বুড়ী বললে, দাঁড়া বাবা, জেরাসে সবুর কয়ো বেটা; বুড়ার কৌপীন, আমার

কাপড় আর সেই লোটাটা নিয়ে নিই। ওই লোটাটাতে জল না খেলে আমার তিয়াস মেটে না।

বুড়া হেসে ঘাড় নাড়ে, হাজার হ'লেও মেয়েলোক কিনা! লোটার মায়া ছাড়তে পারে না।

সাউবাবুরা বুড়াকে আটক করলেও খুব যত্ন ক'রেই রাখলে। সেদিক দিয়ে তারা এতটুকু কসুর রাখলে না। বুড়া কিন্তু সেই বুড়া, আটকের মধ্যে থেকেও হাসে; ভগবানকে ডাকে, আর ভাবে। মনে মনে বলে, ভগবান, আমার মনকে বুলে দাও, কি করব! মরব? আমি মরলে উয়ারা দুখ পাবে? তুমি উয়াদিকে জ্ঞান দিবে?

বুড়ী আটকের মধ্যেই ঘুরঘুর ক'রে ঘুরে বেড়ায়, বুড়ার খাবারটি করে, বিছানা মানে কম্বলটি ঝাড়ে, লোটাটি ঝকঝকে ক'রে রাখে। তার যেন এ অবস্থাটা খানিকটা ভালই লাগে। বুড়াকে অনেকটা কাছে পেয়েছে। বাইরে তো বুড়ার হাজার কাজ, এক লহমার ফুরসৎ হয় না দুটা কথা বলবার, ঘরোয়া কথা বলবার। সব কথাই তার ভরতপুরের কথা, নয়তো মানুষের কথা। আজ এখানে কাল সেখানে, এ আসছে সে আসছে, লোকজনেই বুড়াকে ঘিরে রেখে দেয়। এখানে বুড়ার অনেকটা কাছে আসতে পেয়েছে সে। কিন্তু কয়েক দিন পরেই বুড়ীর ভুল ভেঙে গেল। বুড়া সেই বুড়া। লোকের ভিড় নাই, কিন্তু বুড়ার মাথায় ভাবনার ভিড় এতটুকু কমে নাই। লোকে বাইরে বলত, বুড়াটি পাথর। বুড়ীর মনে হয়, কথাটি মিথ্যা নয়।

সে বলে, বুড়া!

উঁ? বুড়া তার দিকে তাকায়, বুড়ীর মনে হয়, বুড়া তার দিকে চেয়ে নাই, চেয়ে আছে ওই—ওই কোন্ দিক্‌দিগন্তরে, অনেক দূরে, সেই পাহাড়ের মাথায় আছে যে ঠাকুরের মন্দির, সেই মন্দিরের চূড়ার দিকে।

কি ভাবছ?

ভাবছি? বুড়া হাসে।

হেসো না বুড়া, এ হাসিটি তোমার ভাল লাগছে নাই আমার।

হুঁ। ছোট্ট একটি হুঁ ব'লে বুড়া চুপ ক'রে যায়।

ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় বুড়ী; সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলে, ভগবান, বুড়াকে বাঁচিয়ে রাখ! না হ'লে এত ভাবনা ভাববে কে?

হঠাৎ একদিন বুড়া বললে, আমি মরব।

বুড়ীর বুকটা যেন ফেটে যাবার উপক্রম হ'ল, কিন্তু সে কথা তো মুখ ফুটে বলবার উপায় নাই। বুড়া তা হ'লে এমন হাসি হেসে শুধু বলবে, ছি! তাতেই বুড়ী মরমে ম'রে যাবে। সে শুধু বললে, কেনে বুড়া? মরবে কেনে?

মরব। সাহাবাবুরা বুলছে, আমি বাইরের লোকগুলিকে বুলে এসেছিলাম ফৌজদারী দাঙ্গা করতে! বাইরের লোকগুলির সঙ্গে বাবুদের পাইকের মারপিট হয়ে গিয়েছে। আমাদের লোকগুলি উয়াদিকে মেরেছে, অনেক ক্ষেতি করেছে। বাবুরা বুলেছে, ই সব আমার শিক্ষা।

রতনলাল বললে, তার লেগে তো কত্তা, বাবুদের পাইকরা লোকেদেরও খুব মার দিয়েছে।

বুড়া ঘাড় নেড়ে হাসলে। বললে, শুধু তাই লয় রতন। আমাদের লোকেরা মারলে যখন, তখন লোকেদের পাপ হ'ল। আমি মরি, ম'রে ভগবানকে বুলব, ভগবান, পাপটি ক্ষমা কর, শুধু আমাদের পাপ লয়, ওই পাইকদের পাপও ক্ষমা কর। আর—

আর কি কত্তা?

বুড়া হাসলে। তবে তো উয়ারা বুঝবে, আমি পাপী লই।

বুড়া মরণ-পণ ক'রে বসে। খায় না দায় না, চুপ ক'রে প'ড়ে থাকে।

বুড়ীর কথাবার্তা সব ফুরিয়ে গিয়েছে যেন, সে চুপ ক'রে ব'সে চেয়ে থাকে। হায়, বুড়া তার হারিয়ে গেল। তাঁর দিকে একবার ফিরে চাইবারও ফুরসৎ নাই! কান্না লজ্জা, বুড়ীর কাঁদবারও উপায় নাই।

আটকখানার বাইরে হৈ-চৈ উঠে, ভগবান, আমাদের কর্তাকে বাঁচিয়ে দাও।

রতনলাল আর সব চেলারা যেন উদাস হয়ে গিয়েছে।

বুড়ী আর থাকতে পারে না। সে বুড়াকে কিছু বলতে সাহস করে না। সে ভগবানকে মনে মনে ডাকে, বলে, বুড়াকে বাঁচাও দেবতা। এতগুলি লোকের মুখের দিকে চাও। আমার মুখের দিকে চাও। বুড়ীর মনে হয়, বুড়ার চেয়ে ভগবানেরও মন নরম।

বুড়ীর মনে হয়, ভগবান যেন হাসছেন।

বুড়া সত্যিই মরে না। মরণের সব লক্ষণই হয়েছিল, সাউবাবুরা বড় বদ্যিও পাঠিয়েছিল, তারাও বলেছিল, আমাদের অসাধ্য। না খেলে মানুষ বাঁচে না,

বাঁচতে পারে না। তবু বুড়া বাঁচে। আশ্চর্য বুড়া, সব সময়ের মধ্যে একটি-বারও তার মুখের সেই খোকার ঠোঁটের হাসির মত হাসি মিলিয়ে যায় নাই। ধীরে ধীরে সব মরণ-লক্ষণ মিলিয়ে গেল, চোখের ঘোলা রঙ ঘুচে গিয়ে সাদা পদ্মের পাপড়ির আভা ফুটে উঠল, মুখের রঙে ফুটে উঠল মায়ের কোলের ছেলের মুখের মত ঝকমকে রেশ। বুড়া বললে, আমি বাঁচলম। ভগবান আমার মনকে বুললে, তোর পাপ নাই।

বুড়ীর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সে বললে, বুড়া, আমি এইবার মরব।

কেনে?

আমার শরীর খারাপ লাগছে। আর—

আর কি?

বুড়ী কিন্তু কিছুতেই সে কথা বললে না। শুধু হাসলে।

বুড়ী সত্যই মারা গেল। জর হ'ল সামান্য। সেই জরেই মারা গেল। মরবার সময় একদৃষ্টে সে চেয়ে ছিল বুড়ার মুখের দিকে।

পাথরের বুড়া। লোকে মিথ্যে বলে না।

হঠাৎ বুড়ীর মনে হ'ল, লোকের কথা মিথ্যে; সত্যি নয়, সত্যি নয়। বুড়ার চোখে জল। হাঁ হাঁ, বুড়ার চোখে জল।

সে বললে, বুড়া!

চোখে জল টলমল করছিল, তবুও বুড়ার মুখে হাসি ফুটে উঠল, বুড়া বললে, বল বুড়ী, কি বুলছ, বল?

মরণ ভারি সুন্দর গো বুড়া, মরণ ভারি সুন্দর।

বুড়া হাসতে লাগল, চোখের জল টপটপ ক'রে ঝ'রে পড়ল, ঝ'রে পড়ল বুড়ীর কপালের উপর। বুড়া মুছিয়ে দিতে গেল সে জল। বুড়ী বললে, না, থাক।

—শেষ—

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অন্যান্য বই

কবি
অভিযান
সন্দীপন পাঠশালা
মন্বন্তর
পঞ্চগ্রাম
গণদেবতা
ধাত্রীদেবতা
কালিন্দী
প্রতিধ্বনি
স্থলপদ্ম
বেদেনী
ছলনাময়ী
১৩৫০
ইমারৎ
রসকলি
জলসাঘর
হারানো সুর
চৈতালী ঘূর্ণি

রাইকমল
নীলকণ্ঠ
আগুন
পাষাণপুরী

যাদুকরী
দিল্লীকা লাড্ডু
ঝড় ও ঝরাপাতা
প্রসাদমালা
শিলাসন
নাগিনী কন্যার কাহিনী
হাঁসুলীবাঁকের উপকথা
আরোগ্যনিকেতন
দুই পুরুষ
দ্বীপান্তর
পথের ডাক
বিংশ শতাব্দী
—ইত্যাদি